~*MASUD RANA SERIES*~

Proloy shonket (Part I & II) By Kazi Anwar Hossain

For more free Books,Songs,Software,
PC games,Movies,Natok,
Mobile ringtones,games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum

Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com,anmsumon@gmail.com

মাসুদ রানা

প্রলয়সঙ্কেত

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

অজানা অপরাধে মাসুদ রানার পিছনে
লেলিয়ে দেয়া হয়েছে সিআইএ, ডিসিএ, সাইফার,
এমআই-সিক্স, জিআরইউ, কমসেক, সিডিএইচকিউ,
বিএফভি প্রভৃতির খুনী অপারেটরদের।
পুরো ইউরোপ চষে বেড়াচ্ছে তারা ওর
খোঁজে–রানার লাশ দেখতে
চেয়েছেন জেনারেল হিলিংটন এবং কোবরা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

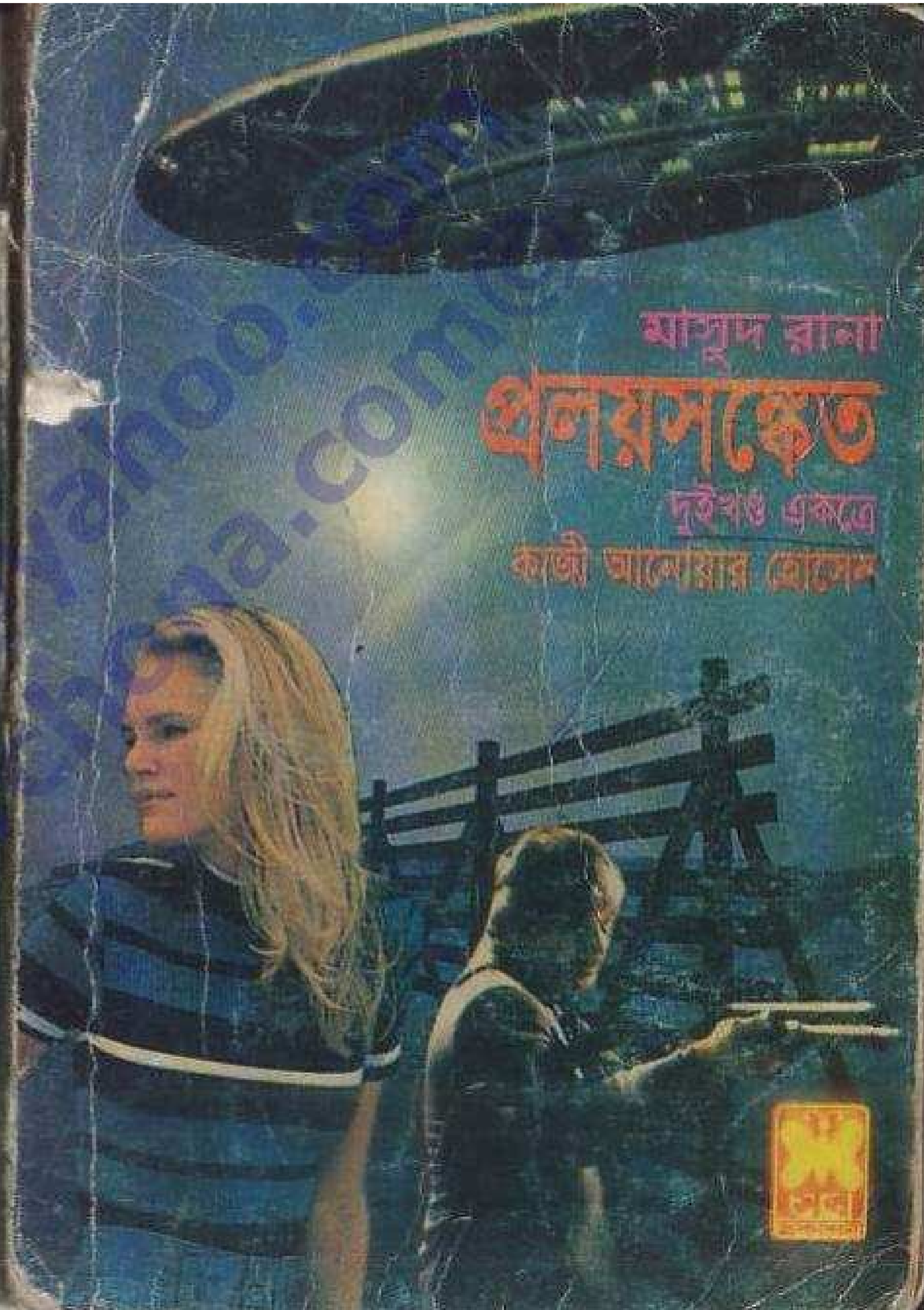

animsumon@yahoo.com
www.murchona.com

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ★ ভারতনাট্যম ★ স্বর্ণমৃগ ★ দুঃসাহসিক ★ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ★ দুর্গম দুর্গ ★ শত্রু ভয়ঙ্কর ★ সাগরসঙ্গম ★ রানা! সাবধান!! ★ বিস্মরণ ★ রত্নদ্বীপ ★ নীল আতঙ্ক ★ কায়রো ★ মৃত্যুপ্রহর ★ গুপ্তচক্র ★ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ★ রাত্রি অন্ধকার ★ জাল ★ অটল সিংহাসন ★ মৃত্যুর ঠিকানা ★ ক্ষ্যাপা নর্তক ★ শয়তানের দূত ★ এখনও ষড়যন্ত্র ★ প্রমাণ কই? ★ বিপদজনক ★ রক্তের রঙ ★ অদৃশ্য শত্রু ★ পিশাচ দ্বীপ ★ বিদেশী গুপ্তচর ★ ব্ল্যাক স্পাইডার ★ গুপ্তহত্যা ★ তিনশত্রু ★ অকস্মাৎ সীমান্ত ★ সতর্ক শয়তান ★ নীলছবি ★ প্রবেশ নিষেধ ★ পাগল বৈজ্ঞানিক ★ এসপিওনাজ ★ লাল পাহাড় ★ হংকং সম্রাট ★ কুউউ ★ বিদায় রানা ★ প্রতিদ্বন্দ্বী ★ আক্রমণ ★ গ্রাস ★ স্বর্ণতরী ★ পপি ★ জিপসী ★ আমিই রানা ★ সেই উ সেন ★ হ্যালো, সোহানা ★ হাইজ্যাক ★ আই লাভ ইউ, ম্যান ★ সাগর কন্যা ★ পালাবে কোথায় ★ টার্গেট নাইন ★ বিষ নিঃশ্বাস ★ প্রেতাত্মা ★ বন্দী গগল ★ জিম্মি ★ তুষার যাত্রা ★ স্বর্ণ সংকট ★ সন্ন্যাসিনী ★ পাশের কামরা ★ নিরাপদ কারাগার ★ স্বর্গরাজ্য ★ উদ্ধার ★ হামলা ★ প্রতিশোধ ★ মেজর রাহাত ★ লেনিনগ্রাদ ★ আমস্টারডাম ★ আরেক বারমুডা ★ বেনামী বন্দর ★ নকল রানা ★ রিপোর্টার ★ মরুযাত্রা ★ বন্ধু ★ সংকেত ★ স্পর্ধা ★ চ্যালেঞ্জ ★ শত্রুপক্ষ ★ চারিদিকে শত্রু ★ অগ্নিপুরুষ ★ অন্ধকারে চিতা ★ মরণ কামড় ★ মরণ খেলা ★ অপহরণ ★ আবার সেই দুঃস্বপ্ন ★ বিপর্যয় ★ শান্তিদূত ★ শ্বেত সন্ত্রাস ★ ছদ্মবেশী ★ কনফিডেন্ট ★ মৃত্যু আলিঙ্গন ★ সময়সীমা মধ্যরাত ★ আবার উ সেন ★ বুমেরাং ★ কে কেন কিভাবে ★ মুক্ত বিহঙ্গ ★ কুচক্র ★ চাই সাম্রাজ্য ★ অনুপ্রবেশ ★ যাত্রা অশুভ ★ জুয়াড়ী ★ কালো টাকা ★ কোকেন সম্রাট ★ বিষকন্যা ★ সত্যবাবা ★ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ★ অপারেশন চিতা ★ আক্রমণ '৮৯ ★ অশান্ত সাগর ★ শ্বাপদ সংকুল ★ দংশন ★ প্রলয় সংকেত ★ ব্ল্যাক ম্যাজিক ★ তিক্ত অবকাশ ★ ডাবল এজেন্ট ★ আমি সোহানা ★ অগ্নিশপথ ★ জাপানী ফ্যানাটিক ★ সাক্ষাৎ শয়তান ★ গুপ্তঘাতক ★ নরপিশাচ ★ শত্রুবিভীষণ ★ অন্ধ শিকারী ★ দুই নম্বর ★ কৃষ্ণপক্ষ ★ কালো ছায়া ★ নকল বিজ্ঞানী ★ রক্তক্ষুধা ★ স্বর্ণদ্বীপ ★ রক্তপিপাসা ★ অপচ্ছায়া ★ ব্যর্থ মিশন ★ নীল দংশন ★ সাউদিয়া ১০৩ ★ কালপুরুষ ★ নীল বজ্র ★ মৃত্যুর প্রতিনিধি ★ কালকূট ★ অমানিশা ★ সবাই চুপ, সে আসছে ★ অনন্ত যাত্রা ★ রক্তচোষা ★ কালো ফাইল ★ মাফিয়া ★ হীরকসম্রাট ★ মৃত্যুর রাজার ধন ★ শেষ চাল ★ বিষনাগ ★ অপারেশন বসনিয়া ★ টার্গেট বাংলাদেশ ★ মহাপ্রলয় ★ যুদ্ধবাজ ★ প্রেতাত্মা ছিয়া ★ মৃত্যুফাঁদ ★ শয়তানের ঘাঁটি ★ ধ্বংসের নকশা ★ মায়ান ট্রেজার ★ ঝড়ের পূর্বাভাস ★ আক্রান্ত দূতাবাস ★ রণভূমি ★ দুর্গম গিরি ★ মরুযাত্রা ★ মাদকচক্র ★ শকুনের ছায়া ★ তুরুপের তাস ★ কালসাপ ★ গুডবাই, রানা ★ সীমা লঙ্ঘন ★ রুদ্রঝড় ★ আঁধার মঞ্চ ★ কর্নেটের বিষ ★ বোস্টন জ্বলছে ★ শয়তানের দোসর ★ নরকের ঠিকানা ★ অগ্নিপ্রাণ ★ কুহেলি রাত ★ বিষাক্ত থাবা ★ অন্তর্ঘাতক ★ মৃত্যুর হাতছানি ★ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ★ সার্বিয়া চ্যালেঞ্জ ★ দুরভিসন্ধি ★ কিলার কোবরা ★ মৃত্যুপথের যাত্রী ★ পালাও, রানা! ★ সংশয়ে।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

প্রলয়সঙ্কেত-১

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯২

এক

ওয়াশিংটন ডি. সি.। ভোর চারটে। গাঢ় ঘুমের গভীরতম প্রদেশ থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে মাসুদ রানা। অথচ এ সময় এরকমটি হওয়ার কথা নয়। তবু উঠে আসছে, কারণ বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোন নামের আধুনিক যন্ত্রণা। তৃতীয় রিঙে পুরোপুরি সজাগ হলো রানা। চোখ মেলতেই পায়ের দিকের দেয়াল ঘড়িটার ওপর চোখ পড়লো—চারটে বেজে বিশ সেকেন্ড।

খিচড়ে গেল মেজাজটা। শালা ক্রিং ক্রিংয়ের বাচ্চা! থাবা চালালো মাসুদ রানা। ধাক্কা লেগে ওটার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা টেবিল ল্যাম্পটা উল্টে যাচ্ছিলো আরেকটু হলে, কোনোমতে সামাল দিলো।

'মেজর মাসুদ রানা?' অপরিচিত, গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ।

কোঁচকানো কপাল আরও কুঁচকে গেল রানার। খেঁকিয়ে উঠলো প্রায়। 'ইয়েস!'

'আপনার জন্যে একটা মেসেজ আছে, স্যার।'

'কিসের মেসেজ? কে…?'

'ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির ডেপুটি ডিরেক্টর, জেনারেল হিলিংটন আপনাকে ভোর ঠিক ছ'টায় ফোর্ট মিড়েতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেছেন।' যতোই নরম সুরে বলার চেষ্টা করুক, আসলে অনেকটা নির্দেশের মতোই শোনালো কথাগুলো।

বিস্মিত হলো রানা। 'কেন! আমার কাছে…'

'সরি, মেজর,' একঘেয়ে সুরে বললো লোকটা। 'এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। এলেই জানতে পারবেন, স্যার।'

'আই সী,' ইতস্তত ভঙ্গিতে বললো মাসুদ রানা।

'ইজ দা মেসেজ আন্ডারস্টুড, মেজর?'

'অ্যাঁ?…হ্যাঁ। আন্ডারস্টুড।'

'ভেরি ওয়েল। আপনার এজেন্সির মেইল বক্সে একটা এনভেলপ পাবেন, স্যার। ওর মধ্যে এনএসএ-হেডকোয়ার্টারে ঢোকার গেটপাস আছে। বেরুবার সময় ওটা আনতে ভুলবেন না।'

কেটে গেল লাইনটা। ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখলো মাসুদ রানা। চিন্তায় পড়ে গেছে। এনএসএ-র কি দরকার পড়লো ওর কাছে? তা-ও হেজিপেজি নয়, স্বয়ং ডেপুটি ডিরেক্টরের দেখা করার অনুরোধ! আস্তে করে শুয়ে পড়লো ও আবার। বারোটা বেজে গেছে ঘুমের। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ঘুম আসবে না।

রাত প্রায় একটা পর্যন্ত থাকতে হয়েছে ওকে সুজান-এলিসনের বিবাহোত্তর পার্টিতে। সুজান রানার আমেরিকান বান্ধবী। রানার কড়া অনুরাগিণী ছিলো এক সময়। কিন্তু যখন টের পেলো, তার মতো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাসুদ রানার নেই, বিয়ের কথা একেবারেই ভাবছে না ও, অভিমানে গুটিয়ে নিয়েছিলো নিজেকে।

আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলো মনের দুঃখে। কিন্তু ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল হসপিটালের ডাক্তারদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সফল হয়নি তা। পুরো দু'দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর বেঁচে যায় মেয়েটি। আসলে হাসপাতালেই বাঁধা ছিলো সুজানের নিয়তি। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত জুন এলিসনের সাথে ওখানেই পরিচয় তার। প্রথম দর্শনেই একে অন্যের প্রেমে পড়ে ওরা। এর দু'মাসের মধ্যেই বিয়ে।

রানার অবশ্য কেন যেন সুবিধের মনে হয়নি জুন এলিসনকে। লোকটার চাউনিটা যেন কেমন, সব সময় যেন কি এক ফিকিরে থাকে। এমনিতে বেশ হাসিখুশি, স্মার্ট। বিরাট ব্যবসায়ী। আমেরিকায় তো বটেই, ইওরোপের প্রায় সব দেশেই একাধিক ব্যবসা আছে এলিসনের। টিম্বার, মোটর গাড়ি, কেমিক্যালস বা রিয়েল এস্টেট, এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে জুন এলিসন নেই। আজই সকাল আটটায় নিজের বিলাসবহুল ইয়টে করে জিব্রালটার যাচ্ছে সে সস্ত্রীক হানিমুন করতে।

পোর্টে ওদের সী-অফ করতে যাবে বলে কথা দিয়েছিলো মাসুদ রানা। ওটা সেরে যাবে নিজের কাজে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘড়ি দেখলো আবার, কেবল সোয়া চারটে। বিছানা ছাড়লো রানা। প্যানট্রিতে গিয়ে এক কাপ কফি তৈরি করলো।

কফি শেষ করে বাথরুমে ঢুকলো ও, বেরুলো বিশ মিনিট পর। চারকোল গ্রে স্যুট, সাদা শার্ট আর লাল টাই পরে তৈরি হলো রানা। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে এনএসএ। 'পায়ল প্রেস' যার ডাকনাম। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী।

মেরিল্যান্ডের ফোর্ট মিয়েডে পুরো বিরাশি একরের বিশাল এলাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এনএসএ-র হেডকোয়ার্টার্স। ল্যাংলির সিআইএ কমপ্লেক্সের দ্বিগুণেরও বড়। দুর্ভেদ্য এক দুর্গ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুনিয়াজোড়া কমিউনিকেশন ব্যবস্থাকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেয়াই এ এজেন্সির উদ্দেশ্য। তিন শিফটে হাজার হাজার কর্মচারী কাজ করে এখানে। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে প্রতিদিন চল্লিশ টনেরও বেশি লিখিত তথ্য ইত্যাদি এখানে রিসিভ করা হয়।

হাইওয়ে ছেড়ে ফোর্ট মিয়েডের প্রাইভেট রাস্তায় গাড়ি ঢোকালো মাসুদ রানা। রাতের অন্ধকার সবে ফিকে হতে শুরু করেছে। সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরি। আট ফুট উঁচু সাইক্লোন ফেন্স ঘেরা এনএসএ কম্পাউন্ডের প্রথম সিংহদ্বারের সামনে এসে দাঁড়ালো রানা। গেটের দু'দিকে দুটো পোস্টে চারজন সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে। একজন এগিয়ে এলো। অন্যোরা সতর্ক নজর রেখেছে ওর ওপর।

'ক্যান আই হেল্প ইউ,' বললো গার্ড।

গম্ভীর স্বরে বললো রানা, 'মেজর মাসুদ রানা, টু সী জেনারেল হিলিংটন।'

ডান হাত বাড়ালো লোকটা। 'আপনার গেটপাসটা দেখতে পারি?'

লেটার বক্সে এনভেলাপের মধ্যে যেটা পাওয়া গেছে, ওটাকে গেটপাস না বলে আইডি কার্ড বলাই ভালো। রানার স্ট্যাম্প সাইজ ফটো পেস্ট করা তিন বাই চার ইঞ্চি একটা আইডেন্টিটি কার্ড-ই ওটা। আজকের তারিখেই ইস্যু করা হয়েছে। নিচে সই করেছেন জেনারেল হিলিংটন নিজে।

এক পলক নজর বুলিয়েই কার্ডটা ফেরত দিলো গার্ড। 'থ্যাঙ্ক ইউ, মেজর।' পিছন ফিরে অন্যদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালো সে।

তাদের মধ্যে একজন ঘুরে দাঁড়ালো। খট খট বুটের আওয়াজ তুলে বাঁ দিকের পোস্টে গিয়ে ঢুকলো। পরমুহূর্তে মৃদু আওয়াজ তুলে দু'দিকে সরে গেল ইলেক্ট্রিক্যালি কন্ট্রোলড দুই পাল্লার ভারি লোহার গেট। সুইচ টিপে দিয়েই ফোনের রিসিভার তুললো লোকটা। ভেতরের কারও উদ্দেশ্যে বললো, 'মেজর মাসুদ রানা রওনা হয়ে গেছেন।'

এক মিনিট পর আবার থামতে হলো রানাকে। সামনে আরেকটা গেট। বন্ধ। এটায় একটা গার্ড পোস্ট, গার্ড দু'জন। একজন ভেতরেই থাকলো। অন্যজন এসে দাঁড়ালো গাড়ির পাশে।

'আপনার গেটপাসটা দেখতে পারি, মেজর?'

বিনা বাক্যব্যয়ে কার্ডটা বের করলো রানা। মনে মনে বিরক্ত হলেও চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। জিনিসটা ফিরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো লোকটা। 'থ্যাঙ্ক ইউ।' পোস্টের উদ্দেশে কিছু একটা ইঙ্গিত করলো সে। খুলে গেল গেট।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর আরেকটা সাইক্লোন ফেন্স। পোস্ট থেকে একজন গার্ড বেরিয়ে আসছে দেখে আগেভাগেই পাসটা বের করলো রানা। কিন্তু এবার তার দরকার হলো না, গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখেই যা বোঝার বুঝে নিলো গার্ড।

হাত তুলে সামনের বিশাল একটা বিল্ডিং দেখিয়ে বললো, 'সোজা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙে চলে যান, মেজর। ওখানে আপনার জন্যে একজন অপেক্ষা করছে।'

'ধন্যবাদ।'

গেট সরে যেতে গাড়ি ছাড়লো রানা। আকাশের পটভূমিতে হিমালয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড সাদা বিল্ডিংটার সামনের পার্কিংলটে এসে দাঁড়ালো। কমপ্লিট পরা বেসামরিক এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল বিল্ডিঙের সামনের খোলা জায়গায়। হিম ঠাণ্ডায় কাঁপছে।

'চাবিটা গাড়িতেই রেখে আসুন, মেজর,' চেঁচিয়ে বললো লোকটা। 'গাড়ি চুরি করার কেউ নেই এখানে।'

চাবি ইগনিশনে রেখে বেরিয়ে এলো মাসুদ রানা। দ্রুত পা চালালো লোকটার দিকে। রানার চেয়ে সামান্য খাটো হবে সে, ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রঙ দেখে মনে হয় বহু বছর সূর্যের আলোয় আসেনি।

'আমি ডেভিড ম্যাক্সওয়েল,' রানার সাথে হাত মেলালো লোকটা। 'আপনাকে জেনারেল হিলিংটনের অফিসে নিয়ে যেতে এসেছি।'

পা বাড়ালো ওরা। চওড়া মার্বেল পাথরের বারান্দা পেরিয়ে কম করেও ছয়-সাত

তলা সমান উঁচু সিলিংওয়ালা এন্ট্রান্স হলে ঢুকলো। ঢোকার পথেই একটা বড় টেবিল, একজন সিভিলিয়ান বসে আছে ওপাশে। তাকে পাশ কাটিয়ে দু'পা এগিয়েছে ওরা, এমন সময় পিছন থেকে ডেকে উঠলো লোকটা, 'মেজর মাসুদ রানা!'

ঘুরে দাঁড়ালো ও, পরমুহূর্তে উজ্জ্বল ফ্ল্যাশগানের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দ্রুত হাত বাড়িয়েছিলো রানা শোল্ডার হোলস্টারের দিকে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো। খুব আস্তে হলেও ক্যামেরার 'ক্লিক' শব্দটা কানে গেছে ফ্ল্যাশ জ্বলে ওঠার সাথে সাথে।

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার,' বললো লোকটা।

ম্যাক্সওয়েলের দিকে ফিরলো রানা। 'কি ব্যাপার?'

'জাস্ট আ মিনিট, মেজর।'

ঠিক ষাট সেকেণ্ডের মাথায় ক্লিপসহ একটা নীল আর সাদা রঙের ল্যামিনেটেড আইডি কার্ড ধরিয়ে দেয়া হলো রানার হাতে। আগেরটার মতোই এটাও তিন বাই চার। ওপরের ডানদিকে রানার এইমাত্র তোলা স্ট্যাম্প সাইজের ছবি।

'এটা কোটের পকেটে ঝুলিয়ে নিন, মেজর,' প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললো ক্যামেরাম্যান। 'যতোক্ষণ এই বিল্ডিঙে থাকবেন, খুলবেন না, প্লীজ।'

'বেশ।'

হল পেরিয়ে লম্বা একটা করিডরে ঢুকলো রানা আর ম্যাক্সওয়েল। সামনে তাকিয়ে অবাক হলো রানা, করিডরের যেন শেষ নেই কোথাও। মাথার ওপর দু'দিকের দেয়ালেই বিশ ফুট পর পর ফিট করা আছে ভিডিও ক্যামেরা। কাজ করে চলেছে নিঃশব্দে।

'বিল্ডিংটা কতো বড়?' অন্যমনস্কের মতো জিজ্ঞেস করলো মাসুদ রানা।

'দুই মিলিয়ন স্কয়ার ফুটের কিছু বেশি হবে, মেজর।'

'তাই?' খানিকটা বিস্মিত হলেও প্রকাশ করলো না ও।

'হ্যাঁ,' গর্বের সাথে বললো ডেভিড ম্যাক্সওয়েল। 'আর এটা হচ্ছে পৃথিবীর দীর্ঘতম করিডর। নয়শো আশি ফুট লম্বা। এখানে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলতে পারেন। বিরাট শপিং সেন্টার, ক্যাফেটেরিয়া, পোস্ট এক্সচেঞ্জ, আটটা স্ন্যাক বার, একটা বড় হসপিটাল, সব রকম অপারেশন করার ব্যবস্থা আছে তাতে, এসব তো আছেই। তাছাড়া, ধরুন গিয়ে, স্টেট ব্যাঙ্ক অভ লরেন্সের একটা শাখা, একজন ডেন্টিস্টের অফিস, ড্রাই-ক্লিনিং শপ, জুতোর দোকান, হেয়ার ট্রিমিং সেন্টারও আছে।'

মনে মনে বললো রানা, বাকি থাকলো কি? ব্রোথেল?

করিডরের মাঝামাঝি এসে ডানে ঘুরলো ম্যাক্সওয়েল। সামনে কমিউনিকেশন উইং। কমলাপুর রেল স্টেশনের মূল টার্মিনাল ভবনের মতোই বিশাল এক হলরুম। এটার সিলিং আরও উঁচু। পুরো হল ভরতি কয়েকশো ছোট-বড় নানান সাইজের কম্পিউটার। প্রতিটির সামনে বসে আছে একজন করে অপারেটর।

'ইমপ্রেসিভ, তাই না?' ওর মনোভাব টের পেয়ে বলে উঠলো ম্যাক্সওয়েল। 'এখানে আর যে সব কম্পিউটার রুম আছে, তার মধ্যে অবশ্য এটাই সবচে' ছোট। এই ভবনে, মেজর, তিন বিলিয়ন ডলারেরও বেশি দামের কম্পিউটার আর ডিকোডিং মেশিন আছে।'

'কতো লোক কাজ করে এখানে?'

'ষোলো হাজারের মতো।'

একটা প্রাইভেট এলিভেটরে উঠলো ওরা। জেনারেল হিলিংটনের ব্যক্তিগত এলিভেটর এটা। এক ফ্লোর উঠে থামলো। বেরিয়ে আরেকটা দীর্ঘ করিডরে পড়লো ওরা। থামলো এসে একেবারে করিডরের শেষ মাথায় একটা অফিস স্যুইটের বন্ধ দরজার সামনে।

'এটাই,' বললো ডেভিড ম্যাক্সওয়েল। হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে ধরলো। 'ঢুকে পড়ুন, মেজর।'

ভেতরে এসে চারদিক তাকালো মাসুদ রানা। প্রকাণ্ড রিসেপশন হল। বড় বড় চারটে টেবিলের পিছনে বসে আছে চার সুন্দরী সেক্রেটারি। বিশের বেশি হবে না কারও বয়স। তাদের একজনের দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু হাসির ভঙ্গি করলো ম্যাক্সওয়েল।

মাথা ঝাঁকালো মেয়েটি। ডেস্কের নিচে কোথাও ফিট করা একটা সুইচ টিপে দিলো। বাঁ দিকে যেটাকে নিরেট দেয়াল ভেবেছিলো রানা, সেটার গায়ে আট বাই চার ফাঁক সৃষ্টি হলো একটা।

'গেট ইন, জেন্টলমেন,' বললো মেয়েটি। 'জেনারেল আপনাদের আশা করছেন।'

'আসুন।' আগে আগে পা বাড়ালো ম্যাক্সওয়েল। তাকে অনুসরণ করে প্রায় বাস্কেটবল মাঠের সমান একটা রুমে ঢুকলো ও। ভেতরের চার দেয়াল এবং সিলিং পুরোটাই সাউণ্ডপ্রুফ। বড় আধখাওয়া চাঁদের মতো এক সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসে আছেন জেনারেল হিলিংটন, এনএসএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর–পরিচিত চেহারা। হাসি হাসি মুখে রানার দিকেই চেয়ে আছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডেপুটি।

বয়স ষাটের কিছু বেশিই হবে তাঁর। প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। মেদহীন, পাতলা-সাতলা ফিগার। হাসলে মুখটা বাংলা '৫' এর মতো দেখায়। গ্রে স্যুট, সাদা শার্ট আর গ্রে টাই পরেছেন আজ জেনারেল। দেখতে মন্দ লাগছে না। রানাকে ডেস্কের দিকে পা বাড়াতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'হ্যালো, মেজর,' ঝুঁকে ডান হাত বাড়ালেন হিলিংটন। 'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং, স্যার,' সসম্মানে বললো মাসুদ রানা।

'বসুন, প্লীজ। তুমিও বোসো, ম্যাক্সওয়েল। মেজর, কফি?'

'ইয়েস, স্যার,' মাথা দোলালো মাসুদ রানা।

'ম্যাক্সওয়েল?'

'নো, থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

একটা বাযার টিপলেন জেনারেল। প্রায় সাথে সাথেই দেয়ালের অন্যদিকে ফাঁক সৃষ্টি হলো আরেকটা। ধপধপে সাদা জ্যাকেট পরা বেঁটেমতো এক লোক হাজির হলো। তৈরিই ছিলো যেন সে। ট্রে-তে কফির সরঞ্জাম আর ডেনিশ পেস্ট্রি সাজিয়ে নিয়ে এসেছে একবারে। ট্রে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল লোকটা।

কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বললেন জেনারেল, 'আপনাকে অসময়ে ডেকে এনে হয়তো কষ্ট দিলাম, মেজর মাসুদ রানা। সেজন্যে দুঃখিত। আসলে আমাদের

ডিরেকটরের নির্দেশেই কাজটা করতে হলো। নিন,' একটা কাপ ওর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। গন্ধটা চমৎকার। সারাঘর ভরে উঠলো মুহূর্তে।

ডিরেকটর, জেনারেল ডেভিড সেরেনসনের কথা ভাবলো রানা। বিশ্বের এসপিওনাজ জগতের এক লিজেণ্ড ভদ্রলোক। যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী, তেমনি দয়ামায়াহীন চণ্ডাল। ক্ষমতায় বসার তিন বছরের মধ্যেই পৃথিবীর প্রায় ডজনখানেক দেশে সফল সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন তিনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত পুতুল সরকার বসিয়েছেন সে সব জায়গায়। ভদ্রলোক জনসমক্ষে প্রায় আসেনই না বলা চলে। কলকাঠি যা নাড়ার, আড়ালে বসেই নাড়েন।

'মেজর?'

'ইয়েস, স্যার,' সচকিত হলো মাসুদ রানা।

'খুব বড় রকম এক ফ্যাসাদে জড়িয়ে গেছি আমরা হঠাৎ করেই। এ থেকে উদ্ধার করার মতো যোগ্য ব্যক্তি এ মুহূর্তে একমাত্র আপনিই আছেন হাতের কাছে, মেজর। আপনার সাহায্য চাই আমরা।'

'কিন্তু, স্যার...'

হাত তুললেন জেনারেল। 'আমি জানি কি বলবেন আপনি। আই নো ইওর নেচার। তাই আপনাকে ফোন করার আগেই রাহাতের সাথে কথা বলে নিয়েছি আমি। এবং ওর অনুমতিও পেয়ে গেছি। আপনি জানেন, রাহাত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন?'

'জানি, স্যার।'

'ও আমার অনুরোধ রক্ষা করেছে বলে নিজেকে আমি সম্মানিত বোধ করছি, মেজর। সে যা হোক, আলোচনা শুরু করার আগে আপনি বরং ঢাকার সাথে কথা বলে নিন। শিওর হন।'

'তার দরকার নেই, স্যার। ফিরে গিয়ে অফিস থেকেই যোগাযোগ করবো।'

'আ'ইয়্যাম অ্যাফ্রেড, মেজর, সে সুযোগ নেই। অফিসে যাওয়ার সময় হবে না। এখান থেকেই সরাসরি ফিল্ডে যেতে হবে আপনাকে।'

'আই সী!' যা ভেবেছিলো, ঠিক তাই। ঝামেলা!

জেনারেল ততোক্ষণে কাজ শুরু করে দিয়েছেন, ইন্টারকমে কথা বলছেন কারও সাথে। কথা শেষ করে নামিয়ে রাখলেন হ্যাণ্ডসেট। 'এক মিনিট, প্লীজ,' রানার উদ্দেশে বললেন।

চল্লিশ সেকেণ্ডের মাথায় টেবিলের ওপর রাখা নানান রঙের গোটা ছয়েক টেলিফোনের মধ্যে লাল সেটটা বেজে উঠলো। রিসিভার কানে ধরতেই মৃদু হাসি ফুটলো ডেপুটির মুখে। 'হ্যাঁ, এখানেই আছে তোমার মাসুদ রানা। নাও, কথা বলো,' রিসিভার তুলে দিলেন তিনি ওর হাতে। 'কথা বলুন, রাহাত।'

'রানা?' অনেকদিন পর বুড়োর গলা শুনলো ও।

'জ্বি, স্যার।'

'কথা হয়েছে হিলিংটনের সাথে?'

'এখনও হয়নি, স্যার।'

'শোনো, সম্ভব হলে করে দাও কাজটা। খুব করে ধরে বসেছে। না বলতে

পারলাম না। অবশ্য, তোমার যদি আপত্তি না থাকে। করে দিলে ভালো হয় আর কি। বিনিময়ে বাংলাদেশের বড় একটা উপকারের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছি আমি।'

'ঠিক আছে, স্যার। নিচ্ছি আমি কাজটা।'

'গুড।' চেহারা দেখতে না পেলেও বুড়ো যে খুশি হয়েছে, পরিষ্কার টের পেলো রানা। 'তোমার কাজটা তাহলে রাশেদকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, কি বলো?'

'দিন, স্যার।'

'রানা?'

'জ্বি, স্যার?'

'শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখবে।'

'জ্বি।' পাল্টা কুশল জিজ্ঞেস করবে, সে সময় দিলো না বুড়ো। ফট করে কেটে দিয়েছে লাইন। রিসিভার ফিরিয়ে দিলো ও জেনারেলের হাতে। মনটা খুব খুশি খুশি লাগছে। বুড়োর ছিটেফোঁটা স্নেহ-ভালোবাসা যে কী মহামূল্যবান বস্তু, কাউকে বোঝাতে পারবে না মাসুদ রানা।

শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখলেন হিলিংটন। 'ওয়েল, মেজর?'

'বলুন, স্যার। সমস্যাটা কি?'

চেয়ার ছাড়লেন জেনারেল। হঠাৎ করেই বেশ গম্ভীর হয়ে গেছেন। কয়েক সেকেণ্ড চিন্তিত মনে পায়চারি করলেন তিনি। তারপর আবার এসে বসলেন। 'মেজর, এখন আপনি যা জানবেন, তা এক্সট্রিমলি সেনসিটিভ। অ্যাবাভ টপ্ সিক্রেট।' নজর ঘুরে এলো তাঁর রানার পাশে বসা ডেভিড ম্যাক্সওয়েলের মুখের ওপর দিয়ে।

'বুঝেছি।'

'গতকাল রোববার, সুইটজারল্যাণ্ডে ন্যাটোর একটা ওয়েদার বেলুন ক্র্যাশ করেছে। স্থানীয় সময় ছিলো তখন বিকেল, আই মীন, প্রায় সন্ধে। বেলুনটায় কিছু অত্যন্ত গোপনীয় সামরিক যন্ত্রপাতি ছিলো। সুইস সরকার অবশ্য ওগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে,' থামলেন জেনারেল হিলিংটন, ডান ভুরুর ওপরটা চুলকালেন তর্জনী দিয়ে, '...কয়েকজন ট্যুরিস্ট দুর্ঘটনাটা দেখে ফেলেছে। আমরা জানতে চাই তারা কারা। নিশ্চিত হতে চাই যেন লোকগুলো এ নিয়ে গুজব ছড়াতে না পারে। অ্যাজ আই টোল্ড ইউ, মেজর, ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। এ কথা চালাচালি হলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের। পাশাপাশি লাভবান হবে শত্রু ভাবাপন্ন কিছু দেশ। অ্যাম আই ক্লিয়ার, মেজর মাসুদ রানা?'

'জ্বি। আপনি চাইছেন, সেই ট্যুরিস্টদের সাথে কথা বলবো আমি। সতর্ক করে দেবো যেন এ-ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখে তারা।'

'ঠিক তা নয়, মেজর। আপনাকে কথা বলতে হবে না। আপনি শুধু তাদের নাম-ঠিকানা খুঁজে বের করে আমাকে জানাবেন টেলিফোনে। বাকি কাজটা আমিই করবো।'

'বেশ। লোকগুলো কি ভিনদেশী? সুইটজারল্যাণ্ডের...'

'মুশকিলটা তো ওখানেই। ওরা যে কারা, সে ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই

arsumon@yahoo.com www.murchona.com©

আমাদের। সংখ্যায় কতোজন ছিলো, কে কোন দেশী, কিছুই জানি না আমরা।'

শুনতে ভুল হয়নি তো? ভাবলো মাসুদ রানা। 'আই বেগ ইওর পার্ডন?'

'শুধু জানতে পেরেছি, তারা সবাই একটা ট্যুর বাসে ছিলো। দুর্ঘটনার সময় ওই জায়গা অতিক্রম করছিলো বাসটা। জায়গাটার নাম...' ডেভিড ম্যাক্সওয়েলের দিকে তাকালেন জেনারেল। 'কি যেন?'

'আনটেনডর্ফ।'

'রাইট, আনটেনডর্ফ। দৃশ্যটা দেখে বাস থামিয়েছিলো ড্রাইভার। ট্যুরিস্টরা খুব কাছ থেকে দেখেছে বেলুনটার ধ্বংসাবশেষ।'

ধীরে ধীরে বললো রানা, 'জেনারেল হিলিংটন, আপনি বলতে চাইছেন নাম-ঠিকানা, জাতীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা পর্যন্ত নেই, এমন একদল ট্যুরিস্টকে খুঁজে বের করতে হবে আমাকে?'

'ঠিক তাই। আপনার ফিল্ড রেকর্ড যাকে বলে একসেলেন্ট। জানি, আপনি কম করেও ছয়টি বিদেশী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। সে যোগ্যতা এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে কাজে লাগবে। যোগ্য লোক যে আমাদের হাতে নেই, একথা বলছি না। কিন্তু...স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তাদের কেউ মাসুদ রানা নয়। আপনার ওপর আমাদের ভরসার মাত্রাটা একটু বেশিই। জেনারেল সেরেনসন প্রথমেই আপনার নাম জানিয়েছেন আমাকে। এছাড়া, আমাদেরগুলো তো বটেই, সেই সাথে সিআইএ, ওএনআইসহ অন্তত আরও আধ ডজন ইন্টেলিজেন্স আউটফিটের কম্পিউটার আপনাকেই এই ব্লাইণ্ড অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে সিলেক্ট করেছে। শুধু সিলেক্ট বললে ভুল হবে, হাইলি রেকমেণ্ড করেছে।'

বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো মাসুদ রানা। বুঝতে পারছে না কি করবে। 'সুইস সরকারের কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না?' একসময় বললো ও।

'না। অ্যাসাইনমেন্টটা আপনার একার। যা করার আপনাকেই করতে হবে, কারো সাহায্য নেয়া যাবে না। সময়ও খুব অল্প। আপনার প্রতিদিনের অগ্রগতি সরাসরি টেলিফোনে জানাবেন আমাকে।' একটা স্লিপ প্যাডে খস খস করে একটা নাম্বার লিখে স্লিপটা এগিয়ে দিলেন তিনি রানার দিকে। 'দিনে রাতে যখন হোক, এই নাম্বারে আমাকে পাবেন। এয়ারপোর্টে আপনার জন্যে প্লেন অপেক্ষা করছে, মেজর। আর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে, ইউ বেটার স্টার্ট নাউ। ম্যাক্সওয়েল...'

ডাকটা কানে যেতেই আসন ছাড়লো ম্যাক্সওয়েল। জেনারেলের পিছনের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য ফাইলিং কেবিনেটের একটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ভেতর থেকে একটা বড় পেটমোটা ম্যানিলা খাম নিয়ে এসে রাখলো রানার সামনে।

'ওর মধ্যে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের কারেন্সি আছে, ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়ান হানড্রেড থাউজ্যাণ্ড ইউএস ডলার। পঁচিশ হাজার ডলারও আছে। আর আছে আপনার কয়েকটা জাল আইডি কার্ড,' বললেন জেনারেল হিলিংটন। পকেট থেকে চকচকে কালো একটা ছোট্ট ক্রেডিট কার্ড বের করলেন তিনি। 'এটাও রাখুন।'

কার্ডটা নিলো মাসুদ রানা। মাঝ বরাবর সরু একটা সাদা স্ট্রাইপ আছে ওটার। একটা টেলিফোন নাম্বার এবং একটা ব্যাঙ্কের নাম ছাড়া আর কিছু লেখা নেই।

ব্যাঙ্কের নামটাও সম্পূর্ণ অপরিচিত ওর।

'কার্ডটা একটা ব্ল্যাঙ্ক চেকের মতোই, মেজর মাসুদ রানা,' বললেন তিনি। 'কোনো আইডেন্টিফিকেশনের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনমতো যে কোনো অঙ্ক চার্জ করতে পারবেন আপনি, যে কোনো দেশে। শুধু নিচের ওই নাম্বারে একটা টেলিফোনই যথেষ্ট।'

'এটার কোনো দরকার পড়বে বলে মনে হয় না, জেনারেল,' বললো রানা।

'বলা কি যায়? দরকার হতেও তো পারে। রেখে দিন। সবসময় সঙ্গেই রাখবেন কার্ডটা, ঠিক আছে?'

'বেশ।'

'আমি তাহলে জেনারেল সেরেনসনকে জানিয়ে দিচ্ছি আপনি রওনা হয়ে গেছেন?'

'দিন,' উঠলো রানা।

'মেজর?'

'স্যার?'

'যেভাবে হোক, সব ক'জন ট্যুরিস্টকে খুঁজে বের করতে হবে আপনাকে। এর ওপরই নির্ভর করছে অনেক, অনেক কিছু।'

'রাইট।'

রানাকে পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে এলো ডেভিড ম্যাক্সওয়েল। যেখানে ছবি তোলা হয়েছিলো রানার, সেখানে একজন মেরিন ক্যাপ্টেনকে দেখা গেল। নিখুঁত ছাঁটের নেভি ইউনিফরম পরা লোকটাকে দেখেই পল নিউম্যানের কথা মনে পড়লো ওর। অবিকল সেই চেহারা।

'এ হচ্ছে ক্যাপ্টেন কেভিন হক, মেজর,' রানাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো ম্যাক্সওয়েল। 'এখন থেকে আপনার দায়িত্ব ও নেবে।'

'আপনি রেডি, মেজর মাসুদ রানা?' জানতে চাইলো হক।

'হ্যাঁ।' কিন্তু কিসের জন্যে? ভাবলো ও, জীবনে অসংখ্যবার কঠিন কঠিন সব অ্যাসাইনমেন্টের মুখোমুখি হতে হয়েছে রানাকে। তার প্রতিটির কোনো না কোনো সূত্র ছিলো–এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু এবার?

'আপনাকে সরাসরি অ্যান্ড্রুজ এয়ার ফোর্স বেসে নিয়ে যাবো আমি, মেজর।'

'চলুন।'

পিছন থেকে ম্যাক্সওয়েল বলে উঠলো, 'আপনার নতুন কাপড় চোপড়, বা আর সব প্লেনেই পাবেন, মেজর রানা।'

'ও কে। থ্যাঙ্কস।' বুকে ঝোলানো আইডি কার্ডটা খুলে ডেস্কের ওপর দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে দিলো ও ক্যামেরাম্যানের দিকে।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলো রানা আর হক। সূর্য উঠি উঠি করছে। ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে বাইরে। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের গাড়িটা কোথাও দেখতে পেলো না রানা। ওটার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কুচকুচে কালো, লম্বা এক লিমুজিন। ওরটার প্রায় দ্বিগুণ লম্বা।

'আপনার গাড়ি আমাদের হেফাজতে আছে, মেজর,' ওর মনের কথা বুঝে

টু ওয়ান হানড্রেড থাউজ্যাণ্ড ইউএস ডলার। পঁচিশ হাজার ডলারও আছে। আর আছে আপনার কয়েকটা জাল আইডি কার্ড,' বললেন জেনারেল হিলিংটন। পকেট থেকে চকচকে কালো একটা ছোট্ট ক্রেডিট কার্ড বের করলেন তিনি। 'এটাও রাখুন।'

কার্ডটা নিলো মাসুদ রানা। মাঝ বরাবর সরু একটা সাদা স্ট্রাইপ আছে ওটার। একটা টেলিফোন নাম্বার এবং একটা ব্যাঙ্কের নাম ছাড়া আর কিছু লেখা নেই। ব্যাঙ্কের নামটাও সম্পূর্ণ অপরিচিত ওর।

'কার্ডটা একটা ব্ল্যাঙ্ক চেকের মতোই, মেজর মাসুদ রানা,' বললেন তিনি। 'কোনো আইডেন্টিফিকেশনের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনমতো যে কোনো অঙ্ক চার্জ করতে পারবেন আপনি, যে কোনো দেশে। শুধু নিচের ওই নাম্বারে একটা টেলিফোনই যথেষ্ট।'

'এটার কোনো দরকার পড়বে বলে মনে হয় না, জেনারেল,' বললো রানা।

'বলা কি যায়? দরকার হতেও তো পারে। রেখে দিন। সবসময় সঙ্গেই রাখবেন কার্ডটা, ঠিক আছে?'

'বেশ।'

'আমি তাহলে জেনারেল সেরেনসনকে জানিয়ে দিচ্ছি আপনি রওনা হয়ে গেছেন?'

'দিন,' উঠলো রানা।

'মেজর?'

'স্যার?'

'যেভাবে হোক, সব ক'জন ট্যুরিস্টকে খুঁজে বের করতে হবে আপনাকে। এর ওপরই নির্ভর করছে অনেক অনেক কিছু।'

'রাইট।'

রানাকে পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে এলো ডেভিড ম্যাক্সওয়েল। যেখানে ছবি তোলা হয়েছিলো রানার, সেখানে একজন মেরিন

ক্যাপ্টেনকে দেখা গেল। নিখুঁত ছাঁটের নেভি ইউনিফরম পরা লোকটাকে দেখেই পল নিউম্যানের কথা মনে পড়লো ওর। অবিকল সেই চেহারা।

'এ হচ্ছে ক্যাপ্টেন কেভিন হক, মেজর,' রানাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো ম্যাক্সওয়েল। 'এখন থেকে আপনার দায়িত্ব ও নেবে।'

'আপনি রেডি, মেজর মাসুদ রানা?' জানতে চাইলো হক।

'হ্যাঁ।' কিন্তু কিসের জন্যে? ভাবলো ও, জীবনে অসংখ্যবার কঠিন কঠিন সব অ্যাসাইনমেন্টের মুখোমুখি হতে হয়েছে রানাকে। তার প্রতিটির কোনো না কোনো সূত্র ছিলো—এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু এবার?

'আপনাকে সরাসরি অ্যাণ্ড্রুজ এয়ার ফোর্স বেসে নিয়ে যাবো আমি, মেজর।'

'চলুন।'

পিছন থেকে ম্যাক্সওয়েল বলে উঠলো, 'আপনার নতুন কাপড় চোপড়, বা আর সব প্লেনেই পাবেন, মেজর রানা।'

'ও কে। থ্যাঙ্কস।' বুকে ঝোলানো আইডি কার্ডটা খুলে ডেস্কের ওপর দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে দিলো ও ক্যামেরাম্যানের দিকে।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলো রানা আর হক। সূর্য উঠি উঠি করছে। ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে বাইরে। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের গাড়িটা কোথাও দেখতে পেলো না রানা। ওটার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কুচকুচে কালো, লম্বা এক লিমুজিন। ওরটার প্রায় দ্বিগুণ লম্বা।

'আপনার গাড়ি আমাদের হেফাজতে আছে, মেজর,' ওর মনের কথা বুঝে বললো ক্যাপ্টেন। 'ওটা নিয়ে ভাববেন না। চলুন।'

কয়েক সেকেণ্ড পর প্রায় নিঃশব্দে স্টার্ট নিলো লিমুজিন। নাক ঘুরিয়ে রওনা হলো সাইক্লোন ফেন্সের দিকে।

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

দুই

পেন্টাগন—পৃথিবীর বৃহত্তম অফিস বিল্ডিং। এতোই বড়, এর প্রতি তলার সবগুলো করিডর এক করলে দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে সতেরো মাইল। সামরিক-অসামরিক মিলিয়ে উনত্রিশ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করে পেন্টাগনে। ভবনটির পুরো ছয়তলা জুড়ে ওএনআই বা অফিস অভ ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের সদর দফতর।

ভেতরের ডেস্ক চেয়ার আর ফাইলিং কেবিনেটের রঙ হয় অলিভ গ্রীন, নয়তো ব্যাটলশিপ গ্রে। যা দেখে যে-কারও সমুদ্রের কথাই মনে পড়বে। প্রথম রঙটা মনে করিয়ে দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা এবং পরেরটা ভিয়েতনাম যুদ্ধের।

নিজের বিশাল অফিস স্যুইটে বসে আছে ওএনআই-এর অ্যাকটিং ডিরেকটর, জিমি স্টুয়ার্ট। চর্বি বোঝাই বিশাল বপু। দু'গাল আর থুতনির চর্বির ওজনই হবে পাঁচ কেজির মতো। বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বড় জোর। এই বয়সেই এতো বড় আর গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগাতে পেরেছে সে শুধু খুঁটির জোরে। তার শ্বশুর, ডোনাল্ড রীক সেই খুঁটি—বড্ডো মজবুত খুঁটি।

জিমি স্টুয়ার্ট তখন টগবগে যুবক, বয়স মাত্র আটাশ বছর। নেভিতে ছিলো সে, ক্যাপ্টেন। নৌ-বাহিনীর নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। আর্মি আর নেভি সেবার আন্তঃবাহিনী ফুটবল ফাইন্যালে

মুখোমুখি। প্রথম থেকেই সুবিধে করতে পারছে না নেভি, অর্ধেক গড়িয়ে গেছে খেলা, এখনও পর্যন্ত একটা গোলও করতে পারেনি—অথচ খেয়ে বসে আছে চার-চারটি গোল।

স্টুয়ার্ট ছিলো ফুলব্যাক, নেভির একমাত্র বিশ্বস্ত গোলদাতা। বলতে গেলে তার ওপর-ই নির্ভর করছে গোটা দল, অথচ, খেলা আরম্ভ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পায়ে শক্ত আঘাত পেয়ে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে সে। গ্যালারির নেভি সমর্থকরা চেঁচিয়ে উৎসাহ যোগাচ্ছে তাকে। পুরো স্টেডিয়াম মাথায় তুলে নিয়েছে তারা চিৎকারে।

এই সময় হঠাৎ করেই বলটা হাতে পেলো স্টুয়ার্ট। শুধু বল-ই নয়, সেই সাথে যেন ভবিষ্যৎটাও ধরা দিলো। দলের অবস্থা চিন্তা করে খেপে উঠলো সে। সামনে তখন দুটো টাচ্ডাউন আর একটা কনভারশন। পায়ের ব্যথা ভুলে মত্ত ষাঁড়ের মতো ছুটলো স্টুয়ার্ট, আর্মি ব্যূহ ভেদ করে সাঁই সাঁই ছুটছে প্রথম টাচ্ডাউনের লক্ষ্যে।

সফল হলো স্টুয়ার্ট, একটা ফিল্ড গোল পেলো নেভি। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল ক্যাপ্টেনের, শুরু হলো তার তাণ্ডব নৃত্য। মাত্র সাত মিনিটের মাথায় ফলাফল দাঁড়ালো আর্মি-৪, নেভি-৪। ঘাবড়ে গেল আর্মি। এবার স্টুয়ার্টের অন্য পায়ে আঘাত করা হলো। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। জ্বলতে লাগলো প্রচণ্ড রাগে।

ওদিকে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সব দর্শক, আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। একজন ডাক্তার ছুটে এলো তার দিকে, জখম পরীক্ষা করে দেখতে চাইলো। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলো স্টুয়ার্ট। শেষ বাঁশি বাজার আর কয়েক সেকেণ্ড মাত্র বাকি তখন। ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখে প্রচণ্ড হাততালিতে অভিনন্দন জানাতে লাগলো দর্শক। ওদিকে ভিআইপি গ্যালারিতে কয়েকজন হাই আর্মি অফিশিয়ালের সাথে খেলা দেখছেন মালটি বিলিওনেয়ার, ডোনাল্ড রীক এবং তাঁর সুন্দরী যুবতী মেয়ে, পলা।

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

রেফারীর বাঁশি বেজে উঠলো, লেটারাল পাসের সঙ্কেত। নিজের দশ গজ লাইনের ভেতর বল যোগান দেয়া হলো স্টুয়ার্টকে, ওটা আঁকড়ে ধরে জানপ্রাণ বাজি রেখে ছুটলো সে। তার প্রশস্ত, পেশীবহুল দুই কাঁধের ধাক্কায় ছিটকে পড়তে লাগলো প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা। বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে, তেমন সুযোগই পেলো না কেউ। শেষ বাঁশি বাজার মাত্র দু'সেকেণ্ড আগে গোল লাইন অতিক্রম করলো জিমি স্টুয়ার্ট—চার বছরের মধ্যে সেবারই প্রথম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করলো নেভি।

দর্শকরা যখন উন্মত্তের মতো হাত নেড়ে, গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, পলা তখন বাপের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'হিরোটার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দাও।'

পলা জানতে ভীষণ আগ্রহী হয়ে পড়েছিলো ষাঁড়টা বিছানায় কেমন। পরে জেনেছে সে। হতাশ হতে হয়নি তাকে। ছয় মাস পর বিয়ে করলো স্টুয়ার্ট-পলা। অবসর নেয়ার পর শ্বশুরের সঙ্গে ব্যবসায় নামে জিমি স্টুয়ার্ট। ধীরে ধীরে তার সামনে উন্মোচিত হয় নতুন এক জগৎ, রহস্যময়। যার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না তার।

বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক তার শ্বশুর, ডোনাল্ড রীক। সেই সাথে দেশের বাঘা বাঘা সব পলিটিশিয়ানের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব। অনেক চেষ্টা করেও শ্বশুরের অতীত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি স্টুয়ার্ট, সব কেমন ছায়াঢাকা। দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই আছে তাঁর ব্যবসা। মানুষটি প্রকাণ্ডদেহী। বয়স সত্তর, অথচ দেখলে পঞ্চাশের বেশি মনেই হয় না।

শ্বশুরের ব্যাপারে বেশ কিছু গুজব কানে এসেছে স্টুয়ার্টের। আরবের কোন্ এক আমীরের অসংখ্য স্ত্রীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী, যুবতী স্ত্রীটি নাকি হাবুডুবু খাচ্ছে তাঁর প্রেমে। এছাড়া, শোনা যায় কয়েক বছর আগে নাইজেরিয়ায় সফল এক শ্রমিক বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন

ডোনাল্ড রীক। ব্যাপারটা কিভাবে যেন টের পেয়ে যায় সে দেশের সরকার, তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় আধডজন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করে। কিন্তু কিভাবে কে জানে, সব ধামাচাপা পড়ে যায় হঠাৎ করে।

এমনি আরও অনেক গুজব আছে। যার অনেকগুলো কল্পনাকেও হার মানায়। ওদের বিয়েতে খুশি মনেই মত দিয়েছিলেন ডোনাল্ড রীক। জাত ব্যবসায়ী। জানতেন, ভবিষ্যতে স্টুয়ার্ট কাজে আসবে। অবসর নেয়ার দু'বছরের মধ্যেই তার জোর তদবিরের ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয় স্টুয়ার্টকে। কয়েক বছর সেখানে দায়িত্ব পালন করার পর দেশে বদলি করা হয় তাকে, জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত করে।

এর মাত্র একবছর পর, হঠাৎ করেই ওএনআই-এর আগের অ্যাকটিং ডিরেক্টর, জেনারেল হার্ডিম্যান পদচ্যুত হন। এবং জিমি স্টুয়ার্ট নির্বাচিত হয় পদটির জন্যে।

কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা একদম সহ্য করতে পারে না জিমি স্টুয়ার্ট। যেমন অবাধ্যতা। এই একই কারণে মাসুদ রানাকে সহ্য করতে পারে না সে একেবারেই। লোকটা যেমন বেয়াড়া, তেমনি একগুঁয়ে। এতোই স্পর্ধা যে তাকে পর্যন্ত অমান্য করার সাহস দেখিয়েছে লোকটা!

বছর তিনেক আগের কথা। ওএনআই অ্যাকটিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব নিয়েছে স্টুয়ার্ট মাস কয়েক আগে। হঠাৎ খবর এলো, এক পূর্ব জার্মান নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী ডিফেক্ট করতে চাইছেন। মনে মনে আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়ার ফিকিরে আছেন। খবরটা শোনামাত্র ব্যস্ত হয়ে উঠলো জিমি স্টুয়ার্ট, কাকে পাঠানো যায় ভাবতে লাগলো।

কিন্তু হাতের কাছে তেমন কেউ-ই ছিলো না। শেষমেষ কমপিউটারের শরণাপন্ন হয় সে। দেখা গেল, মেজর মাসুদ রানাই তাদের প্রথম পছন্দ। ওই সময় ওয়াশিংটনেই ছিলো রানা, ছুটিতে।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

অনেক কষ্টে রাজি করানো হলো তাকে। কিছু কঠিন কাজ নয়, শুধু বিজ্ঞানীকে পৌঁছে দিতে হবে যুক্তরাষ্ট্রে।

অথচ রানা জানতো, কাজটা সাঙ্ঘাতিক কঠিন হবে। কারণ, পূর্ব জার্মান সেন্ট্রাল সিকিউরিটি সিক্রেট পুলিস বা এসটিএএসআই জিমি স্টুয়ার্ট জানার আরও এক সপ্তাহ আগেই টের পেয়ে যায় ব্যাপারটা। কড়া নজর ছিলো তাদের বিজ্ঞানীর ওপর। তবুও ওএনআই-এর চাপাচাপিতে কাজটা নিলো মাসুদ রানা।

বহু কষ্টে বিজ্ঞানীকে নিয়ে পূর্ব জার্মান বর্ডারে পৌঁছুলো রানা। এই সময় মেসেজ পাঠালো স্টুয়ার্ট, অ্যাসাইনমেন্ট ক্যানসেলড্। বিজ্ঞানীকে সঙ্গে আনার দরকার নেই, আপনি ফিরে আসুন।

'অসম্ভব,' প্রতিবাদ জানালো মাসুদ রানা। 'লোকটাকে মেরে ফেলবে ওরা তাহলে।'

'ওটা তার সমস্যা। আপনাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

কোনো পথ না পেয়ে শেষে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফের সাথে যোগাযোগ করে মাসুদ রানা। সব জানায় তাঁকে। খুশিই হয়েছিলেন ভদ্রলোক। লোক পাঠিয়ে বিজ্ঞানীকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন তিনি।

মাসুদ রানার এই অবাধ্যতা নিয়ে পরে শ্বশুরের সঙ্গে আলোচনা করেছিলো জিমি স্টুয়ার্ট। ব্যাপার শুনে মন্তব্য করেছিলেন ডোনাল্ড রীক, 'এরা বিপজ্জনক। সময় থাকতে এদের মতো চরিত্রগুলোকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়াই ভালো। মনে রেখো।'

পরামর্শটা মনে রেখেছে জিমি স্টুয়ার্ট, ভোলেনি।

অটোয়া, কানাডা।

লোকটির কোড নেম, কোবরা। আসল নাম-পরিচয় জানে না কেউ। শহরের বাইরে এক মিলিটারি কমপ্লেক্সে বারো সদস্যের বিশেষ

এক কমিটির উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছে সে। যে ঘরটিতে বৈঠক বসেছে, চারদিক থেকে সেটিকে ঘিরে রেখেছে অত্যাধুনিক অটোমেটিক অস্ত্রধারী এক প্লাটুন সোলজার।

'অপারেশন ডুমসডের সূচনা করা হয়ে গেছে,' বললো কোবরা। 'দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের যতো দ্রুত সম্ভব খুঁজে বের করা হবে। ইচ্ছে করলে এ কাজটা আমরা রেগুলার সিকিউরিটি চ্যানেলের সাহায্যেই করতে পারতাম, কিন্তু তাতে আসল ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। যতো বেশি মানুষ জানবে ঘটনাটা, ফাঁস হওয়ার আশঙ্কাও ততোই বেশি। তাই মাত্র একজনকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।'

'কাকে ব্যবহার করছি আমরা?' সামনে বসা বিশালদেহী একজন বলে উঠলো। লোকটি রাশিয়ান।

'নাম তার মাসুদ রানা। এক্স আর্মি অফিসার। মেজর।'

'তাকেই কেন সিলেক্ট্ করা হলো?' জিজ্ঞেস করলো জার্মান। অভিজাত চেহারা। চোখের রঙ গাঢ় নীল।

'সিআইএ, এফবিআই, ওএনআইসহ আরও গোটা ছয়েক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কমপিউটার তাকেই এই ব্লাইণ্ড অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে উপযুক্ত বলে মত দিয়েছে,' বললো কোবরা।

লাজুক চেহারার জাপানী বলে উঠলো, 'তার যোগ্যতা সম্পর্কে বলুন, প্লীজ।'

'মেজর মাসুদ রানা একজন হাইলি এক্সপিরিয়েন্সড্ ফিল্ড অফিসার। ছ'টি বিদেশী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। তার যোগ্যতার ভুরি ভুরি উদাহরণ দেয়া যায়, কিন্তু তার আসলে কোনো দরকার নেই। অনর্থক সময় নষ্ট হবে তাতে। লোকটার আরও একটা বিশেষ যোগ্যতা আছে, কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। একদম একা সে।'

'মিশনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে সে নিশ্চই?' বললো ব্রিটিশ।

মাথা দোলালো কোবরা জোরের সাথে। 'অবশ্যই!'

'এবং মিশনের উদ্দেশ্য? সেটাও কি জানে?' এ লোক ফরাসী। চেহারা দেখে মনে হয় সবকিছুতেই যেন চরম বিরক্তি তার।

'না। জানে না।'

চালাক চতুর দেখতে চীনা সদস্য বললো, 'ট্যুরিস্টদের সবাইকে সনাক্ত করার পর, মানে, যদি পারে, নিশ্চই পুরস্কৃত করা হবে তাকে?'

'ভালো প্রশ্ন করেছেন,' কঠিন হাসি ফুটলো কোবরার মুখে। হ্যাঁ। 'তখন...তার উপযুক্ত পুরস্কার নির্ধারিত হয়েই আছে।'

মেঘ ফুঁড়ে জুরিখের উদ্দেশে ছুটে চলেছে এয়ারফোর্সের একটা সি ২০ এ জেট। আরোহী মোট পাঁচজন। মাসুদ রানা, একজন পাইলট, একজন কো-পাইলট, একজন নেভিগেটর এবং একজন স্টুয়ার্ড। সবাই এয়ারফোর্সের পোশাক পরা।

ভেতরটা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। বিমানটির বাইরে, লেজের কাছে লম্বা, ছিপের মতো দেখতে একটা হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানটেনা বেরিয়ে থাকতে দেখেছে রানা ওঠার সময়। এখানে ওখানে ঝুলছে বারোটা লাল ওয়াল মাউন্টেড টেলিফোন। সাদা টেলিফোনও আছে একটা। বিমানটির রেডিও ট্র্যান্সমিট করা হচ্ছে কোডে, রাডার মিলিটারি ফ্রিকোয়েন্সিতে।

চার আসনের অত্যন্ত বিলাসবহুল এক কেবিনে বসে আছে মাসুদ রানা। সামনের দেয়ালে বড় পর্দায় ছবি চলছে—ক্লিন্ট ইস্টউডের ওয়েস্টার্ন। খামোকাই চলছে, দর্শকের কোনও খেয়ালই নেই সেদিকে। মিশনটি সম্পর্কে বি.সি.আই চীফকে অবহিত করার জন্যে রিপোর্ট লেখায় ব্যস্ত সে।

পাইলটের খ্যানখেনে ধাতব কণ্ঠে চমক ভাঙলো রানার। 'আর দশ মিনিটের মধ্যে জুরিখ এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছি আমরা, মেজর।'

উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙলো মাসুদ রানা। বাইরে তাকালো। জুরিখ আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের দুই সারি নীলচে ল্যাণ্ডিং লাইট চোখে পড়লো। আনমনে সেদিকে তাকিয়ে ভাবছে ও, খড়ের গাদার ভেতর থেকে অজ্ঞাত সংখ্যক কয়েকটা সূঁচ খুঁজে বের করতে হবে। অবশ্য তার আগে আরেকটা কাজ করতে হবে ওকে। সেই খড়ের গাদাটা কোথায় আছে, খুঁজতে হবে।

আবার শোনা গেল পাইলটের গলা। 'ফ্যাসেন ইওর সীট বেল্ট, প্লীজ, মেজর।'

দু'মিনিট পর ল্যাণ্ড করলো বিমানটি। মূল টার্মিন্যাল ভবনের দিকে না গিয়ে ঘুরে ছোট জেনারেল এভিয়েশন ভবনের সামনে থামলো। কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো রানা। স্টুয়ার্ড দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। একহাতে একটা মাঝারি স্যুটকেস, অন্যহাতে একটা ব্রিফকেস।

পাইলটও বেরিয়ে এসেছে ককপিট ছেড়ে। সহাস্যে রানার হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললো সে, 'গুড লাক, মেজর।'

'থ্যাঙ্কস।'

পাঁচ মিনিট পর শহরের দিকে ছুটলো রানার ট্যাক্সি। সি ২০এ-ও মাটি ছেড়েছে ততোক্ষণে। মাথার ওপর দিয়ে সগর্জনে উড়ে চলেছে ফিরতি পথে। ওটার দুই ডানায় আর পেটের কাছে তিনটে উজ্জ্বল বাতি ঘন ঘন জ্বলছে-নিভছে।

ওয়াশিংটন। টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে ওএনআই অ্যাকটিং ডিরেকটর, জিমি স্টুয়ার্ট। 'খবর পাওয়া গেছে?'

উত্তর এলো, 'হ্যাঁ। এইমাত্র ল্যাণ্ড করেছে।'

'যাক, নিশ্চিন্ত হলাম,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো স্টুয়ার্ট। 'আসল কাজ শুরু করা যেতে পারে এবার, কি বলেন?'

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'শুরুর আর বাকিটা আছে কি হে? সে তো কখন শুরু হয়ে গেছে।'

'ও হ্যাঁ, ঠিক। তাইতো!' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো স্টুয়ার্ট। ভুঁড়ি কাঁপিয়ে, শরীর দুলিয়ে হাসলো সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর জোর করে হাসি থামিয়ে কোনোরকমে বললো, 'সত্যি, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

জুরিখ হিলটন হোটেলটা ভালো লাগে মাসুদ রানার। এলে এখানেই ওঠে ও প্রতিবার। এবারও উঠলো। ভেতরের নিউজপেপার কিওস্ক থেকে প্রথমেই একটা সুইস ট্যুরিস্ট গাইড-বুক কিনলো ও। রাত হয়ে গেছে। অফিস-আদালত সব বন্ধ। ঠিক করেছে, আজ আর নয়, কাল সকালেই হাত দেবে কাজে।

সকাল আটটায় তৈরি হয়ে নিচে নামলো রানা। রিসেপশন ডেস্ক-লাগোয়া কাঁচঘেরা একটা রুম, বড় বড় অক্ষরে লেখাঃ হিলটন কার সার্ভিস। রানাকে ঢুকতে দেখে এগিয়ে এলো এক সুন্দরী। 'গুড মর্নিং,' জার্মান ভাষায় বললো সে। 'আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি?'

'গুড মর্নিং। একটা কার চাই। হবে?' ঝরঝরে জার্মানে বললো ও।

'নিশ্চই।' নিজের ডেস্কে গিয়ে বসলো সুন্দরী। 'কতোদিনের জন্যে লাগবে?' ড্রয়ার থেকে একটা ছাপানো ফর্ম বের করলো।

তা কি ছাই আমিই জানি? 'ঠিক নেই।' তার মুখোমুখি বসলো রানা।

'বেশ। এই ফর্মটা পূরণ করুন, প্লীজ।'

কাজটা সেরে পকেট থেকে সুইস কারেন্সি বের করতে যাচ্ছিলো ও। কিন্তু মত পাল্টে জেনারেল হিলিংটনের দেয়া কালো ক্রেডিট কার্ডটা বের করলো। উল্টেপাল্টে কার্ডটা পরীক্ষা করলো মেয়েটি চোখ কুঁচকে। বেশ দ্বিধায় পড়ে গেছে মনে হলো। 'এক্সকিউজ মি,' বলে উঠলো সে। চেয়ারের পিছনের একটা দরজা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল। মিনিট দুয়েক পর মেয়েটি ফিরে আসতে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কোনো

সমস্যা?'

'নাহ্!' ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসলো সুন্দরী।

পাঁচ মিনিট পর একটা প্রায় নতুন ক্যাডিলাক নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রানা হোটেল ছেড়ে। ট্যুরিস্ট গাইডটা মোটামুটি ভালোই কাজ দিয়েছে। মোট ছয়টা অল-ডে ট্যুর বাস সার্ভিসের খোঁজ পেয়েছে ও তাতে, জুরিখ থেকে জেনেভা আসা যাওয়া করে বাসগুলো। আগে ওগুলো দেখতে হবে।

হোটেলের সবচেয়ে কাছের বাস কোম্পানি থেকে শুরু করলো মাসুদ রানা। নামঃ ট্যুর সার্ভিস। ভেতরে ঢুকলো ও। দু'জন টিকেটিং অফিসার ছাড়া আর কেউ নেই। একজন কাজে ব্যস্ত, অন্যজন গ্লাস প্যানেলের ভেতর দিয়ে রাস্তা দেখছে। দ্বিতীয় লোকটিকেই পছন্দ হলো রানার।

'এক্সকিউজ মি,' বললো ও। 'গত রবিবার আমার স্ত্রী আপনাদের বাসে আনটেনডর্ফ গিয়েছিলেন। নামার সময় হ্যাণ্ডব্যাগটা বাসেই ফেলে রেখে গেছেন তিনি। আমি ওটা নিতে এসেছি।'

ভুরু কোঁচকালো লোকটা। 'আপনার নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে, স্যার। আমাদের বাস ওদিকে যায়নি সেদিন।'

'ওহ্ হো, তাই নাকি? সরি। তাহলে বোধহয় ভুল-ই হয়ে গেছে। থ্যাঙ্ক ইউ।'

পরেরটায় এলো রানা। টুরিজমা রেইজেন। 'আপনাদের বাস আনটেনডর্ফ যায় নিশ্চই?'

'জা,' হেসে মাথা দোলালো জার্মান ক্লার্ক। 'সুইটজারল্যাণ্ডের সবখানেই যায় আমাদের বাস। আনটেনডর্ফ ছাড়াও সব ভালো ভালো দর্শনীয় স্থানে যায়। যেমন, যেরম্যাট, টেল স্পেশাল। এছাড়াও গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেস, পাম এক্সপ্রেস। পনেরো দিন পর পর…'

হাত তুলে এক্সপ্রেস ট্রেনটাকে থামালো মাসুদ রানা। 'জা?' চোখ

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

পিট্ পিট্ করলো সে।

'গত রবিবার আপনাদের বাস আনটেনডর্ফে লেট করেছিলো অনেকক্ষণ। ওখানে নাকি এক বেলুন দুর্ঘটনা ঘটেছিলো।'

'নেইন! নেইন!' মাথা দোলালো ক্লার্ক। 'আমরা অত্যন্ত গর্বের সাথে দাবি করতে পারি, আমাদের বাস কোনো আনশিডিউলড্ জায়গায় থামে না। লেট হবার প্রশ্নই আসে না।'

'তার মানে, আনটেনডর্ফে সেদিন দাঁড়ায়নি আপনাদের বাস?'

'না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

পরেরটা সানশাইন ট্যুরস। কাউন্টারে এক টেকোমাথাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে গেল মাসুদ রানা। 'এক্সকিউজ মি। আপনাদের ট্যুর সার্ভিস সম্পর্কে জানতে আগ্রহী আমি।'

'শিওর, শিওর!'

'গত রবিবার আনটেনডর্ফে প্রায় আধ ঘণ্টা লেট করেছিলো আপনাদের বাস।'

মাথা নাড়লো টেকো। 'জ্বি, না। আমরা সময় মেনে চলি কড়াকড়িভাবে।'

ধুত্তোর! বিরক্ত হয়ে উঠলো রানা। 'কিন্তু আমি যে শুনলাম...।'

'ভুল শুনেছেন। আমাদের বাস মাত্র পনেরো মিনিটের জন্যে দাঁড়িয়েছিলো।' রানাকে আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখে জিজ্ঞেস করলো সে, 'কেন জানতে চাইছেন?'

পকেট থেকে চট্ করে জেনারেল হিলিংটনের দেয়া একটা ভুয়া আইডি কার্ড বের করলো রানা। ট্রাভেল অ্যাণ্ড লেইজার ম্যাগাজিনের জুরিখ রিপোর্টার আমি। অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের ট্যুর সার্ভিসগুলো সময় মেনে চলার ব্যাপারে কতোটা এফিশিয়েন্ট, সে ব্যাপারে একটা প্রবন্ধ লিখছি।'

'খুব ভালো কথা,' খুশি হয়ে উঠলো লোকটা। 'তা বলুন, এ ব্যাপারে কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'সেই ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে পারি, সেদিন যে গাড়ি চালাচ্ছিলো?'

'তাকে কি দরকার?'

'এমনিই কথা বলতাম আর কি!'

'আজ তার ডে-অফ। কাল পাবেন তাকে। আপনার প্রবন্ধে আমাদের কোম্পানির নাম থাকবে তো?'

'অবশ্যই। কোথায় থাকে লোকটা? বাসা কোথায়?'

একটা কাগজে লিখলো টেকোঃ কার্ল ম্যালডেন, ক্যাপেল। 'এই নিন, তার নাম-ঠিকানা। জুরিখের চল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণে থাকে সে। এলবিস পাহাড়ের চুড়োয় ছোট্ট এক গ্রামে।'

'ধন্যবাদ,' কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে পকেটে ঢোকালো রানা। 'বাই দ্য ওয়ে, ওইদিন কতোজন যাত্রী ছিলো আপনাদের বাসে?'

'দাঁড়ান, দেখছি।' একটা খাতা খুলে ভেতরে চোখ বোলালো লোকটা। 'হ্যাঁ, পেয়েছি...রোববার, চোদ্দ তারিখ...সাতজন,' মুখ তুললো সে। 'সাতজন প্যাসেঞ্জার ছিলো।'

'তাদের নাম-ঠিকানা আছে ওতে?'

'না। কোনো যাত্রীর নাম-ঠিকানা রাখি না আমরা। সারাদিন কতো ট্যুরিস্ট আসে যায়...বুঝলেন না?'

'ধন্যবাদ,' বেরিয়ে এলো মাসুদ রানা। গাড়ি ছোটালো সোজা মাউন্ট এলবিসের দিকে। ছোট ছোট পাহাড়ঘেরা জুরিখ শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো ও, ল্যাভেসনেরেল ধরে দ্রুত এগিয়ে চললো দক্ষিণে। জায়গাটা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে রানার। এলবিস হচ্ছে সুইটজারল্যাণ্ডের নয়নাভিরাম আলপস্ পর্বতমালার শুরু।

একে একে এডলিসউইল, ল্যাংনাউ, হসেন ইত্যাদিসহ আরও

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

অনেক নাম না জানা গ্রাম পেরিয়ে এলো রানা। দূর থেকে গ্রামগুলোকে মনে হয় ঠিক যেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। প্রায় ত্রিশ মিনিট চলার পর শেষ হয়ে গেল সমতল পথ, চড়াই শুরু হলো। চওড়া, মসৃণ এবং ট্রাফিক শূন্য পথ দিয়ে পঙ্খীরাজের মতো উড়ে চললো ক্যাডিলাক।

চল্লিশ মিনিট লাগলো ক্যাপেল পৌঁছুতে। এলবিসের চূড়োয় একটা রেস্টুরেন্ট, একটা গির্জা, একটা পোস্ট অফিস এবং ছড়ানো ছিটানো ডজনখানেক বাড়ি—এই নিয়ে গ্রাম। মেইন রাস্তা থেকে সরু সরু প্রাইভেট রাস্তা গিয়ে মিশেছে ওগুলোর সাথে।

রেস্টুরেন্টটার সামনে এসে থামলো মাসুদ রানা। অল্পবয়সী একটি মেয়ে এগিয়ে এলো দামি গাড়ি দেখে। রানা জিজ্ঞেস করলো, 'এনট্শুলডিগেন সিয়ে বিট্টি···গুড আফটারনুন। কার্ল ম্যালডেনের সাথে দেখা করতে এসেছি আমি। চেনেন তাকে?'

'জা,' মাথা দোলালো মেয়েটি। হাত তুলে গির্জার সবচেয়ে কাছের বাড়িটা দেখালো। 'ওটায় থাকেন হের ম্যালডেন।'

'ড্যাঙ্কি।'

বাড়িটা পাথরের তৈরি, দোতলা। লাল টালির ছাদ। কাঠের দরজাগুলো খুবই মজবুত। নক্ করলো রানা। আগেই দেখে নিয়েছে, কলিং বেল নেই। ভীষণ মোটা এক মহিলা দরজা খুললো। নাকের নিচে হালকা মোচের রেখা। 'জা?' রানার আপাদমস্তক চোখ বোলালো মহিলা।

'হের ম্যালডেন আছেন?' সবিনয় জানতে চাইলো রানা।

চাউনিতে সন্দেহ ফুটলো মহিলার। 'কি দরকার তাকে?'

'আমি একজন সাংবাদিক, সুইস বাস ড্রাইভারদের ওপর একটা ম্যাগাজিন আর্টিকেল তৈরি করছি।'

'আচ্ছা!'

'জ্বি। আপনি নিশ্চয়ই মিসেস ম্যালডেন?'

উত্তর না দিয়ে হাসলো মহিলা।

'আপনার স্বামীর ড্রাইভিং রেকর্ড খুব ভালো। এই সুযোগে তাঁর একটা সাক্ষাৎকারও ছেপে দেবো ভাবছিলাম।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। তাড়াতাড়ি বললো, 'আগে বলবেন তো! আসুন, ভেতরে আসুন।' বিশালবপু নিয়ে দরজা ছেড়ে দাঁড়ালো মহিলা।

ভেতরে এলো রানা। কাঠের ফ্লোর, হাঁটলে খট্ খট্ শব্দ হয়। তবে মজবুত। ফার্নিচারগুলো সাদামাঠা। এক কোণে ছোট একটা ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। 'প্লীজ, সীট ডাউন,' বলে অদৃশ্য হয়ে গেল মহিলা।

কার্ল ম্যালডেন মানুষটি ছোটখাটো। চল্লিশের বেশি হবে না বয়স। মাথা ভর্তি টাক। মুখটা কেমন শুকনো লাগছে। দোরগোড়ায় এসে থমকে দাঁড়ালো সে। 'গুড আফটারনুন, হের···?'

'স্মিথ, রবার্ট স্মিথ।'

ছোট ছোট পায়ে এগিয়ে এলো ম্যালডেন। বসলো রানার মুখোমুখি। 'আমার স্ত্রী বললেন, আপনি নাকি রিপোর্টার?'

'ঠিকই বলেছেন।'

'কি জানতে চান, বলুন,' কঠিন হয়ে উঠলো লোকটার কণ্ঠ। 'সেদিনকার ওই···ওই জিনিসটার কথা তো, যেটা আনটেনডর্ফে ক্র্যাশ করেছিলো, তাই না?'

বিনয়ের সাথে বললো রানা, 'জ্বি। আসলে ওটাই···'

'প্রথমেই কেন সে কথা বললেন না? যাক্গে, বলুন। প্রশ্ন করুন। কিন্তু···আমি দুঃখিত আপনাকে কোনো ড্রিঙ্ক অফার করতে পারছি না।' বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজের পেটে দুটো গুঁতো মারলো লোকটা। 'আলসার। খুব ভোগাচ্ছে। ব্যথা কমানোর জন্যে ওষুধ পর্যন্ত দিচ্ছে না ডাক্তার।'

armsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'ও, আ'য়্যাম সরি।'

'দ্যাটস অলরাইট। বলুন।'

'আমি আপনার গত পরশুর বাস ট্যুরের পুরোটা জানতে চাই আসলে। আপনার বাসে কতোজন যাত্রী ছিলো, আনটেনডর্ফে ওয়েদার বেলুনটা কিভাবে ক্র্যাশ করলো...এসবই জানতে চাই।'

'ওয়েদার বেলুন?' বিস্মিত হলো ম্যালডেন। 'কিসের ওয়েদার বেলুন ?'

'ওই যেটা...'

'ওটা ছিলো একটা স্পেসশিপ।'

বেকুবের মতো চেয়ে থাকলো মাসুদ রানা। 'স্পেসশিপ!'

'জা। ফ্লাইং সসার।'

কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো রানার ভাষা ফিরে পেতে। 'আপনি বলছেন, ফ্লাইং সসার দেখেছেন আপনি?'

'হ্যাঁ। শুধু আমি কেন, যাত্রীরাও সবাই দেখেছে। ফ্লাইং সসার, সেইসাথে দুটো ডেডবডি। ইয়ে, ছোট ছোট...অনেকটা মানুষের মতো দেখতে ছিলো ওরা,' বলতে বলতে শিউরে উঠলো লোকটা। 'মা গো! কি ভয়ঙ্কর!'

আবারও কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে চেয়ে থাকলো রানা হাঁ করে। পিলে চমকে গেছে ওর। টের পেতে অসুবিধে হলো না যে সত্যি কথাই বলছে ম্যালডেন। তার মানে, ওকে মিথ্যে বলেছেন জেনারেল হিলিংটন। কিন্তু কেন? বহুকষ্টে গলার স্বর নিয়ন্ত্রণে রেখে বললো ও, 'হের ম্যালডেন, আপনি শিওর যে জিনিসটা ফ্লাইং সসার ছিলো?'

'অবশ্যই শিওর,' রেগে উঠলো সে। 'শিওর না তো কি এমনি এমনি বলছি? ফ্লাইং সসারই ছিলো ওটা। অথবা স্পেসশিপ বা ইউএফও, যা খুশি বলতে পারেন।'

'এবং তার ভেতরে ডেডবডিও ছিলো?'

'হ্যাঁ, দুটো ডেডবডি,' আবার শিউরে উঠলো ড্রাইভার। তাড়াতাড়ি বুকে ক্রস আঁকলো। 'সাড়ে তিন কি চার ফুট লম্বা হবে ক্রিয়েচারগুলো। চোখগুলো খোলা, পিং পং বলের মতো বড় বড়। পরনে ছিলো টাইটফিট পোশাক, সিলভার মেটালিক কালারের।'

'প্যাসেঞ্জাররা সবাই দেখেছে ওগুলোকে?' এখনও বুঝতে পারছে না রানা ব্যাপারটা সত্যি হওয়ার কোনো চান্স আছে কি না।

'দেখেছেই তো। প্রায় পনেরো মিনিট ছিলাম আমরা সেখানে। আরও থাকার ইচ্ছে ছিলো প্যাসেঞ্জারদের, কিন্তু কোম্পানির টাইম শিডিউলের কথা চিন্তা করে চলে আসি আমি প্রায় জোর করেই।'

'হের ম্যালডেন, ট্যুরিস্টদের কারও নাম-ঠিকানা জানেন আপনি?'

'না, সরি। এ ধরনের কোনো রেকর্ড রাখে না কোম্পানি।'

'কাউকেই লোকেট করার কোনো উপায় নেই? এমন কোনো সূত্র, যাতে...।'

কি একটু ভাবলো ম্যালডেন। 'এটুকু বলতে পারি, ওই ট্যুরে বাচ্চা কাচ্চা ছিলো না কোনো। প্রায় সবাই-ই ছিলো বিদেশী।'

'সবাই পুরুষ? না মহিলাও ছিলো এক আধজন?'

'হ্যাঁ, ছিলো। একজন মহিলা ট্যুরিষ্ট ছিলো।'

'ট্যুর শেষে যে যার পথে চলে গেছে, এই তো?'

'ঠিক।'

'হুঁম!' চিন্তা করতে লাগলো রানা। পরবর্তী প্রশ্নটা মনে মনে নিজেকেই করলো ও, কোন্ আক্কেলে এই অ্যাসাইনমেন্ট নিতে রাজি হলাম আমি?

ইতস্তত ভঙ্গিতে বললো ম্যালডেন, 'ওদের একজনের কথা খানিকটা মনে আছে, হের স্মিথ। এক বুড়ো, প্রফেসর। জার্মান।'

লাফিয়ে উঠলো মাসুদ রানা। 'কি মনে আছে, বলুন।'

'সবাই ইউএফও আর মৃতদেহগুলো দেখতে ব্যস্ত, কেবল এই

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

বুড়ো বারবার ফিরে যাওয়ার জন্যে তাগাদা দিচ্ছিলো। পরদিন সকালে নাকি ইউনিভার্সিটিতে লেকচার ছিলো বুড়োর। ওটা তৈরি করতে হবে, দেরি করলে ক্ষতি হবে, এইসব বলছিলো বারবার।'

'কোন্ ইউনিভার্সিটি?' শক্ত হয়ে গেছে রানা।

'বার্ন।'

'আর কিছু? প্রফেসরের চেহারার কোনো বর্ণনা?'

মাথা নাড়লো ড্রাইভার। 'নাহ্!'

'হের ম্যালডেন, যদি কিছু মনে না করেন, আমার সঙ্গে চলুন। ঘটনাস্থলটা দেখে আসি।'

'কিন্তু আজ আমার ডে-অফ। জরুরী কিছু কাজ...'

পকেট থেকে দুটো একশো ডলারের নোট বের করলো রানা। গুঁজে দিলো লোকটার হাতে। 'আপনি গেলে খুব খুশি হবো আমি।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলো লোকটা। 'কি আর করা,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, 'চলুন তাহলে।'

এলবিস থেকে নেমে দক্ষিণ পশ্চিমে ছুটলো ক্যাডিলাক। একে একে অসংখ্য গ্রাম পেরিয়ে এলো ওরা। ঢোকার মুখে রাস্তার পাশে প্রতিটির নাম লেখা আছে জার্মান ও ইংরেজীতে। ইমেনস, মেগ্গেন, লুবরেন, সারনেন, ব্রুনিগ, লিসিগেন, কলেনিস ইত্যাদি আরও অনেক নাম। অদ্ভুত সুন্দর, সাজানো-গোছানো সব গ্রাম। কিন্তু সেদিকে রানার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নেই। ওর মন জুড়ে আছে স্পেসশিপ, ভিনগ্রহবাসীর মৃতদেহ আর জেনারেল হিলিংটনের মিথ্যে কথা।

মাঝে দুয়েকবার আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছিলো ড্রাইভার, কিন্তু রানাকে অতিরিক্ত গম্ভীর দেখে পরে আর সে চেষ্টা করেনি। প্রায় দু'ঘন্টা পর বলে উঠলো সে, 'এসে গেছি প্রায়। সামনে ছোট একটা শহর, থুন। তার পরেই।'

রানার হার্টবিট দ্রুততর হলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন কিছু

দেখবে ও, যা কখনও দেখবে বলে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। এতোদিন শুধু ছায়াছবি আর খবরের কাগজেই মাঝেমধ্যে যা এক আধটু দেখেছে বা পড়েছে রানা সসারের ব্যাপারে। চিন্তায় বাধা পড়লো, কথা বলে উঠলো কার্ল ম্যালডেন।

'স্লো করুন। এসে গেছি।'

তার নির্দেশ মতো গাড়ি রাখলো রানা। 'ওই যে,' হাত তুলে দেখালো সে, 'ওই গাছগুলোর ওপাশে।'

জায়গাটা সমতল। চওড়া পথের দু'পাশে সবুজ বন, মোটা কাণ্ডের আকাশ ছোঁয়া গাছ। ম্যালডেনের পিছন পিছন এগোলো মাসুদ রানা। দুশো গজমতো যেতেই বড় একটা খোলা জায়গা পাওয়া গেল। 'এখানেই,' ঘোষণা করলো লোকটা। 'ওই দেখুন।'

বললো বটে 'ওই দেখুন,' কিন্তু স্বরটা অন্যরকম লাগলো রানার কানে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলো ও।

আহাম্মকের মতো চেহারা হয়েছে ম্যালডেনের। বিড়বিড় করে বললো, 'ওটা...ওটা এলো কোত্থেকে?'

অনেকখানি জায়গাজুড়ে পড়ে আছে একটা ছেঁড়া-ফাটা ওয়েদার বেলুন। জিনিসটা অ্যালুমিনিয়ামের—ডায়ামিটারে চোদ্দ ফুট। 'অসম্ভব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো লোকটা। 'এটা সেই ইয়েটা নয়। অসম্ভব! অসম্ভব! আমরা সবাই দেখেছি, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিলো সসারটা। কিন্তু...এ-এটা কে রেখে গেল এখানে!'

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে মাসুদ রানা। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে খুব। মাটি ভিজে আছে। সমতল প্রান্তরটার এখানে ওখানে ছোট-বড় অনেকগুলো গর্ত দেখা যাচ্ছে, ভরে আছে টলটলে পানিতে। ওগুলো নতুন না পুরানো বোঝার উপায় নেই।

কি ভেবে হালকা বেলুনটার এক প্রান্ত উঁচু করে ধরলো মাসুদ

ammsumon@yahoo.com www.murchona.com©

রানা। 'হের ম্যালডেন, একটু হেলপ্ করুন।'

'কি?'

'একটু ধরুন।'

'কি করতে চাইছেন?' ওর পাশে এসে দাঁড়ালো লোকটি।

'এটার নিচে কিছু আছে কিনা দেখবো।' দুজনে মিলে টেনে সরিয়ে আনলো বেলুনটা জায়গা থেকে। যা সন্দেহ করেছিলো রানা, ঠিক তাই। ওটার নিচের মাটিও পুরোপুরি ভিজে আছে। কয়েকটা গর্ত দেখা গেল, পানিতে ভর্তি।

'পরশুদিন বৃষ্টি হয়েছিলো, হের ম্যালডেন?'

'নাহ্। কাল রাতে হয়েছে।'

'আপনি শিওর?'

'একশোবার।'

'ইউএফও ক্র্যাশের সময় ওয়েদার কেমন ছিলো?'

'চমৎকার।'

'সানি?'

'জা, সানি।'

এবার মোটামুটি নিশ্চিত হলো রানা, গতরাতের বৃষ্টির পরই বেলুনটা এখানে রাখা হয়েছে। কি দাঁড়ালো তাহলে? ভাবলো মাসুদ রানা, সম্ভবত সুইস সরকার প্ল্যান্ট করেছে এখানে বেলুনটা, পুরো ব্যাপারটা গোপন করার জন্যে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো ম্যালডেন একভাবে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কোন্ ম্যাগাজিনে কাজ করেন, হের স্মিথ?'

'ট্রাভেল অ্যাণ্ড লেইজার,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো রানা।

'তাহলে তো নিশ্চয়ই আমার ছবি তুলবেন সেই ফটোগ্রাফারের মতো, তাই না?'

'কোন্ ফটোগ্রাফার?'

'সেদিন আমাদের সবার ছবি নিয়েছিলো এক ফটোগ্রাফার। সে-ও কি এক পত্রিকায় কাজ করে। কি যেন নাম বলেছিলো···নাহ্। মনে পড়ছে না। ধ্বংসস্তূপের সামনে আমাদের সবাইকে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলে লোকটা। প্রত্যেকের নাম-ঠিকানাও নিয়ে গেছে পরে ছবি পাঠিয়ে দেবে বলে।'

'বলতে চাইছেন, সসারের রেকেজের সামনে আপনাদের দাঁড় করিয়ে ছবি তুলেছে সে?' আস্তে আস্তে বললো রানা।

'জা।'

দারুণ! মনে মনে ভাবলো ও, কোনোরকমে এই লোকটিকে খুঁজে বের করতে পারলেই হয়। আর কিছু করতে হবে না। 'এর কথা আগে বলেননি তো!'

'জানতে চেয়েছেন? আপনি তো কেবল প্যাসেঞ্জারদের খবর জিজ্ঞেস করেছেন।'

'লোকটা প্যাসেঞ্জার ছিলো না?'

'না।'

'তাহলে? কে ছিলো সে? এখানে এলো কি করে?'

'পথের মধ্যে গাড়ি নষ্ট হয়ে যায় তার। একটা টো ট্রাক টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো তাকে। ওই সময় দুর্ঘটনাটা ঘটে, আমাদের সাথে সে-ও দেখতে আসে।'

'টো-ট্রাকের ড্রাইভার, সে দেখেনি?'

'অবশ্যই।'

তার মানে, আটজন নয়, প্রত্যক্ষদর্শীর সংখ্যা তাহলে দশে দাঁড়ালো। 'লোকটা কোন্ দেশী ছিলো, বলতে পারেন?'

'ব্রিটিশ বা আমেরিকান হবে। ইংরেজিতে কথা বলছিলো সে।'

'কোন্‌দিকে গেছে টো-ট্রাকটা?'

'বার্ন। অবশ্য থুনেও গিয়ে থাকতে পারে। না···বার্নেই গেছে,

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

ওইদিন রোববার ছিলো, ছুটির দিন। খুলে সব বন্ধ ছিলো।'

'ধন্যবাদ। অনেক উপকার হলো।'

'আর্টিকেল ছাপা হলে একটা কপি পাঠাবেন তো আমাকে?'

'অবশ্যই। চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাই।'

'চলুন।' হাঁটতে হাঁটতে পকেট থেকে সিগারেট লাইটারের মতো দেখতে এক ধাতব খণ্ড বের করলো ম্যালডেন। 'এটা কাছে রেখে দিন। হয়তো কাজে লাগতে পারে আপনার।'

জিনিসটা হাতে নিয়ে বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। 'কি এটা?' জিনিসটা যে ধাতুর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ একেবারে হালকা, ঠিক কাগজের মতো ওজন শূন্য। টুকরোটার একদিকে খাঁজ কাটা, মনে হয় কোনো যন্ত্রের অংশ। খুলে পড়ে গেছে কোনও ভাবে।

'খুব সম্ভব সসারটার কোনো পার্ট। এখানে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম সেদিন।'

ওদিকে জুরিখের সুইস মিনিস্ট্রি অভ ইন্টারন্যাল অ্যাফেয়ার্স, বুনদেসগেস-এ জড়ো হয়েছে দেশ-বিদেশের শ'খানেক রিপোর্টার-ফটোগ্রাফার। রেডিও-টিভির সাংবাদিকরাও আছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রণালয়ের প্রেসের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা। হৈ চৈ-এর শব্দে কান পাতা দায়। সবাই একযোগে প্রশ্ন করছে।

'আমরা জানতে পেরেছি ওটা ওয়েদার বেলুন ছিলো না…।'

'আপনি স্বীকার করেন যে জিনিসটা ছিলো ইউএফও…?'

'ওর মধ্যে সেদিন ভিন গ্রহবাসীদের দুটো মৃতদেহও দেখা গেছে, অথচ…।'

অমায়িক হাসি হাসলেন প্রেস অফিসার। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, ব্যাপারটা ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কিছুই নয়,' বললেন

তিনি। 'প্রথমে খবরটা শুনে আমরাও চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তদন্ত করে জানা গেছে যে আসলে ওয়েদার বেলুনই ছিলো ওটা। আপনাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে এই জন্যে যে, আমরা চাই এ নিয়ে জনসাধারণের মনে যেন অহেতুক কোনো ভয়-ভীতি, আতঙ্ক না জাগে; তারা যেন নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে। এই জন্যে সরকার থেকে আপনাদের ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাইরে ছয়টা বাস দাঁড়িয়ে আছে, আপনাদের জন্যে। এখানে বসে জল্পনা-কল্পনা না করে, চলুন, সরেজমিনে দেখে আসা যাক। ওখানে গেলেই বুঝবেন…।

প্রেস অফিসারের গাড়ির পিছন পিছন ছ'টা প্রকাণ্ড বাস রওনা হলো আনটেনডর্ফের উদ্দেশে। একই সময় গাড়িতে উঠলো রানা-ম্যালডেন, ফিরে চললো ক্যাপেলের দিকে।

হোটেলে ফিরে নতুন একটা বার্তা পাঠালো রানা ঢাকায়।

ডিনার সেরে একটা বই নিয়ে বিছানায় উঠলো মাসুদ রানা। ফেরার পথে বইটা কিনে এনেছে ও বাহানহফস্ট্রেস থেকে। বেশ মোটা বই। নাম— ইউএফওঃ রিয়েল অর ফিকটিশাস। লেখক আমেরিকান। ভূমিকা থেকেই শুরু করলো রানা।

"এ বই লেখার কাজে হাত দিয়ে প্রচুর দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে আমাকে। পড়তে হয়েছে অসংখ্য বই, ম্যাগাজিন, নিউজপেপার আর্টিকেল। কথা বলতে হয়েছে বেশ কয়েকজন মহাকাশচারীর সঙ্গে; ইউএফও সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছিলো এক সময়। এদের মধ্যে জেমিনি ৭-এর কর্নেল বোরম্যান অন্যতম। একটি ফ্লাইং সসারের ছবি তুলেছিলেন তিনি, জেমিনি ৭ কে অনুসরণ করছিলো ওটা। প্রথম চাঁদে অবতরণকারী মহাশূন্যযান অ্যাপোলো ১১-এর নেইল আর্মস্ট্রং আরেকজন। চাঁদে পা রাখার সময়

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

এমনি দু'টি অজ্ঞাত পরিচয় স্পেসক্র্যাফট্ দেখেছেন তিনি।

এর কিছুদিন পরে আরেক মার্কিন মহাশূন্যচারী, বায্ অলড্রিনও ইউএফও দেখেছেন চাঁদে নামার সময়। ওটার ছবিও তুলেছেন তিনি। কর্নেল এল. গর্ডন কুপার আরেক প্রত্যক্ষদর্শী। প্রজেক্ট মারকারি ফ্লাইটের সাথে জড়িত ছিলেন কর্নেল। দেখাই শুধু নয়, নিজের বিমান নিয়ে বিশাল এক ইউএফও-কে অনুসরণ করেছিলেন তিনি পার্থ-এর আকাশে। ওটার ভেতরে অবস্থানকারীদের কথা রেকর্ড করতেও সক্ষম হন তিনি সাফল্যের সাথে। পরে প্রচুর গবেষণা করে দেখা গেছে, পৃথিবীর কোনও ভাষার সাথেই মেলে না সে ভাষা।

অবশ্য আলোচনার সময় এঁরা সবাই এর সত্যতা অস্বীকার করেছেন আমার কাছে। বলেছেন, ইউএফও-র ব্যাপারে তাঁদের কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। প্রথমবার আলোচনায় অস্বীকার করলেও পরে আমাকে টেলিফোন করেছিলেন কর্নেল কুপার। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে সময় বিদেশে ছিলাম আমি। ফিরে এসে যখন তাঁর টেলিফোনের কথা জানলাম, তক্ষুণি পাল্টা টেলিফোন করি। কিন্তু পাইনি তাঁকে।

পরের একটা বছর বহু চেষ্টা করেছি তাঁকে ধরার, সফল হইনি। হাল যখন ছেড়ে দেয়ার মতো অবস্থা, ঠিক তখনই কর্নেলের লেখা একটি চিঠি পেলাম। তাতে তিনি লিখেছেন, প্রথমবার সত্যি কথা বলেননি তিনি আমার কাছে। আসলে সত্যিই ইউএফও দেখেছেন তিনি। একবার নয়, অনেকবার দেখেছেন। কথা রেকর্ড করার যে 'গুজব' আছে, তা-ও সত্যি। কিন্তু এ বিষয়ে মুখ খোলা নিষেধ ছিলো কড়াকড়িভাবে। কর্নেল বোরম্যান, নেইল আর্মস্ট্রং, বায্ অলড্রিন এই নিষেধাজ্ঞার কারণেই মুখ খোলেননি আমার কাছে।

ডজনখানেক বইয়ে পড়েছি, ফ্লাইং সসারের অস্তিত্ব আছে। উল্টোটাও পড়েছি। পড়েছি ফ্লাইং সসার বাজে কিছু নেই। সব কল্পনা।

বেশ কয়েকজন পেশাদার-অপেশাদার ক্যামেরাম্যানের ফ্লাইং

সসারের ওপর তোলা অনেকগুলো ভিডিও টেপ দেখেছি আমি। আমেরিকা ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী অনেক থেরাপিস্টের সাথে আলোচনা করেছি। যাঁরা, ফ্লাইং সসার তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিলো বলে দাবি করেছে, তাদের সম্মোহন করে আসল ঘটনা উদঘাটনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন এইসব থেরাপিস্ট।

সে সময় যে-সব তথ্য পেয়েছেন তাঁরা লোকগুলোর কাছ থেকে, তা রীতিমতো বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য—থেরাপিস্টরা স্বীকার করেছেন আমার কাছে। এমনি শ'য়ে শ'য়ে কেস ডীল করেছেন এঁরা, সবাই একই রকম অভিজ্ঞতার কথা বলে গেছে সম্মোহিত অবস্থায়। হুবহু এক অভিজ্ঞতা। সসারগুলোর ভেতরটা কেমন, ওতে অবস্থানকারীদের চেহারা ও দৈহিক গঠন কি রকম, এসব প্রশ্নের একই উত্তর দিয়েছে তারা।

অথচ, মার্কিন সরকারের ফ্লাইং সসার অনুসন্ধান কমিটি-প্রধান, এয়ারফোর্সের একজন জেনারেল, খুব জোর দিয়েই বলেছেন যে ফ্লাইং সসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে তেমন জোরালো প্রমাণ নেই।

যদিও, অ্যাডমিরাল অভ দ্য ফ্লীট এবং ১৯৭১ থেকে '৭৩ পর্যন্ত ব্রিটিশ চীফ অভ ডিফেন্স স্টাফ, লর্ড হিল নর্টন একবার স্বীকার করেছেন, 'আমাদের আশপাশের বলয়ে অদ্ভুত এক বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা মানুষের তৈরি নয়। প্রায়ই এখানে ওখানে দেখা দেয় তারা। ওগুলোকে দেখেছেন, এমন অনেক মানুষকে ব্যক্তিগত-ভাবে চিনি আমি। মিথ্যে বলা, বা আসর জমানোর জন্যে গুজব ছড়িয়ে বেড়ানো যাঁদের দ্বারা অসম্ভব। এর একটাই অর্থ হতে পারে, সত্যি কথাই বলেছেন এঁরা। এঁদের মধ্যে আছেন অনেক পুলিস অফিসার, কমার্শিয়াল, মিলিটারি পাইলট প্রভৃতি।

১৯৩৩ সালে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান আকাশ সীমায় ঘন ঘন অজ্ঞাত

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

পরিচয় কিছু রহস্যময় উড়ন্ত বস্তুর আনাগোনা লক্ষ্য করে, ওগুলোর পরিচয় জানার জন্যে চতুর্থ সুইডিশ ফ্লাইং করপ্স্ এক উদ্যোগ নেয়। এর প্রধান, মেজর জেনারেল এরিক রয়টারসোয়ারড স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবেদন ১৯৩৪ সালের ৩০ শে এপ্রিল ছাপা হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। প্রতিবেদনটা ছিলো এরকমঃ 'কমিটির প্রতিটি রিপোর্ট পর্যালোচনা করে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, আমাদের গোপন সামরিক ঘাঁটির ওপর বেআইনী এয়ারক্র্যাফটের আসা-যাওয়া চলছে বিরতিহীন। ক্র্যাফটগুলোর কোথাও কোনো ইনসিগনিয়া বা আইডেন্টিফিকেশন চিহ্ন দেখা যায়নি। প্রশ্ন হলোঃ এরা কারা? উড়ন্ত ওগুলো কি? কেন বার বার আমাদের আকাশসীমায় অনুপ্রবেশ করছে?'

১৯৪৭ সালের কথা। এথেন্সের আকাশে প্রায়ই মিসাইলের মতো অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন উড়ন্ত কিছু একটা দেখা যাচ্ছে জানতে পেরে ভাবনায় পড়ে গেল গ্রীক্ সরকার। বিষয়টা তদন্ত করে দেখার জন্যে নামকরা বিজ্ঞানী, প্রফেসর পল স্যান্টোরিনিকে প্রধান করে এক অনুসন্ধানী কমিটি গঠন করা হলো। এ সম্পর্কে প্রফেসর মন্তব্য করেছেনঃ অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই জানা গেল, জিনিসগুলো আদৌ মিসাইল নয়। কিন্তু, আর বেশি এগুতে পারলাম না, হঠাৎ করেই কমিটির তদন্ত কাজ বন্ধ করে দেয় আর্মি। এবং একদল বিদেশী বিজ্ঞানী আমার সঙ্গে 'গোপন পরামর্শ' করতে আসে।

প্রফেসর স্যান্টোরিনির এই বক্তব্যই প্রমাণ করে, উন্নত দেশগুলো ইউএফও প্রসঙ্গ পুরোপুরি ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাইছে। অসংখ্য কারণ থাকতে পারে এর। প্রধান কারণটি হচ্ছে, সম্ভবত, তারা এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব জনসমক্ষে স্বীকার করতে রাজি নয়, যে শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা তাদের নেই।

১৯৪৭ থেকে '৫২ পর্যন্ত ATIC (এয়ার টেকনিক্যাল ইন্টেলিজেন্স সেন্টার) বিভিন্ন জায়গায় ইউএফও দেখতে পাওয়া গেছে, এমন প্রায়

দেড় হাজার রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে। যার শতকরা বিশ ভাগ রিপোর্ট এসেছে এয়ারফোর্স ক্যারিয়ারের পাইলটদের কাছ থেকে।

এয়ার চীফ মার্শাল ডওডিং, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ, রয়্যাল এয়ারফোর্স ফাইটার কম্যাণ্ড, 'ব্যাটল্ অভ ব্রিটেনের সময়ে (১৯৪০) লিখেছেনঃ 'ফ্লাইং সসার সাইটিং-এর দশ হাজারেরও বেশি রিপোর্ট পাওয়া গেছে। রাডারের সাহায্যে ট্র্যাক্ করা হয়েছে এদের···গতি এদের অস্বাভাবিক, নয় হাজার মাইল প্রতি ঘণ্টায়। ইউএফওর অস্তিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। এরা আছে। এরা যে অন্য কোনও গ্রহ থেকে আসে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।'

এই সেদিন, উইসকনসিনের এলমউড শহরের প্রায় প্রতিটি নাগরিকই তাদের আকাশে অদ্ভুত এই জিনিসগুলোকে উড়তে দেখেছে। একবার, দু'বার নয়। পরপর কয়েকদিন, অসংখ্যবার।

জেনারেল লায়ওনেল ম্যাক্স চেজিন; 'পরবর্তীকালে ফরাসী বিমান বাহিনীর কম্যাণ্ডিং জেনারেল, এবং জেনারেল এয়ার ডিফেন্স কো-অর্ডিনেটর, অ্যালাইড এয়ারফোর্স, সেন্ট্রাল ইউরোপ (NATO) লিখেছেনঃ 'ইউএফও-র ব্যাপারে সন্দেহের কোনও প্রশ্নই থাকতে পারে না।'

১৯৪৭ সালের রসওয়েল ঘটনাই সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় সচেতন জনগোষ্ঠীকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেনঃ ২রা জুলাই রাতের বেলা নিউ মেক্সিকোর রসওয়েলের আকাশে হঠাৎ করেই আবির্ভূত হয় পিরীচাকৃতির এক ফ্লাইং সসার। পরদিন সকালে ওখানকার এক র‍্যাঞ্চ ম্যানেজার এবং তার দুই ছেলে আবিষ্কার করে, র‍্যাঞ্চের ভেতরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কাল রাতে দেখা বস্তুটি। কর্তৃপক্ষকে তক্ষুণি জানানো হয় ব্যাপারটা। তদন্ত শেষে কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের জন্যে একটি স্টেটমেন্ট প্রকাশ করেন। তাতে পরিষ্কার বলা হয় যে একটা উড়ন্ত 'চাকতির'

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

ধ্বংসাবশেষ ওটা।

এর কিছুক্ষণ পরই প্রকাশ করা হয় দ্বিতীয় স্টেটমেন্ট। তাতে সম্পূর্ণ অন্যমত প্রকাশ করা হয়। বলা হয়ঃ জিনিসটা আসলে একটি ওয়েদার বেলুনের অবশিষ্টাংশ। সাংবাদিকদের পরে ওই জায়গা দেখতে নিয়ে আসা হয়। দেখা যায়, আসলেই একটা চুপসানো ওয়েদার বেলুন পড়ে আছে মাটিতে। অবশ্য তার আগেই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে আসল জিনিসটা রাইট ফিল্ডে সরিয়ে নেয়া হয়।

সসারটার ভেতর চারটে ভিন্ গ্রহবাসীর মৃতদেহ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, এমন এক প্রত্যক্ষদর্শী পরে জানিয়েছেন, 'মানুষের মতোই, কিন্তু মানুষ নয় ওরা। মাথা পুরো গোল ওদের। চোখ ছোট, তবে বিস্ফারিত। পাতা বা পাপড়ি, কিছুই নেই। দেহের তুলনায় মাথা বেশ বড়। পরনে ছিলো ওয়ার্কিং ওভারলের মতো পোশাক। দেখতে সবাইকে পুরুষ বলেই মনে হয়েছে। চারজন ছিলো ওরা…হঠাৎ আর্মি এসে ভাগিয়ে দিলো আমাদের। কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করে ওরা যেন এ ব্যাপারে আমরা কারও সামনে কিছু না বলি।'

এই ঘটনার পর, ১৯৪৭ সালেই, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্দেশে 'ম্যাজেস্টিক-১২' বা 'এম জে-১২' কোড নামে এক গোপন প্যানেল গঠন করা হয়। যার উদ্দেশ্য ছিলো ইউএফও সম্পর্কিত খবরাখবর সংগ্রহ করা এবং প্রেসিডেন্টকে অবহিত করা। এই প্যানেলের একটি পুরানো রিপোর্ট ১৯৮৪ সালে এক ইন্টেলিজেন্স সোর্সের হাতে পড়ে। ১৮ নভেম্বর, ১৯৫২ সালের তারিখে লেখা ওই রিপোর্টের সূত্র ছিলোঃ টপ সিক্রেট/ম্যাজিক/আইজ ওনলি।

পরবর্তী প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের অবগতির জন্যে কমিটির তখনকার প্রধান, অ্যাডমিরাল হিলেনকোটার ওই রিপোর্টটি তৈরি করেছিলেন বলে অভিযোগ আছে। ওতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, ১৯৪৭ সালের রসওয়েল দুর্ঘটনার পর ফ্লাইং সসারটির আশেপাশে চারটে

ভিন গ্রহবাসীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

ওই বছরই, প্রেসিডেন্টের দফতরে একটি সর্বসম্মত মেমো পাঠায় 'এম জে-১২'। ওতে বলা হয়ঃ '…জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি দিন দিন আরও গুরুত্ব দাবি করছে। কারণ, অজ্ঞাত পরিচয় এই অতিথিদের আসল উদ্দেশ্য কি, কেন তারা আমাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করছে তা এখনও অজানা। সাধারণ মানুষ যাতে এ জন্যে আতঙ্কিত না হয়, নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে এই কমিটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, এবিষয়ে 'কঠোরতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।'

অনুমান করা হয়, মার্কিন ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি ইউএফও সম্পর্কিত শতাধিক, সিআইএ কম করেও পঞ্চাশ এবং ডিআইএ ছয়টি তথ্য প্রমাণ চেপে গেছে। কেন, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। চার্লস লিণ্ডবার্গের প্রাক্তন এইড, মেজর ডোনাল্ড কিহো এসব তথ্য চেপে যাওয়ায় প্রকাশ্যে মার্কিন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে এটিআইসি-র একটি গোপন তদন্ত রিপোর্ট 'এস্টিমেট অভ দ্য সিচুয়েশন'-এ মন্তব্য করা হয়, 'স্পেসশিপগুলো নিঃসন্দেহে অন্য কোনও গ্রহ থেকে আসে'। তৎকালীন এয়ারফোর্স চীফ অভ স্টাফ, জেনারেল ভ্যানডেনবার্গ সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টটি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।

১৯৮২ থেকে ১৯৮৮, এই সাত বছরের মধ্যে তেইশজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছে বিভিন্ন দুর্ঘটনায়। এঁরা সবাই স্টার ওঅর গোছের প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন। এঁদের গবেষণার মূল বিষয় ছিলো বিভিন্ন ইলেকট্রোনিক ওঅরফেয়ার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, যার একটা ছিলো ইউএফও। এই তেইশজন বিজ্ঞানীর অস্বাভাবিক মৃত্যু মানুষের মনে জন্ম দিয়েছে হাজারো সন্দেহের। এঁরা হলেনঃ

প্রফেসর কেইথ বওডেনঃ ১৯৮২ঃ মোটর দুর্ঘটনায় নিহত।

amimsumon@yahoo.com
www.murchona.com

জ্যাক ওলফেনডেনঃ জুলাই, ১৯৮২ঃ গ্লাইডার দুর্ঘটনায় নিহত।
আর্নেস্ট ব্রকওয়েঃ নভেম্বর, ১৯৮২ঃ আত্মহত্যা।
স্টিফেন ড্রিঙ্কওয়াটারঃ ১৯৮৩ঃ শ্বাসরোধ করে আত্মহত্যা।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল অ্যান্থনি গডলিঃ এপ্রিল, ১৯৮৩ঃ নিখোঁজ—পরে মৃত ঘোষণা করা হয়।
জর্জ ফ্র্যাঙ্কসঃ এপ্রিল, ১৯৮৪ঃ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা।
স্টিফেন ওকঃ ১৯৮৫ঃ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা।
জোনাথন ওয়াশঃ নভেম্বর, ১৯৮৫ঃ উঁচু দালানের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা।
ড. জন ব্রিটানঃ ১৯৮৬ঃ দেহে কার্বন মনোক্সাইডের বিষক্রিয়া ঘটিয়ে আত্মহত্যা।
আরশাদ শরিফঃ অক্টোবর, ১৯৮৬ঃ গাছের ডালে বাঁধা দড়ির অন্য প্রান্ত নিজের গলায় পেঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা। ঘটনাটি ঘটে ব্রিস্টলে, তাঁর লণ্ডনের বাসা থেকে একশো মাইল দূরে।
বিমল দজিভানিঃ অক্টোবর, ১৯৮৬ঃ একটি ব্রিজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা। ঘটনাটি ঘটে ব্রিস্টলে, তাঁর লণ্ডনের বাসা থেকে একশো মাইল দূরে (পর পর এই দুটি মৃত্যু বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়)।
অবতার সিং গিদাঃ জানুয়ারি, ১৯৮৭ঃ নিখোঁজ—পরে মৃত ঘোষণা করা হয়।
পিটার পীপেলঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ঃ গাড়ির নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা।
ডেভিড স্যাণ্ডসঃ মার্চ, ১৯৮৭ঃ আত্মহত্যা।
মার্ক উইজনারঃ এপ্রিল, ১৯৮৭ঃ শ্বাসরোধ করে আত্মহত্যা।
স্টুয়ার্ট গুডিংঃ ১০ এপ্রিল, ১৯৮৭ঃ সাইপ্রাসে অজ্ঞাত কারণে নিহত।
ডেভিড গ্রীনহগঃ ১০ এপ্রিল, ১৯৮৭ঃ ব্রিজ থেকে পড়ে নিহত।
শানি ওয়ারেনঃ ১৯৮৭ঃ পানিতে ডুবে আত্মহত্যা।

মাইকেল বেকারঃ মে, ১৯৮৭ঃ মোটর দুর্ঘটনায় নিহত।
ট্রেভর নাইটঃ মে, ১৯৮৮ঃ আত্মহত্যা।
অ্যালিস্টেয়ার বেকহ্যামঃ আগস্ট, ১৯৮৮ঃ বৈদ্যুতিক তারে নিজেকে জড়িয়ে আত্মহত্যা।
ব্রিগেডিয়ার পিটার ফেরিঃ আগস্ট, ১৯৮৮ঃ বৈদ্যুতিক তারে নিজেকে জড়িয়ে আত্মহত্যা (এই দুটি মৃত্যুও লক্ষণীয়)।
ভিকটর মুরঃ তারিখ অজানাঃ আত্মহত্যা।

মৃত্যুগুলোর ব্যাপারে একটাই প্রশ্ন জাগে মনে, সবই কি দৈব-সংযোগ?

গত ত্রিশ দশকে পৃথিবীর নানা জায়গায় কম করেও ৭০,০০০ বার ইউএফও দেখা গেছে বলে জানা যায় বিভিন্ন রিপোর্টে। বলাই বাহুল্য, রিপোর্ট হয়নি, এমন সাইটিং-এর সংখ্যা এর বহুগুণ বেশিই হবে। পৃথিবীর শত শত দেশ থেকে এদের দেখতে পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়েছে অসংখ্যবার।

স্পেনে ইউএফও-কে বলা হয়, অবজেটোজ ফোলাডোরেস নো আইডেন্টিফিকেডোজ, জার্মানিতে ফ্লিজেনডে আণ্টারট্যাসেন, ফ্রান্সে সোকুপেস ভলান্টেস এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় লেটাজিসি টালির।

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী, কার্ল সাগানের হিসেবে প্রায় আড়াইশো বিলিয়ন নক্ষত্র আছে ছায়াপথে (মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি)। এতোই দূরে সেগুলো, যে আলাদাভাবে সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। তাঁর বিশ্বাস, এর কোনও কোনটিতে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব থাকলেও থাকতে পারে।

আমাদের সরকার তা স্বীকার করেন না। অথচ, ১৯৯২ সালের কলম্বাস দিবসে ক্যালিফোর্নিয়া এবং পুয়েরটোরিকায় অত্যাধুনিক এক রেডিও টেলিস্কোপ অ্যাকটিভেট করতে যাচ্ছে NASA, যার বিশেষ-ভাবে তৈরি রিসিভার এবং কম্পিউটার প্রতি মুহূর্তে, একযোগে লক্ষ লক্ষ রেডিও চ্যানেল বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। উদ্দেশ্য? পৃথিবীর বাইরে

ahmsumon@yahoo.com©
www.murchona.com

কোথাও বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কি না, অনুসন্ধান করা।

NASA এ মিশনের নাম দিয়েছে 'MOP', বা মাইক্রোওয়েভ অভজারভিং প্রজেকট, অন্যদিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নাম রেখেছেন 'SETI', বা সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেসট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স।

ফ্লাইং সসার সত্যিই আছে কি না, এ ব্যাপারে মতামত জানতে চেয়েছি আমি দুই প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে। তাঁদের উত্তর ছিলো নেতিবাচক। আমিও জানতাম কি জবাব আসবে।

সত্যিই কি অস্তিত্ব আছে ইউএফও-র? অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবী ভ্রমণে আসে অপার্থিব কোনও প্রাণী? মানুষের উদ্ভাবিত নিত্য নতুন প্রযুক্তি এ প্রশ্নের উত্তরের আশায় ক্রমেই গভীর থেকে গভীরে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত, যতো দেরিতে আশা করা হচ্ছে, তার অনেক আগেই সঠিক উত্তর পেয়ে যাবো আমরা।

মহাশূন্য গবেষণায় নিবেদিত অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর সৃষ্টিতাত্ত্বিক এর উত্তরের জন্যে সরকারী ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে থাকতে রাজি নন। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাতে তৈরি হচ্ছেন। NASA গবেষণাকেন্দ্র, অ্যামেস, আইওয়ার এক SETI প্রকল্প বিজ্ঞানী, জিল টার্টার তাঁদের অন্যতম।"

এ প্রসঙ্গে কর্নেল এল. গর্ডন কুপার, যিনি পার্থের আকাশে ইউ-এফওচারীদের কথা রেকর্ড করেছিলেন, তাঁর একটি চিঠির উদ্ধৃতি দেয়া হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ওটি ছিলো এরকমঃ

অ্যামব্যাসেডর গ্রিফিথ
মিশন অভ গ্রেনাডা টু দ্য ইউনাইটেড নেশনস
৮৬৬, সেকেণ্ড অ্যাভিনিউ
সুইট-৫০২

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক-১০০১৭।

প্রিয় অ্যামব্যাসেডর গ্রিফিথ,

ফ্লাইং সসার বা ইউএফও নামের যানে চড়ে যারা প্রায়ই এই গ্রহে আনাগোনা করে থাকে, তাদের ব্যাপারে আমার মনোভাব এবং কি উপায়ে তাদের সাথে সমঝোতায় আসা সম্ভব, সে ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার উদ্দেশেই আমার এ চিঠি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এরা অপার্থিব, ভিন্ গ্রহবাসী। এবং নিঃসন্দেহে আমাদের থেকে ওদের প্রযুক্তি অনেক উন্নত। আমি মনে করি এ মুহূর্তে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে আর বৈরিতা নয়, যুদ্ধংদেহী মনোভাব নয়, বরং ওদের সাথে সখ্যতা গড়ার প্রচেষ্টা নিতে হবে। ওদের বুঝতে দিতে হবে যে আমরাই আমাদের সমস্যা সমাধান করতে পারি। এ প্রশ্নে জাতিসংঘেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকা প্রয়োজন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমি ইউএফও বিষয়ক কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি নই। যাঁরা ইউএফও-তে চড়েছেন বলে দাবি করেন, তাঁদের দলে আমি পড়ি না, অথবা ভিন্ গ্রহবাসীদের মুখোমুখি হওয়ার কোনো অভিজ্ঞতাও নেই আমার। তারপরও আমি নিজেকে একজন বিশেষ ব্যক্তি মনে করি। কারণ, পার্থ ছাড়াও, ১৯৫১ সালে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ইউএফও-র ঝাঁক বেঁধে 'ফাইটার ফর্ম'-এর চলাফেরা পুরো দু'দিন ধরে চোখে পড়েছে আমার। সংখ্যায় ওগুলো অনেক ছিলো, বিভিন্ন আকারের। দুঃখের বিষয়, ওগুলোকে অনুসরণ করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছি আমরা, শুধুমাত্র ওদের মতো অতো উঁচুতে ওঠার

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

ক্ষমতা আমাদের ফাইটারগুলোর ছিলো না বলেই। আমি জানি, অনেক মহাশূন্যচারী ইউএফও সম্পর্কে এখন মুখ খুলতে নারাজ। কারণ, সরকারী বিধিনিষেধ ছাড়াও, তাদের নাম করে অনেক মতলববাজ মানুষ এ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকার কাছে এমন সব বানোয়াট গল্প বিক্রি করেছে, যা তাঁদের সুনামের প্রচুর ক্ষতি করেছে।

অন্য মহাশূন্যচারীদের যে দলটি রয়েছে, যাঁদের নাম এখনও কলুষিত হয়নি, তাঁরা এ ধরনের প্রকল্পে কাজ করতে প্রস্তুত আছেন। এঁদের প্রত্যেকেরই ফ্লাইং সসার দেখার বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। জাতিসংঘ যদি এ ধরনের কোনও প্রকল্প গ্রহণে সম্মত হয়, আমার বিশ্বাস, ইউএফও-র ব্যাপারে ওয়াকিবহাল, শিক্ষিত এবং প্রত্যক্ষদর্শী আরও অনেকেই এগিয়ে আসবেন সহযোগিতা করতে।

আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

বিশ্বস্ত,
এল. গর্ডন কুপার
কর্নেল, এউএসএএফ (কেসিটি)
মহাশূন্যচারী

এ বিষয়ে জাতিসংঘ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে, জানা যায়নি।"

ভূমিকা শেষ। এরপর শুরু হয়েছে মূল কাহিনী। বইটা বন্ধ করলো মাসুদ রানা। আর দরকার নেই, ভাবলো, ভূমিকাই যথেষ্ট। বেড সাইড ল্যাম্প নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকলো ও। অস্বস্তি লাগছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, যেভাবেই হোক, এই ইউএফও বা ওতে যারা থাকে, ভিন্

গ্রহবাসী, তাদের সাথে কোনও এক অদৃশ্য বন্ধনে যেন জড়িয়ে পড়েছে ও নিজেও।

অনেক চিন্তা করেও বন্ধনটা কোথায় বুঝতে পারলো না মাসুদ রানা। শেষে 'ধুত্তোর' বলে ক্ষ্যান্ত দিয়ে পাশ ফিরে শুলো, এবং ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু পরিপূর্ণ ঘুম হলো না। সারারাত এপাশ ওপাশ করে কাটলো। কেবলই মনে হলো, কে যেন ডাকছে ওকে দুর্বল গলায়। এক সময় তাকে দেখতেও পেলো রানা স্বপ্নে—অদ্ভুত সুন্দরী একটি মেয়ে, থেকে থেকে কী এক করুণ আকুতি জানাচ্ছে।

পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, মেয়েটি যে-ই হোক, দারুণ কষ্টে আছে এ মুহূর্তে। ভোরের দিকে আধা ঘুম, আধা জাগরণে মেয়েটির গলা শুনতে পেলো মাসুদ রানা। যেন বলছে, 'বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমি মরে যাচ্ছি...মরে যাচ্ছি।'

ধড়মড় করে উঠে বসলো মাসুদ রানা। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো বেকুবের মতো। ব্যাপারটাকে কেন যেন স্বপ্ন বলে মেনে নিতে পারছে না ও। ঘরের ভেতর এখনও যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার আর্তি।

তিন

ল্যাংলি এয়ারফোর্স বেস। ভার্জিনিয়া। কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বেসের সতেরো নম্বর হ্যাঙ্গারটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাইরে চার সশস্ত্র মেরিন পাহারা দিচ্ছে প্রবেশ পথ। ভেতরের দায়িত্বে আছেন তিন

ডাকছে ওকে দুর্বল গলায়। এক সময় তাকে দেখতেও পেলো রানা স্বপ্নে—অদ্ভুত সুন্দরী একটি মেয়ে, থেকে থেকে কী এক করুণ আকুতি জানাচ্ছে।

পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, মেয়েটি যে-ই হোক, দারুণ কষ্টে আছে এ মুহূর্তে। ভোরের দিকে আধা ঘুম, আধা জাগরণে মেয়েটির গলা শুনতে পেলো মাসুদ রানা। যেন বলছে, 'বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমি মরে যাচ্ছি…মরে যাচ্ছি।'

ধড়মড় করে উঠে বসলো মাসুদ রানা। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো বেকুবের মতো। ব্যাপারটাকে কেন যেন স্বপ্ন বলে মেনে নিতে পারছে না ও। ঘরের ভেতর এখনও যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার আর্তি।

তিন

ল্যাংলি এয়ারফোর্স বেস। ভার্জিনিয়া। কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বেসের সতেরো নম্বর হ্যাঙ্গারটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাইরে চার সশস্ত্র মেরিন পাহারা দিচ্ছে প্রবেশ পথ। ভেতরের দায়িত্বে আছেন তিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, আট ঘণ্টা অন্তর পালা করে ডিউটি করছেন তাঁরা। এই সতর্কতামূলক আয়োজনকে অ্যাবাভ টপ সিক্রেট 'নোভা রেড'-এর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এমনভাবে সীল করা হয়েছে হ্যাঙ্গারটা যে কর্তৃপক্ষের অজান্তে ভেতরে একটা ইঁদুর ঢোকারও উপায় নেই। সাথে সাথে সাইরেন বেজে উঠবে।

ভেতরে কয়েকজন ডাক্তার এবং বিজ্ঞানী কাজে ব্যস্ত। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ, ভীষণ জটিল। হ্যাঙ্গারের বন্ধ স্লাইডিং গেটের সামনেই পারটেক্সের এক কামরা বিশিষ্ট একটি ঘর দাঁড়িয়ে—মোবাইল রুম। গাড়িতে করে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রকাণ্ড এক লিমুজিন এসে দাঁড়ালো হ্যাঙ্গারের সামনে। সসম্মানে পিছনের দরজা মেলে ধরলো শোফার, ধীরেসুস্থে বেরিয়ে এলো এক অসামরিক ব্যক্তি। বিশালদেহী। বয়স্ক। কিন্তু দেহের গঠনের জন্যে অতোটা বোঝার উপায় নেই। চলতি শিফটের সিকিউরিটি অফিসার-ইন-চার্জ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওয়াল্টার সীম্যান অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অভ্যর্থনা জানালেন সিভিলিয়ানটিকে।

'আমাদের সাম্রাজ্যে স্বাগতম, কোবরা।'

'ধন্যবাদ। কি চলছে এখানে দেখতে এলাম।'

'একশোবার।'

মোবাইল ঘরটায় নিয়ে এলেন জেনারেল কোবরাকে। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। তার ওপর ভাঁজ করে রাখা আছে বিশেষ কাপড়ের তৈরি চার সেট জীবাণুরোধক ওভারল, মাস্ক সহ। ওরা দুটো তুলে নিলেন সীম্যান। একটা কোবরার দিকে এগিয়ে দিলেন। 'এটা পরে ফেলুন প্লিজ।'

অন্যটা তিনি নিজে পরলেন। জুতোর ওপর পরা হলো একই কাপড়ের বড় মাপের স্লিপার। গ্লাস-মাস্কের ভেতর দিয়ে দু'জনের চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন। 'এবার চলুন,' বললেন জেনারেল।

হ্যাঙ্গারের গেট খুলে দিলো এক মেরিন। দুই দর্শনার্থী ভেতরে ঢুকতেই বন্ধ করে দিলো আবার। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বোলালো কোবরা। সামনেই স্পেসশিপটার টুকরো টুকরো অংশগুলো জোড়া দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে। ওটার কাছে সাদা রঙের বড় একটা টেবিল, দুটো ভিন গ্রহবাসীর মৃতদেহ রাখা আছে তার ওপর। একজন প্যাথলজিস্টকে দেখা গেল, হতভম্বের মতো চেয়ে আছে দেহ দুটোর দিকে।

'সসারটার ব্যাস পঁয়ত্রিশ ফুট,' বললেন জেনারেল সীম্যান। 'আমি মেপে দেখেছি।'

'আই সী।'

'একটা সমস্যা হয়েছে, কোবরা।'

'কি সমস্যা?'

'সসারটার ভেতরে আসন ছিলো তিনটে, কিন্তু পাওয়া গেছে দু'টোকে,' চোখ ইশারায় টেবিলটা দেখালেন তিনি। 'আরেকটাকে পাওয়া যায়নি।'

'কি করে নিশ্চিত হলেন তিনটেই ছিলো?' চিন্তিত গলায় প্রশ্ন করলো কোবরা।

'একটা সীট-বেল্ট ছেঁড়া পেয়েছি। সম্ভবত ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেছে আরোহীটি, বেল্ট ছিঁড়ে।'

'আর ও দুটো?'

'যার যার আসনে বসা অবস্থায় পেয়েছি। বেল্ট বাঁধা অবস্থায়।'

'ঘটনাস্থলের আশপাশে কোথাও…'

মাথা দোলালেন সীম্যান। 'চারদিকের কয়েক মাইল এলাকা চষে বেড়িয়েছি আমি, পাইনি।'

'হুম!' কয়েক মুহূর্ত গভীর ভাবনায় ডুবে থাকলো কোবরা। 'চলুন, ভেতরটা দেখবো আমি।'

'আসুন।'

স্পেসশিপটার ভেতরের গঠন ঠিক একটা ব্রিলিয়ান্ট কাট হীরের মতো। অসংখ্য ভাইব্রেটিং মেটাল ডিস্ক আড়াল করে রেখেছে চার দেয়াল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো কোবরার অপার্থিব যানটার চারদিকে তাকিয়ে। ঠিক মাঝখানে বড় একটা ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল দেখা যাচ্ছে।

'এগুলোর বেশিরভাগই চিনতে পারেননি সাইন্টিস্টরা,' প্যানেলটা দেখালেন জেনারেল। 'তবে যেটুকু জানা গেছে, তা-ই দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ওদের।'

'ওটা কি?' দেয়ালের গায়ে পর্দা গোছের কিছু একটা দেখালো কোবরা।

'সিনেমার পর্দাই বলা চলে ওটাকে। ওপর থেকে পৃথিবীর যে কোনো অংশের ছবি দেখতে পারে ওরা এর সাহায্যে। তাদা সম্যক করণের ক্ষমতাও আছে এর। সাইন্টিস্টদের ধারণা, কোনো ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক পালসের সাহায্যে চলে এটা। আমরা যাকে অত্যাধুনিক বলি, এ জিনিস তারচে' বহুগুণ আধুনিক।'

'কোনো অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দু'হাত প্রসারিত করে হার স্বীকারের ভঙ্গি করলেন জেনারেল।

'হার্ডওয়্যার ধরনের অনেক কিছুই পাওয়া গেছে। তবে সেগুলো যে কি, জানতে পারিনি।'

'শিপটা চলে কিসে?'

'মনোটোনিক হাইড্রোজেন, খুব সম্ভব। পানি থেকে তৈরি। বৃষ্টির পানি। পানি থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করে চলে। কোনো ওয়েস্টেজ নেই। হাইড্রোজেন পুড়ে পানি হয়, আবার সেই পানিই ফুয়েলিংয়ে হাইড্রোজেনে রূপান্তরিত হয়।'

বেরিয়ে এলো দুই দর্শক। কোবরা বললো, 'এবার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেখা দরকার।'

'হোয়াই নট।'

টেবিলটার পাশে এসে দাঁড়ালো দু'জনে। নিথর পড়ে আছে দেহ দুটো। চার ফুটের বেশি হবে না কোনটিই। ছোট, কিন্তু বিস্ফারিত দুটি চোখ—ভুরু বা পাপড়ি নেই। চেয়ে আছে হ্যাঙ্গারের টিনের ছাতের দিকে। মাথা প্রায় গোল, অস্বাভাবিক চওড়া, চ্যাপ্টা কপাল। একটির ডান হাতটা নেই। কাটা পড়েছে।

'কেমন দেখছেন, ডক?' প্রশ্ন করলো কোবরা।

'কি বলবো বুঝতে পারছি না,' ইতস্তত ভঙ্গিতে বললো ডাক্তার।

'যেমন?'

'এর একটা হাত নেই। অথচ দেখুন, কাটা জায়গাটায় রক্তের চিহ্ন নেই কোনো। ভেতর থেকে বেরুচ্ছে গাঢ় সবুজ রঙের তরল পদার্থ।'

বিস্মিত হলো কোবরা ও জেনারেল দু'জনেই। 'সবুজ?' বললো কোবরা।

'জ্বি। আমার মনে হয় এরা উদ্ভিদ। শাক-সবজি জাতীয়।'

'চিন্তাশক্তি সম্পন্ন শাক-সবজি? আপনি সিরিয়াস, ডক?'

গাল চুলকালো ডাক্তার। টেবিলের কিনারায় রাখা অর্ধেক পানি ভর্তি একটা গ্লাস তুলে নিলো। 'লক্ষ্য করুন,' বলে ওর মধ্যে আঙুলগুলো ডোবালো সে, তারপর ভেজা আঙুলের পানি গোলাপ পানির মতো ছিটাতে লাগলো মৃতদেহটার কাটা জায়গায়। কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটলো না। তারপর, হঠাৎ করেই কাঁপতে আরম্ভ করলো ওখানকার পেশীগুলো। বলকে বলকে বেরিয়ে আসতে লাগলো সবুজ, ঘন তরল পদার্থ, সেই সাথে ধীরে ধীরে নতুন একটা হাত গজাতে শুরু করলো।

'জেসাস!' চমকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল কোবরা, ধাক্কা খেলো জেনারেলের সাথে। 'এগুলো…এগুলো কি আসলেই মরেছে, না বেঁচে আছে?'

'ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী জীবিত নয় এরা। আবার মৃত বলতে আমরা যা বুঝি, তা-ও নয়। বরং বলা যায় সুপ্ত। ঘুমিয়ে আছে।'

লক্ষ্য করলো কোবরা, নতুন গজানো হাতটা অদৃশ্য হয়ে গেল আবার। 'কি যেন বলছিলেন, উদ্ভিদ গোত্রের, না কি যেন?' বললো সে। 'এ কি করে সম্ভব?'

'এ নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছি আমরা গ্রীন হাউস ল্যাবরেটরিতে।'

'আমি দেখতে চাই।'

'বেশ তো। ওখানে গেলেই দেখতে পাবেন।'

'ধন্যবাদ।'

হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এলো দুই হতভম্ব দর্শক। জীবাণুরোধক পোশাক পাল্টে

তক্ষুণি গ্রীনহাউস ল্যাব দেখতে ছুটলো কোবরা। ওয়াশিংটনের ত্রিশ মাইল উত্তরে পঞ্চাশ একর জমি নিয়ে এই ল্যাব। মেইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙে ঢোকার মুখেই পাথরে খোদাই করা আছে একটি ক্লাসিক উদ্ধৃতি:

দ্য ম্যাপেলস অ্যাণ্ড ফার্নস আর স্টিল
আনকরাপ্ট,
ইয়েট, নো ডাউট, হোয়েন দে কাম টু
কনশাসনেস,
দে, টু, উইল কারস অ্যাণ্ড সোয়্যার।

রালফ ওয়ালডো এমারসন
নেচার, ১৮৩৬

ল্যাবরেটরি পরিচালক, প্রফেসর রবার্ট ওয়াগারম্যান কোবরাকে স্বাগত জানালেন। আগেই টেলিফোনে তার আগমন সংবাদ প্রফেসরকে জানিয়ে দিয়েছেন জেনারেল সীম্যান। সময় নষ্ট না করে কোবরাকে ল্যাবে নিয়ে এলেন প্রফেসর। পলিথিন জাতীয় প্লাস্টিক শীটের উঁচু অর্ধচন্দ্রাকৃতি ছাতওয়ালা ল্যাবটা প্রকাণ্ড। দেশী-বিদেশী হাজারো রকমের ফুল গাছ আর লতায়পাতায় ভরে আছে ভেতরটা। তাদের সম্মিলিত সুবাস ভারি করে রেখেছে বাতাস।

'আমি কেন এসেছি, জানেন নিশ্চই, প্রফেসর?' বললো কোবরা।

'জানি। এদের ইন্টেলিজেন্স আছে কি না, জানতে চান আপনি।'

'রাইট।'

'গাছ-গাছালির চিন্তা করার মতো ক্ষমতা আছে, ব্যাপারটা প্রথম আবিষ্কার করেন মনীষী চার্লস ডারউইন। এরপর লুথার বুরব্যাঙ্ক, তিনিও একই মত প্রকাশ করেন। সবচেয়ে…'

'আপনি বিশ্বাস করেন যে এ-ও সম্ভব?'

'অবশ্যই! কারণ এটা আজ প্রমাণিত সত্য।' জর্জ ওয়াশিংটন কারভার বলেছেন, 'যখন আমি কোনো ফুল স্পর্শ করি, মনে হয় যেন অনন্তের স্পর্শ পেয়েছি আমি। ফুল মানুষের হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীতে এসেছে, এবং তাদের বিলুপ্তির পরও লক্ষ লক্ষ বছর বেঁচে থাকবে। ফুল স্পর্শ করে আমি অনন্তের সাথে কথা বলি।' এখানকার প্রতিটি প্ল্যান্ট জীবিত। ভালোবাসা, ঘৃণা, ব্যথা, আনন্দ সব অনুভব করতে পারে এরা, ঠিক আমাদের মতোই। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমাণ করেছেন এরা মানুষের কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়, এমনকি সাড়াও দেয়।'

'তা কি করে প্রমাণ করা সম্ভব?'

'আসুন, দেখাচ্ছি।' কোবরাকে নিয়ে একটা টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর ওয়াগারম্যান। এটার চারদিকে নানান জাতের ফুলগাছ। টেবিলের ওপর একটা পলিগ্রাফ মেশিন, দুটো তার বেরিয়ে আছে ওটা থেকে। ওর একটা পেঁচিয়ে আটকে দিলেন প্রফেসর একটা গোলাপ গাছের সাথে। পলিগ্রাফের সূচটা আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে আছে স্লেটের ওপর।

'লক্ষ করুন,' বললেন প্রফেসর। ঝুঁকে গাছটার কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, 'আমার মনে হয় তুমি খুব সুন্দর। পৃথিবীর সবচে' সুন্দর ফুল তুমি, ডার্লিং! তোমার মতো সুন্দর ফুল জীবনেও দেখিনি আমি।'

অত্যন্ত ধীরগতিতে নড়তে লাগলো সূঁচের ডগাটা। দেখে তাজ্জব বনে গেল কোবরা। 'এটা হলো আনন্দ প্রকাশ,' বললেন প্রফেসর। 'এবার দেখুন ক্রোধ। তুমি একটা বাজে ফুল!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'নোংরা ভূত! এতো বিচ্ছিরি ফুল জীবনে আর দেখিনি আমি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? তুমি একটা বাজে ফুল, নোংরা ফুল!'

লাফিয়ে উঠলো সূঁচটা রেস্ট থেকে, একদম খাড়া হয়ে গেল আকাশের দিকে মুখ করে। কাঁপছে তির তির করে।

'ওহ্, গড! ও, মাই গড!' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে কোবরা।

'এখন যেটা দেখলেন, তা অনেকটা মানুষের প্রচণ্ড রাগে চেঁচামেচির মতো ব্যাপার। এসব নিয়ে অনেক আগেই লেখালেখি হয়েছে পত্র পত্রিকায়। ছয়জন অ্যাপ্রেন্টিস নিয়ে মজার একটা পরীক্ষা চালিয়েছিলাম আমি বছর কয়েক আগে। একটা ঘরে পাশাপাশি দুটো গোলাপ গাছ রেখে তাদের একজনকে পাঠিয়ে দিলাম ভেতরে, নির্দিষ্ট একটা গাছ ধ্বংস করে রেখে আসতে। অন্যটার সাথে আগেই পলিগ্রাফের তার জুড়ে দিয়েছিলাম। গাছটাকে ছিঁড়ে মুচড়ে উপড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে এলো ছেলেটা। এরপর এক এক করে তাদের ছ'জনকেই ওই রুমে ঢোকানো হলো ভালো গাছটার কাছ থেকে ঘুরে আসার জন্যে। অন্যেরা যখন ঘরে ঢুকলো, কিছুই করলো না পলিগ্রাফের সূঁচ। কিন্তু যেই অপরাধী ছেলেটি এলো, অমনি লাফিয়ে খাড়া হয়ে গেল ওটা।'

রুদ্ধশ্বাসে বললো কোবরা, 'অবিশ্বাস্য!'

'কিন্তু সত্যি। প্রমাণ হয়ে গেছে যে এছাড়াও বিভিন্ন মিউজিকও প্রভাবিত করে এদের।'

'মিউজিক?' আর কতো চমক বাকি আছে? ভাবলো কোবরা।

'হ্যাঁ। ডেনভারের টেম্পল বুয়েল কলেজে চালানো হয় পরীক্ষাটা। তিনটে কাঁচের বাক্সে তিনটে স্বাস্থ্যবান সূর্যমুখী ফুল রেখে দু'সপ্তাহ ধরে চালানো হয় এক্সপেরিমেন্ট। সিবিএস টাইম-ল্যাপস ফটোগ্রাফির সাহায্যে তার পুরোটা ধারণ করেছিলো। দুটো ফুলকে দুই ধরনের মিউজিক শোনানো হয়, একটাকে রক, অন্যটিকে পূর্ব ভারতীয় সেতার।'

'আচ্ছা!'

'দু'সপ্তাহ পর দেখা গেল, যেটিকে রক মিউজিক শোনানো হয়েছিলো, সেটি মরে গেছে। যেটিকে কিছুই শোনানো হয়নি, সেটি ছিলো স্বাভাবিক। আর সেতার শ্রবণকারী ফুলটি অস্বাভাবিক বড় হয়ে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, পাইপের সাহায্যে যে ফুটো দিয়ে মিউজিক ঢোকানো হচ্ছিলো বাক্সে, ফুলটার কেন্দ্র ক্রমেই এগিয়ে আসছিলো সেদিকে। অর্থাৎ, মিউজিকটা তাকে আকৃষ্ট করেছিলো, মনের খুশিতে বেড়ে উঠেছে সে অস্বাভাবিক হারে। সিবিএস-এর ক্যামেরাম্যান ওয়াল্টার ক্রনকাইট অনুষ্ঠানটা ধারণ করে, এবং টেলিভিশনে তা দেখানো হয় ছাব্বিশে

অক্টোবর, উনিশশো সত্তরে।'

অন্যমনা হয়ে পড়েছে কোবরা। অপর ভিন গ্রহবাসীর কথা ভাবছে, যাকে পাওয়া যায়নি। কোথায় আছে সে?

আনটেরুভর্কের পনেরো মাইল দক্ষিণে ছোট একটা ফার্মহাউস। ওটার বৃদ্ধ মালিক, অটো ব্যাচম্যান এবং তার বড় ছেলে পর পর কয়েকটা উল্টোপাল্টা অসামঞ্জস্যপূর্ণ দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গেল। বেডরুমের জানালায় উজ্জ্বল হলুদ, কাঁপা কাঁপা আলোর ঝলকানি দেখে চমকে উঠলো ছেলে। ব্যাপার কি, দেখার জন্যে বিছানা ছাড়লো সে। কিন্তু জানালার কাছে পৌঁছার আগেই নিভে গেল আলোটা, ঘন আঁধারে কিছুই দেখতে পেলো না সে।

ওদিকে পোষা জার্মান শেফার্ডের আকাশ ফাটানো চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল ব্যাচম্যানের। কেন চেঁচাচ্ছে ওটা দেখার জন্যে বেরিয়ে এলো সে। বেরুতেই প্রচণ্ড হুটোপুটির আওয়াজ কানে এলো। দেখলো, খামারের কয়েকশো ভেড়া আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে কেন যেন, বেড়া ভেঙে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে। সেদিকে এগুতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো কৃষক।

খামারের বাইরে ভেড়াগুলোকে পানি খাওয়ানোর যে লম্বা, গভীর পাত্রটি রয়েছে কাঠের, সেটি খটখটে শুকনো। অথচ শুতে যাবার আগে পরিষ্কার দেখে গেছে ব্যাচম্যান, বৃষ্টির পানিতে কানায় কানায় ভরা ছিলো পাত্রটা। আশ্চর্য!

ছুটে এলো শেফার্ড। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো বৃদ্ধ আদর করে। অন্যমনস্কের মতো বলতে লাগলো, 'ইট'স অল রাইট, বয়, ইট'স অল রাইট।' এই সময় দপ করে নিভে গেল ফার্ম-হাউসের সব আলো। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলো ব্যাচম্যান, পাওয়ার স্টেশনে টেলিফোন করবে। রিসিভার কানে লাগিয়ে থমকে গেল সে—লাইন ডেড!

আলোটা যদি আর কয়েক মুহূর্ত থাকতো, তাহলে কৃষক দেখতে পেতো, অদ্ভুত সুন্দরী এক তরুণী, বারবার এদিক ফিরে তাকাতে তাকাতে হেঁটে চলেছে বিস্তৃত শস্যখেতের দিকে। ইউএফও দুর্ঘটনার পরেরদিন মাঝরাতের ঘটনা এটা।

গ্যারেজটা খুঁজে পেতে মোট পনেরোটা কল করতে হলো মাসুদ রানাকে। জায়গার নাম, ফ্রিবর্গস্ট্রেস। ছোট গ্যারেজ। মালিকের নাম হ্যানস হুবার্ট, জার্মান। মানুষটি লম্বা-চওড়া। রানা যখন পৌঁছুলো, গ্রীজ র‍্যাকের পিট-এ কাজ করছিলো সে।

'গুড আফটারনুন,' এগিয়ে এলো হুবার্ট ওয়েস্ট কটনে হাত ডলতে ডলতে।

'গুটেন ট্যাগ। একটু আগে টেলিফোন করেছিলাম আমি,' বললো রানা।

'জা, জা। বলুন, কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'গত রোববার যে কারটা টো করেছেন আপনি, ওটার ব্যাপারে জানতে চাই আমি।'

চোখ কোঁচকালো লোকটা, হাত থেমে গেছে। 'এনি কমপ্লেন?'

'না। আমি সেই গাড়ি এবং তার ড্রাইভারের ব্যাপারে জানতে চাই আসলে।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

একটা সার্ভে রিপোর্ট তৈরি করছি আমি। কাজে নেমে এখন শুনছি, ওইদিন নাকি একটা ওয়েদার বেলুন ক্র্যাশ করেছিলো আনটেনডর্ফে।'

'কে বললো ওয়েদার বেলুন? ওটা তো ইউএফও!'

'ইউএফও?'

'জা। জান উড়ে গিয়েছিলো আমাদের। বাপ্‌রে বাপ!'

'দেখতে কেমন ছিলো জিনিসটা?'

'অদ্ভুত একটা গোল, চ্যাপ্টা...আসলে বোঝানো যাবে না বলে। চারদিক থেকে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিলো...ঘন ঘন রঙ বদলাচ্ছিলো আলোর। দেখলাম গাঢ় নীল, পরক্ষণেই গাঢ় সবুজ...দেন, ভেতরে দুটো ক্রিয়েচার। মানুষ নয়, কিন্তু অনেকটা মানুষের মতোই দেখতে।'

'ক'টা ছিলো?'

'দু'টো।'

'জীবিত ছিলো, না...'

'দেখে মনে হয় মৃতই,' নার্ভাস এক টুকরো হাসি ফুটলো হ্যানস হুবার্টের মুখে। 'জানি, বিশ্বাস করবেন না। তবে করলে খুশি হবো। বন্ধুরা শুনে হেসেই খুন। এমনকি আমার স্ত্রী পর্যন্ত বিশ্বাস করেনি। বলে আমি নাকি মাতাল ছিলাম, কি দেখতে কি দেখেছি। কিন্তু আমি তো জানি ঠিকই দেখেছি আমি।'

'যে কারটাকে টো করছিলেন, ড্রাইভার কে ছিলো ওটার?'

'নাম জানি না। ফটোগ্রাফার ছিলো সে। আমাদের অনেকগুলো ছবি তুলেছিলো ইউএফও-র সামনে দাঁড় করিয়ে।'

'আমাদের বলতে?'

'ওই সময় একটা ট্যুরিস্ট বাস দাঁড়িয়ে ছিলো ওখানে, ওটার সব যাত্রী, ড্রাইভার আর আমি।'

'আর কেউ?'

'নাহ্‌!'

'কী গাড়ি ছিলো ফটোগ্রাফারের?'

'কার। রেনল্ট। ফুটো হয়ে গিয়েছিলো পেট্রল ট্যাঙ্ক, সব তেল পড়ে গিয়েছিলো।'

'কোন্‌ দেশী ছিলো সে?'

'বোধহয় ব্রিটিশ, ওদের মতোই ইংরেজি বলছিলো। আমার বিলও পাউণ্ডে পরিশোধ করেছে।'

'ওটার লাইসেন্স নাম্বারটা আমাকে দিতে পারেন, হের হুবার্ট?'

'পারি। কিন্তু কেন চাইছেন?'

'ওই যে বললাম, আমি এসেছি আইএসি থেকে।' পকেট থেকে একটা আই ডি কার্ড বের করে দেখালো ও হুবার্টকে। 'ইন্টারন্যাশনাল অটো ক্লাব। একটা বিশেষ সার্ভে রিপোর্ট তৈরি করছি, কি কি কারণে পথের মাঝখানে গাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, টো করতে হয়, এইসব নিয়ে আর কি।'

'বুঝেছি।' তাক ঘেঁটে নোংরা কাভারের একটা ফাইল বের করলো হ্যানস

হুবার্ট। লিখে দিলো নাম্বারটা। 'এভিস রেন্টাল সার্ভিসের গাড়ি,' বললো সে। 'জেনেভা।'

অন্ধকার মহাশূন্যে ছুটে চলেছে প্রকাণ্ড এক স্পেসশিপ–অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে, ঘন্টায় বাইশ হাজার মাইল বেগে। ওটা মাদারশিপ। ভেতরে ছয়টি ভিনগ্রহবাসী বসে আছে গদিমোড়া সীটে। দেয়ালের এক চতুর্থাংশজোড়া বিরাট এক থ্রী ডাইমেনশনাল ফিল্ড-অভ-ভিউর অপটিক্যাল স্ক্রীনে আটকে আছে সবার দৃষ্টি। ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর হলোগ্রাফিক ছবি দেখছে তারা। পর্দায় যে সব ইমেজ ভেসে উঠছে, তার প্রতিটির কেমিক্যাল কমপোনেন্টস বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে চলেছে একটি ইলেকট্রোনিক স্পেকট্রোগ্রাফ।

দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর সবখানেই আশঙ্কাজনক হারে দূষিত হয়ে উঠেছে পরিবেশ। বাতাসে খাঁটি অক্সিজেন বলতে গেলে নেই-ই। বড় বড় হাজারো কল-কারখানা অনবরত বিষাক্ত গ্যাস উগরে চলেছে। যেখানে-সেখানে ফেলা হচ্ছে বর্জ্য। এক কালের নীল সাগর আজ তেল ময়লায় কালো হয়ে গেছে। গ্রেট ব্যারিয়ার রীফের কোরাল তার স্বাভাবিক রং হারিয়ে ফেলেছে, সাদা হয়ে যাচ্ছে ক্রমেই।

একটু পর পর্দায় ভেসে উঠলো আমাজন অববাহিকা–তিন হাজার মাইলের দীর্ঘতম দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছিলো এখানে এক কালে। জঙ্গলটির দুই তৃতীয়াংশই উজাড় করে ফেলেছে ব্রাজিল। ফলে এখানকার তাপমাত্রা অনেকটা বেড়ে গেছে গত কয়েক বছরের তুলনায়।

স্পেকট্রোগ্রাফিক অ্যানালাইজারের হাজির করা নতুন তথ্য পড়লো ওরা গভীর আগ্রহের সাথে। প্রতিবছর সত্তর লক্ষ হেক্টর অঞ্চলের গাছ কাটা হয়ে থাকে আমাজন অববাহিকা থেকে। ফলে শুধু এখান থেকেই কয়েক বিলিয়ন কোটি গ্যালন কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় বছরে, এবং ওজোন স্তরে উঠে যায়।

বন বিনাশে এর পরই রয়েছে যথাক্রমে ফিলিপাইন, বাংলাদেশ, নেপাল, আমেরিকা, কানাডা এবং রাশিয়া। এর মধ্যে বাংলাদেশেরই অবস্থা সবচেয়ে করুণ বলে জানালো অ্যানালাইজার। অদ্ভুত দর্শন, ন্যাড়া একটি ভূ-খণ্ড। বলতে গেলে গাছপালাহীন একটি দেশ। ভীষণ-রকম উত্তপ্ত তার পরিবেশ। চর পড়ে সবগুলো নদী-ই বুজে গেছে প্রায়, মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে দেশটা। পরিবেশের ভারসাম্য ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে। এছাড়া সমুদ্রের সাথে এর ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতাও কমে গেছে অনেক।

ভবিষ্যদ্বাণী করছে অ্যানালাইজার: আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে দেশটির আবহাওয়া পুরোপুরি পাল্টে যাবে। গরম দীর্ঘস্থায়ী হবে, বিদেয় নেবে শীত। ঘন ঘন ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, হারিকেন এবং খরার আক্রমণে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে বাংলাদেশ।

'গাছ নয়, পৃথিবীর ওরা আসলে নিজের পায়ে কুড়াল মারে,' মেন্টাল টেলিপ্যাথির সাহায্যে আফসোসের সুরে বলে উঠলো একজন।

সায় দিলো আরেকজন, 'ঠিক। অনেক কিছুই শিখেছে ওরা, শেখেনি নিজের ভালোমন্দের বাছবিচার করতে।'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'অনেক বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কাজ হয়নি। এবার ওদের বাধা করবো আমরা। আমাদের সুন্দর পরিবেশটাও নষ্ট করে ফেলছে মানুষ।' এটি দলনেতা। হাতে ধরা রিমোট কণ্ট্রোলপেটের একটা কিছুর সুইচ টিপলো সে, অদৃশ্য হয়ে গেল পর্দার ছবি। 'এসো, আবার চেষ্টা করে দেখি নিখোঁজ শিপটার সাথে যোগাযোগ করা যায় কি না।'

জেনারেল হিলিংটনের দেয়া নাম্বারটা ঘোরালো মাসুদ রানা। প্রায় সাথে সাথেই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পাওয়া গেল লাইন।

'গুড আফটারনুন, মেজর।' টের পেলো ও, জেনারেলের গলায় চাপা উচ্ছ্বাস। চেষ্টা করেও চেপে রাখতে পারছেন না। 'রিপোর্ট করুন, প্লীজ।'

গম্ভীর গলায় বললো রানা, 'আপনি আমার কাছে সত্য গোপন করে গেছেন, জেনারেল।'

'হ্যাঁ, মেজর। কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়, কাজটা বাধ্য হয়ে করেছি আমি। প্রেসিডেন্টের নির্দেশে। তিনি চেয়েছেন, যা জানার, ওখানে গিয়েই জানুন আপনি।'

'বুঝলাম। কিন্তু কেন? এসব গোপন রাখার চেষ্টা করে কি লাভ হবে বলে আশা করছেন আপনারা?'

'আমরা চাই না জনগণ আতঙ্কিত হয়ে উঠুক, বা…মেজর?'

'বলুন, শুনছি।'

'তিন বছর আগে একটা স্পেসশিপ নেমেছিল এক ন্যাটো বেসে। তখন ওদের সঙ্গে কথা হয় আমাদের।'

'সে কি!' বিস্মিত হলো মাসুদ রানা।

'সেবার ওরা হুমকি দিয়ে গেছে যে মানবজাতিকে ধ্বংস করে দেবে ওরা একদিন।'

কথাগুলো সত্যিই শুনছে কি না, ভেবে দ্বিধায় পড়ে গেল ও। জেনারেল হিলিংটনের মুখ থেকে বেরুচ্ছে এসব কথা, বিশ্বাস-ই করতে পারছে না। 'ধ্বংস করে দেবে? কেন, আমাদের অপরাধ?'

'তা ওরাই ভালো জানে। হুমকিটাকে খুব গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলাম আমরা, মেজর। তিন বছরের আপ্রাণ চেষ্টায় আজ আমরা ওদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছি। ওদের পাল্টা মার দিতেও সক্ষম হয়েছি প্রায়। আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন, এ কথা জানাজানি হলে কি অবস্থা হবে? তা যাতে না হয়, সেজন্যেই আপনার সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছি আমরা। যে করে হোক খুঁজে বের করতেই হবে প্রত্যক্ষদর্শীদের, মুখ বন্ধ করাতে হবে প্রত্যেকের।'

'কিন্তু আমার মনে হয় না তাতে খুব একটা কাজ হবে। দুজনকে খুঁজে বের করেছি আমি। তাদের একজন এরই মধ্যে মুখ খুলেছে।'

থমকে গেলেন জেনারেল। 'তাই?'

'আরেকটা কথা, জেনারেল। আমি শিওর নই, তবুও মনে হচ্ছে, এখনও আপনার কথার মধ্যে কোথাও যেন একটু ফাঁক রয়ে গেছে। পুরোপুরি সত্য কথা এখনও চেপে যাচ্ছেন আপনি।'

'না, মেজর। আপনার অভিযোগটা সত্যি নয়। তাছাড়া, এ কথা তো স্বীকার করবেন যে এসবের সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান জড়িত নেই।'

'ব্যক্তিগত কি রাষ্ট্রীয়, সে আপনাদের ব্যাপার, স্যার। কিন্তু আমার সঙ্গে এ লুকোচুরির কোনো প্রয়োজন ছিলো না, এসব আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। ওয়েদার বেলুন যে মুহূর্তে ফ্লাইং-সসার হয়ে গেল, তখনই আপনার অ্যাসাইনমেন্ট ড্রপ করার কথা ভেবে…'

'না, মেজর, প্লীজ!' প্রায় আঁতকে উঠলেন জেনারেল হিলিংটন। 'যা হবার হয়ে গেছে। সেজন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবো আমি।'

'ভাববেন না। কথা যখন দিয়েছি, কাজটা আপনার করে দেবো আমি। কিন্তু সে শুধু আমার বস, মেজর জেনারেল রাহাত খানের কথা চিন্তা করে। কথা আমি তাঁকেও দিয়েছি। তাঁর মুখ রক্ষার জন্যেই করবো আমি কাজটা।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন জেনারেল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ধন্যবাদ, মেজর। আপনার সন্দেহ যাতে দূর হয়…'

'হবে না, জেনারেল। কারণ, লোকগুলোর সাথে আমাকে কথা বলার অনুমতি দেননি আপনি। তাদের কষ্ট করে খুঁজে বের করবো আমি, অথচ কথা বলতে পারবো না, সে ক্ষেত্রে কি করে সন্দেহমুক্ত হওয়া সম্ভব, আমি বুঝি না। বিশেষ করে যখন বেলুন সসার হয়ে যায়?'

'মেজর, আমি যা করেছি, সরাসরি প্রেসিডেন্টের নির্দেশেই করেছি। আপনি নিশ্চই আমাকে তাঁর নির্দেশ ভায়োলেট করতে অনুরোধ করবেন না। করবেন কি?'

'অবশ্যই না,' হাল ছেড়ে দিলো মাসুদ রানা।

'তাহলেই বুঝুন। এ এমন এক জায়গা, যেখানে হুকুমের বাইরে একটি পা ফেলারও উপায় নেই। না আমার, না আপনার। আসনটা আমার যতো ওপরেই হোক, আমিও হুকুমের চাকর, মেজর।'

'মানলাম। কিন্তু এসব গোপন না করে যদি সত্যি কথাটা সবাইকে জানানো হয়, ক্ষতি কি?'

'মেজর রানা, উনিশশো আটত্রিশ সালে, অরসন ওয়েলস নামে এক মার্কিন অভিনেতা ফ্লাইং সসার নিয়ে কল্পনাশ্রয়ী এক নাটক লিখেছিলো। নাটকটির নাম ছিলো "ওঅর অভ দ্য ওয়ার্ল্ডস্"। তার বক্তব্য ছিলো, ইউএফও চারীরা পৃথিবী আক্রমণ করতে আসছে। ভয়েস অভ আমেরিকা নাটকটি প্রচার করার পর কি ঘটেছিলো জানেন?'

'কি?'

'মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিলো সারা আমেরিকায়। চিৎকার করতে করতে, বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে পথে বেরিয়ে পড়েছিলো আমেরিকানরা। কাল্পনিক আক্রমণের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলো। ওইদিন কতো মানুষ যে পায়ের নিচে পড়ে নিহত হয়েছে, কোনো হিসেব নেই। একটা ব্যাপার হয়তো আপনি লক্ষ্য করবেন, মেজর। আপনার কাছে

armsumon@yahoo.com
www.murchona.com

সত্য খানিকটা গোপন করে গেছি আমি, অল রাইট। কিন্তু আপনাকে যে দায়িত্বটা দিয়েছি বিশ্বাস করে, তা আমাদের কোনো এজেন্টকে দিতে সাহস করিনি।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলালো মাসুদ রানা। হলো না, ভাবছে ও। এখনও কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল রয়ে গেছে। কিন্তু ধরতে পারছে না ও। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, 'ও কে, জেনারেল।'

'গুড!' ওর অজান্তে জেনারেলও চেপে রাখা দম ছাড়লেন। 'এবার সেই দু'জনের নাম বলুন।'

'কার্ল ম্যালডেন। ট্যুর কোম্পানির বাস ড্রাইভার…'

'অন্যজন?'

'হ্যান্স হুবার্ট। ঠিকানা: ফ্রিবর্গস্ট্রেস…'

'কংগ্র্যাচুলেশনস, মেজর।'

'আরও একজনকে সম্ভবত পেয়েছি, তবে শিওর নই।'

'কোথায় থাকে সে? কোন্ দেশী?'

'ব্রিটিশ, খুব সম্ভব। নিশ্চিত হয়ে জানাবো।'

'ঠিক আছে। মোট কতোজন ছিলো জানতে পেরেছেন?'

'দশ জন।'

'সব মিলিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'ওয়েল ডান। উইশ ইওর বেস্ট অভ লাক, মেজর।'

টেলিফোন রেখে কিছু একটা ভাবলো রানা। তারপর রাহাত খানের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত একটা বার্তা লিখলো। ওতে বাস ড্রাইভার এবং গ্যারেজ মালিকের নাম-ঠিকানা জানালো তাঁকে।

ছয়ত্রিশ নম্বর রু ডি লওসেন, এভিস রেন্টাল কার কোম্পানির অফিস। জেনেভার একেবারে কেন্দ্রে। বিরাট ব্যবসা এদের, জমজমাট অফিস। ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকে পড়লো মাসুদ রানা। রাগে লাল। ফুঁসছে। ভেতরে অনেক মানুষ, সবাই অবাক চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে।

এক কোণে ছোট্ট একটা কাঁচ ঘেরা রুম। দরজায় 'ম্যানেজার' লেখা। কোনোদিকে না তাকিয়ে হন হন করে সেদিকে চললো ও। দুয়েকজন কর্মচারী এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। বিনীত ভঙ্গিতে রানার রাগের কারণ জানতে চাইলো। কিন্তু পাত্তা দিলো না ও, ফিরেই তাকালো না। বীরদর্পে ঢুকে পড়লো ম্যানেজারের রুমে। ওর অগ্নিমূর্তি দেখে আঁতকে উঠলো মাঝবয়েসী ম্যানেজার।

তার টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজ আছড়ে ফেললো মাসুদ রানা। 'এই রেন্ট গাড়িটা গত সপ্তায় যাকে ভাড়ায় দিয়েছিলেন, তার নাম-ঠিকানা জানতে চাই আমি,' ধপাস করে বসে পড়লো।

'আমি দুঃখিত,' নাম্বারটার ওপর চোখ বুলিয়ে নরম গলায় বললো লোকটি। 'এ ধরনের ইনফরমেশন কাউকে দিতে পারি না আমরা। নিয়ম নেই।'

'সেক্ষেত্রে আপনাদের কোম্পানির বারোটা বাজাবো আমি। কেস করবো

এভিসের নামে। যাতে মোটা অঙ্কের কিছু খসে, সে ব্যবস্থা করবো।'

'বুঝলাম না,' নার্ভাস হয়ে পড়েছে ম্যানেজার। 'কেন? আমাদের অপরাধ?'

'গত রোববার এই গাড়িটা রং সাইডে এসে ধাক্কা মেরেছে আমার গাড়িকে। বিচ্ছিরিভাবে তুবড়ে গেছে আমার পোরশে।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত, স্যার,' বললো লোকটি। 'কিন্তু কি করবো আমরা, বলুন? আমরা শুধু রিপোর্ট পেয়েছি পেট্রল ট্যাঙ্ক লীক করেছিলো ওটার, কোনো অ্যাক্সিডেন্টের রিপোর্ট তো পাইনি। রিপোর্ট পেলে অবশ্যই…'

'দেখুন, আমি জানি এতে আপনাদের কোনো দোষ নেই। আপনার কোম্পানিকে বিপদে ফেলতে চাই না আমি। ও ব্যাটার ঠিকানাটা দিয়ে দিন। চলে যাই। আমার গাড়ির রিপেয়ারিঙের পুরো খরচ দিতে বাধ্য করবো আমি তাকে। আর যদি না দিতে চান, তাও বলুন। আমি…।' কাগজটা পকেটে পুরে রানা উঠতে যাচ্ছে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ম্যানেজার।

'ও কি! আরে, চলে যাচ্ছেন যে, বসুন বসুন!' জোর করে ধরে বসালো সে রানাকে। 'মাথা ঠাণ্ডা করুন, প্লীজ। আমি দেখছি। এতোবড় ক্ষতি হয়ে গেল আপনার, জেনেশুনেও কি করে চুপ থাকি, বলুন?' একটা ফাইল আনালো সে সেক্রেটারিকে দিয়ে। ওটার ভেতরে কয়েক সেকেণ্ড নজর বুলিয়ে বললো, 'এই তো! পেয়েছি। লোকটির নাম মার্টিন গুডউইল। ঠিকানা, দুইশো তেরোর এ, গ্রোভ রোড, হোয়াইটচ্যাপেল, লণ্ডন, ইস্ট-থ্রী।' চোখ তুললো ম্যানেজার। 'মিস্টার…?'

'হার্ডি। সাইমন হার্ডি।'

অনুনয়ের সুরে বললো সে, 'দেখুন, মিস্টার হার্ডি, আমার কোম্পানিকে এর সাথে জড়াবেন না, স্যার। আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'না, ঠিক আছে। আপনার চিন্তার কিছু নেই আর। ঠিকানা পেয়েছি। এখন ও ব্যাটার গুডউইল নষ্ট করার ব্যবস্থা করবো। আপনাকে ধন্যবাদ,' বেরিয়ে গেল মাসুদ রানা।

হাঁপ ছাড়লো ম্যানেজার। হার্ডিকে ম্যানেজ করতে পেরে ভারি সন্তুষ্ট।

'কোবরা।'

'হিলিংটন।'

'বলুন।'

'দু'জনকে লোকেট করেছে মাসুদ রানা। তবে…'

'তবে?'

'কিছু একটা ঘাপলা আছে সন্দেহ করে বসেছে। প্রচুর সময় লেগেছে ওকে বোঝাতে। সাঙ্ঘাতিক ধড়িবাজ মানুষ।'

'হুম!' একটু ভাবলো কোবরা। 'কোনো সমস্যা হতে পারে আশঙ্কা করছেন?'

'না, এখনই কোনো সমস্যা হবে না। হলে জানাবো।'

'গুড। কোথায় আছে এখন লোকটা?'

'লণ্ডন যাচ্ছে তৃতীয়জনকে খুঁজতে।'

'কাজের লোক। ওয়েল, ওই দু'জনের ব্যবস্থা করে ফেলুন। মেসেজ পাঠান জায়গামতো।'

'রাইট।'

ফ্ল্যাশ মেসেজ
নোতা রেড আলট্রা
এনএসএ টু ডেপুটি ডিরেকটর
বুনদেসানওয়ালটস্‌শ্যাফট
সাবজেকট: অপারেশন ডুমসডে
ওয়ান, কার্ল ম্যালডেন-ক্যাপেল
টু, হ্যানস হুবার্ট-বার্ন
এণ্ড অভ মেসেজ

চার

জেনেভা। বুনদেসানওয়ালটস্‌শ্যাফট বা এসপিওনাজ অ্যাবটেইলাঙ বা সুইস ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। এইমাত্র আসা 'নোতা রেড' ফ্ল্যাশ মেসেজটা সতর্কতার সাথে পর পর কয়েকবার পড়লেন ডেপুটি ডিরেকটর। তাঁর মুখোমুখি বসে আছে কঠোর চেহারার দুই অপারেটর, বার্তাটা তাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। একে একে পড়লো তারা।

'শুরু হয়ে গেছে?' বললো একজন।

'তাই তো দেখছি,' ডেপুটি ডিরেক্টর চিন্তিত। 'যাও তাহলে, শেষ করে এসো কাজটা। দুর্ঘটনার মতো সাজাতে হবে।'

'নো প্রবলেম,' বললো দ্বিতীয়জন।

এক সাথে উঠে দাঁড়ালো দুই অপারেটর। বেরিয়ে গেল। আনমনে কাগজটার ওপর আরও কিছুক্ষণ চোখ বোলালেন উপ-প্রধান। তারপর ড্রয়ার খুলে লাল রঙের একটা ফাইলে গেঁথে রাখলেন। ফাইলের ওপর লেখা: নোতা রেড। ড্রয়ারে তালা মেরে চাবিটা পকেটে পুরলেন তিনি। রিসিভার তুলে নিলেন ফোনের–কথা বলতে হবে এনএসএ-র ডেপুটি ডিরেকটর জেনারেল হিলিংটনের সাথে।

আলসারের ব্যথাটা আজ দিনভর ভোগাবে মনে হচ্ছে, ভাবলো কার্ল ম্যালডেন। ব্রুক টারলাম লেক পেরিয়ে হাইওয়েতে উঠে এলো ফোক্সওয়াগেন। অফিসে চলেছে সে। আজ যদি সম্ভব না-ও হয়, আগামীকাল অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, স্থির করলো সে। আর সহ্য হয় না এ নিত্য গঞ্জনা।

সচকিত হলো ম্যালডেন। সামনে একটি মেয়ে হাত নাড়ছে, গাড়ি থামাতে বলছে। গতি কমালো সে, সামনে ঝুঁকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো

মেয়েটিকে। অল্পবয়সী, চেহারা বেশ আকর্ষণীয়। গাড়ি থামালো ম্যালডেন। 'গুড মর্নিং। ক্যান আই হেলপ ইউ?' মেয়েটির রূপ আর ফিগার দেখে ব্যথা ভুলে গেল সে পলকে। ভাবলো, আহা, বয়সটা যদি আরও দশটা বছর কম হতো আমার!

'ড্যাঙ্কি,' সুইস অ্যাকসেন্টে জার্মান ভাষায় বললো সুন্দরী। 'আমাকে জুরিখ পর্যন্ত একটা লিফট দেয়া সম্ভব হবে?'

'শিওর! ওদিকেই যাবো আমি।' ওপাশের দরজা খুলে দিলো সে। 'উঠে পড়ুন।'

তার পাশে বসলো মেয়েটি। মধুর একটুকরো হাসি উপহার দিয়ে দু'হাতে অযথা বেশি সময় নিয়ে চুলগুলো পেঁচিয়ে একটা এলোখোঁপা বাঁধলো। সময়টা কাজে লাগালো ম্যালডেন, গাড়ি ছাড়ার কথা ভুলে হাঁ করে চেয়ে থাকলো তার উদ্ধত বুকের দিকে।

'কই, চলুন!'

'অ্যাঁ?...হ্যাঁ, এই তো,' তাড়াতাড়ি গিয়ার দিলো সে। 'এই অসময়ে হাইওয়েতে কেন আপনি? আই মীন, বলতে যদি আপত্তি না থাকে আর কি।'

'বয়ফ্রেণ্ডের সাথে ঝগড়া করে নেমে গেছি গাড়ি থেকে।'

'ওহ্‌ হো, সরি।'

'ও কিছু না। ওই দেখো, পরিচয়টাই হলো না এখনও। আমি ইরিন।'

'কার্ল ম্যালডেন।' গাড়ি সেকেণ্ড গিয়ারে তুললো সে।

'আপনি না এলে কি যে হতো!'

'কি আর হতো? আপনার মতো সুন্দরী হাত নাড়ছে দেখলে যে কেউ দাঁড়াতো।'

এপাশে সরে এলো ইরিন, ম্যালডেনের গা ঘেঁষে বসলো। 'কিন্তু তাদের কেউ তোমার মতো সুন্দর চেহারার হতো না নিশ্চয়ই।'

বেকুব বনে গেল ম্যালডেন। কোনো অল্পবয়সী মেয়ে তার সাথে এভাবে ঘনিষ্ঠ হবে, এ তার ধারণারও বাইরে। 'জা?'

ম্যালডেনের চোখে চোখ রেখে হাসলো মেয়েটি ঠোঁট টিপে, রক্ত গরম হয়ে উঠলো তার। 'তুমি খুব হ্যাণ্ডসাম।' আরেকটু সরে এলো ইরিন। ইচ্ছে করেই ফর্সা, লোভনীয় উরুর ওপর থেকে পিছলে সরে যেতে দিলো স্কার্টটা। শক্ত হয়ে গেছে ম্যালডেন, প্রাণপণে চেষ্টা করছে সেদিকে না তাকাতে।

'তোমার মতো কিছুটা বয়স্ক, অভিজ্ঞ পুরুষ আমার পছন্দ,' বললো ইরিন। ডান হাতে সামনে এসে পড়া ম্যালডেনের কয়েকটা চুল কানের ওপর দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিলো আদর করে। 'কার্ল, সেক্স পছন্দ করো?'

খুক করে অপ্রস্তুতের মতো কাশলো সে। 'ইয়ে...মানে, ইউ নো...আমি পুরুষ মানুষ...'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। শোনো, বয়ফ্রেণ্ডের সাথে ঝগড়া করে মনটা খারাপ হয়ে আছে। তুমি যদি...' হাত তুলে সামনের একটা পাহাড় দেখালো ইরিন, হাইওয়েটা ওটার গা ঘেঁষে গেছে। 'চলো না, ওখানে আড়াল পাওয়া যাবে,' শেষেরটুকু বললো প্রায় ফিস্‌ ফিস্‌ করে।

amrumon@yahoo.com
www.murchona.com

সশব্দে ঢোক গিললো ম্যালডেন। 'ইয়ে---অফিসে যেতে---'

'কতো আর সময় লাগবে। চলো, চলো,' এক হাত ম্যালডেনের কাঁধে তুলে দিল সে, তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো।

এবার পুরোপুরি বেসামাল হয়ে পড়লো ম্যালডেন। আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। আরেকটা ঢোক গিলে বললো, 'ঠিক আছে, চলো।'

পাহাড়ের মাঝামাঝি পৌঁছে গাড়ি থামাতে বললো ইরিন। বাঁ দিকে পাহাড়, ডান দিকে গভীর খাদ। ম্যালডেনের উরুতে হাত বোলাতে শুরু করে দিয়েছে ততোক্ষণে মেয়েটি। গাড়ি দাঁড় করিয়ে ইরিনের দিকে ঘুরতে যাবে, এমন সময় খচ্ করে একটা সুঁচের খোঁচা খেলো সে উরুতে, কাপড় ভেদ করে মাংসে ঢুকে গেছে ওটা।

চমকে উঠলো কার্ল ম্যালডেন, যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠলো চোখমুখ। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই ঢলে পড়লো সে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো মেয়েটি। জায়গাটা উঁচু হওয়ায় দু'দিকেরই অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কোনোদিকে কোনো গাড়ি নেই।

ঘুরে এপাশে চলে এলো এবার ইরিন। ধাক্কা মেরে ম্যালডেনের নিথর দেহটা সরিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসলো। ওটাকে চালিয়ে খাদের কিনারায় নিয়ে এলো সে, এবং ঠিক সময়মতো চট্ করে নেমে পড়লো আসন ছেড়ে। শূন্যে ভেসে পড়লো ফোক্সওয়াগেন।

হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিয়েছে হ্যানস হুবার্ট, গ্যারেজ বন্ধ করে বাসায় ফিরবে। এমন সময় দুই লোক এসে হাজির। তাদের বক্তব্য শুনলো হুবার্ট, তারপর মাথা দোলালো। 'দুঃখিত। আজ আর কাজ করতে পারবো না।'

'খুব বিপদে পড়েই এসেছি আপনার কাছে,' বললো একজন। 'হাইওয়ের মাঝখানে পড়ে আছে গাড়িটা। টো না করলেই নয়।'

'সম্ভব নয়। আমার স্ত্রী অপেক্ষায় আছেন আমার। পারিবারিক একটা অনুষ্ঠান আছে আজ, এখনই যেতে হবে। আপনারা এক কাজ করুন, আমি একটা ঠিকানা দিচ্ছি...'

'পাঁচশো ডলার, হের হুবার্ট,' বলে উঠলো অন্যজন। 'এবং কাজটাও খুব বড় কিছু নয়। কয়েক জায়গায় ডেন্টিং করলেই আবার নতুন হয়ে উঠবে আমাদের গাড়ি। সে জন্যে না হয় আরও পাঁচশো দেবো।'

থতমত খেয়ে গেল হ্যানস হুবার্ট। 'এক হাজার ডলার?'

'জ্বী।'

একটু ভেবে নিয়ে রাজি হয়ে গেল মেকানিক। একে ডলার, ফ্রাঙ্ক নয়, তারওপর অঙ্কটাও কল্পনাতীত। এমন সুযোগ ছাড়া স্রেফ বোকামি হবে। বললো, 'ঠিক আছে। এতো করে যখন বলছেন...'

'আপনার সার্ভিসিং ইকুইপমেন্টসগুলো কেমন, একটু দেখতে পারি? মানে, গাড়িটা খুব দামী কি-না, বোঝেন।'

'অবশ্যই। পারেন বৈকি।' ভেতরের সার্ভিস এরিয়ার উদ্দেশে পা বাড়ালো হুবার্ট। 'আসুন আমার সাথে।'

চৎচতে টাইলের মোটা দণ্ডের ওপর ছাতার মতো দাঁড়িয়ে আছে ভারি যানবাহন শূন্যে তোলার চার ফুট ডায়ার গোল একটা হাইড্রলিক লিফট। উঁকি দিয়ে নিচের অন্ধকার পিটের দিকে তাকালো আগন্তুক দু'জন। ওই গর্তেই থাকে আসলে লিফট, এ মুহূর্তে কেন যে ওটা শূন্যে তোলা আছে, কে জানে। তবে এতে যে ওরা বেশ উপকৃত হয়েছে, হ্যানস হুবার্টের তা জানা নেই। অবশ্য তোলা না থাকলেও তুলে নিতে হতো তাদের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে সন্তুষ্ট হলো আগন্তুক দু'জন। একজন বললো, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। চলবে এতেই।'

'অবশ্যই চলবে,' জোর দিয়ে বললো হুবার্ট।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলো অন্যজন। 'এই নিন,' পাঁচটা একশো ডলারের নোট এগিয়ে দিলো সে হুবার্টের দিকে। 'অর্ধেক অ্যাডভান্স। বাকিটা কাজ শেষ হলে।' পরমুহূর্তে হাত থেকে ব্যাগটা ছুটে গেল তার, সোজা গিয়ে পড়লো ওটা অন্ধকার পিটে। 'ধুশ, শা-লা!' বিড়বিড় করে উঠলো লোকটা।

'দাঁড়ান, আমি তুলে আনছি।' টাকাটা পকেটে পুরে এগিয়ে এলো মেকানিক, সাবধানে নেমে গেল পিটে। পরক্ষণেই একলাফে পিছিয়ে গেল ম্যানিব্যাগওয়ালা, ঝট করে টিপে দিলো লিফটের কন্ট্রোল বাটনটা। মৃদু গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে নামতে শুরু করলো লিফট।

'আহ্! কি করছেন?' আতঙ্কিত হুবার্ট লাফিয়ে উঠে পিটের কিনারা ধরলো, কিন্তু পর মুহূর্তেই অন্যজন বেড়ে লাথি লাগালো তার দু'হাতে। হাত ছুটে গেল হুবার্টের, ধপাস্ করে পিটের মেঝেতে চিত হয়ে পড়লো তার প্রকাণ্ড দেহটা। প্রায় একই সাথে তার মাথা স্পর্শ করলো লিফটের তলা।

মৃত্যুর আগে একবার মাত্র মায়ের ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো লোকটা। 'হিলফি!'

ফ্ল্যাশ মেসেজ
নোভা রেড আলট্রা
এসপিওনাজ অ্যাবটেইলান্ড টু ডেপুটি
ডিরেক্টর এনএসএ
সাবজেক্ট: অপারেশন ডুমসডে
ওয়ান, কার্ল ম্যালডেন-টারমিনেটেড
টু, হ্যানস হুবার্ট-টারমিনেটেড
এণ্ড অভ মেসেজ

অটোয়া, কানাডা।

বারোজনের একটা গ্রুপের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছে কোবরা। 'মিশনের অগ্রগতি সন্তোষজনক। দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীকে এর মধ্যেই সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, তারা যাতে গুজব ছড়াতে না পারে, সে ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। তৃতীয়জনকে খুঁজতে এ মুহূর্তে লন্ডনের পথে আছে মেজর মাসুদ রানা।'

'আমরা কি এসডিআই কর্মসূচীর দু'নম্বর কাজ শুরু করার জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পেরেছি?' প্রশ্ন করলো শ্রোতাদের একজন। লোকটি ইটালিয়ান।

'না,' বললো কোবরা। 'তবে খুব বেশি হলে আর এক সপ্তা। তারপর কাজ শুরু করবে স্টার ওয়ার টেকনোলজি।'

'আমাদের বোধহয় আরও তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করা উচিত।' এটি সৌদী প্রতিনিধি। দেহখানা দশাসই। কথা বলে শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। 'টাকা-পয়সার সমস্যা থাকলে বলুন। কতো বিলিয়ন দরকার?'

'না, টাকা নয়,' হাসলো কোবরা। 'একটা জটিল সাইন্টিফিক পরীক্ষা শুধু বাকি। ওটা হয়ে গেলেই...'

লণ্ডন। মিলিয়ন মিলিয়ন পাউণ্ডের স্বপ্ন দেখছে মার্টিন গুডউইল। মা সব সময় বলতেন, সুযোগ যখন আসবে, তাকে চিনে নিতে ভুল করো না যেন। সঠিক দৃশ্যটা ক্যামেরায় ধরে ফেলতে পারলেই দেখবে, দুনিয়াসুদ্ধ সবাই চিনে গেছে তোমাকে। টাকা-পয়সা তখন তোমার পিছনে ছুটবে।

মা গত হয়েছেন অনেক বছর হলো। কিন্তু তাঁর কথাগুলো ভোলেনি এখনও গুডউইল। বিশেষ করে রোজ রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে মনে মনে জপ করতো সে, মার কথাই যেন সত্যি হয়, ঈশ্বর, মার কথাই যেন সত্যি হয়। সেই চোদ্দ বছর বয়স থেকে ক্যামেরা হাতে নিয়েছে সে, দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছে আরও চোদ্দটি বছর। কিন্তু সত্যিকার সুযোগ যাকে বলে, আসেনি এতো বছরেও।

এতোদিন গুডউইলের বিষয় ছিলো ফুল আর পশু-পাখি। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায় আর ছবি তোলে। সন্ধ্যে বাসায় ফিরে নিজেই ডেভেলপ করে, পরদিন সকালে বেরুবার আগে ছবিগুলো বিভিন্ন খবরের কাগজ এবং ম্যাগাজিনের ঠিকানায় পোস্ট করে দেয়। রোজই আশা করে, আজকের ছবিগুলো নিশ্চয়ই পছন্দ হবে ওদের কারও না কারও, নিশ্চয়ই ছাপা হবে। কিন্তু আশা তার পূরণ হয় না কখনোই।

গুডউইলের ছবির মর্যাদা বা মূল্য ধরতে পারেনি পত্রিকাগুলো। একদিন, দু'দিন পরই সেগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে ছোট্ট একটি মন্তব্য, 'দুঃখিত' লিখে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড হতাশা ঘিরে ধরতো মার্টিন গুডউইলকে। ভাবতো, ফটোগ্রাফার হওয়ার মতো ট্যালেন্ট তার নেই। হবেও না কোনোদিন। ইচ্ছে হতো, সবগুলো ক্যামেরা আছড়ে ভাঙে, সেই সাথে নিজের মাথাটাও। যতোবার এ ধরনের ইচ্ছে জেগেছে, ততোবারই অলক্ষ্যে থেকে মা তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, 'ধৈর্য ধরো, অপেক্ষা করো, সময় আসবেই।'

গত সপ্তাহে তার এক দূর সম্পর্কের মামা টেলিফোন করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন গুডউইলকে। ব্যাপার নাকি জরুরী। সন্ধের পরই দেখা করে সে মামার সঙ্গে। জানা গেল, লণ্ডনের এক বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা সুইটজারল্যাণ্ডের কয়েকশো মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছাপসহ একটি কফি-টেবিল বুক প্রকাশ করতে যাচ্ছে। ছবি তোলার জন্যে এখনও কাউকে সিলেক্ট করা হয়নি। গুডউইল আগ্রহী হলে একবার ঘুরে আসতে পারে ও দেশ। ভালো, নজর কাড়ার মতো শ খানেক ছবি তুলে আনতে পারলেই চলবে।

তখনও বুঝতে পারেনি গুডউইল, জমাট বাঁধা মেঘ কেটে যেতে শুরু করেছে, তার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছেন ওর ভাগ্য-দেবতা। ওকে নিয়ে খেলা শেষ হয়েছে তাঁর। জেনেভা থেকে গাড়ি ভাড়া করে আসল কাজে নামলো মার্টিন গুডউইল। তিনদিনে দুশোরও বেশি ছবি তুলে ফেললো। এর মধ্যে রয়েছে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, জলপ্রপাত, ফসলের মাঠে কাজে ব্যস্ত কৃষক ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছবি তুলতে তুলতে বার্নের দিকে এগোচ্ছিলো সে গত রবিবার। চলছিলো ভালোই, আচমকা দু'বার লাফিয়ে উঠলো গাড়িটা। তারপর দাঁড়িয়ে পড়লো। বন্ধ হয়ে গেল স্টার্ট। ওটাকে আবার জ্যান্ত করার চেষ্টা করলো গুডউইল, কিন্তু কাজ হলো না। কুঁই কুঁই পর্যন্তই, গুঞ্জন আর তোলে না এনজিন।

বেরিয়ে এলো গুডউইল গাড়ি থেকে। পরীক্ষা করে দেখলো, লিক হয়ে গেছে পেট্রল ট্যাঙ্ক, সব তেল পড়ে গেছে। সর্বনাশ! ভাবলো সে, এখন কি হবে? সবচেয়ে কাছের শহর হলো থুন, সে-ও তো পনেরো কিলোমিটার দূরে। গাড়িটাকে টো করা ছাড়া উপায় নেই। অথচ আজ রোববার। থুনে সব বন্ধ নিশ্চয়ই—তাহলে? কি হবে এখন?

একটু পর পিছনদিক থেকে একটা মালবাহী ট্রাক আসতে দেখে হাত তুলে থামালো গুডউইল। 'বিপদে পড়েছি,' নিজের গাড়িটা দেখিয়ে ট্রাক ড্রাইভারকে বললো সে, 'পেট্রল ট্যাঙ্ক লিক, এক ফোঁটা তেলও নেই। থুন পৌঁছে আমার জন্যে যদি একটা টো ট্রাকের ব্যবস্থা করে দিতেন...।'

'লাভ হবে না, মিস্টার। আজ রোববার, সব গ্যারেজ বন্ধ,' বলে গিয়ার দিলো ড্রাইভার।

'দাঁড়ান, এক মিনিট!'

'বলুন।'

'তাহলে না হয় বার্ন পৌঁছেই একটা ব্যবস্থা করবেন, প্লীজ?' একশো ফ্রাংকের একটা নোট গুঁজে দিলো সে লোকটার পকেটে।

আড়চোখে পকেটের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো ড্রাইভার। 'ঠিক আছে। অপেক্ষা করুন।'

চলে গেল ট্রাক। অস্থির চিত্তে পায়চারি করতে লাগলো মার্টিন গুডউইল। এমনিতেই টাকা-পয়সার টানাটানি। সুইটজারল্যাণ্ড আসা, ফিল্ম কেনা, গাড়ি ভাড়া করা ইত্যাদিতে এর মধ্যেই প্রচুর খরচ হয়ে গেছে। তার ওপর এই উটকো ঝামেলা। কেন, আমাকেই কেন? তিক্ত মনে ভাবতে লাগলো সে, দুনিয়ার সব ঝামেলা আমাকেই কেন বেছে নেয় সবসময়। আর কাউকে চোখে পড়ে না?

বিরক্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো সে, এই সময় এলো টো ট্রাক। বিকেল প্রায় শেষ তখন। রওনা হলো ওরা। থুনের কাছাকাছি এসে পড়েছে, এমন সময় একটা টুরিস্ট কোম্পানির বাস পাশ কাটালো ওদের, দ্রুত বার্নের দিকে ছুটছে সামনের একটা বাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল ওটা।

আনমনা হয়ে পড়েছিলো গুডউইল, আচমকা বিকট এক শব্দে প্রায় লাফিয়েই উঠলো। মাথার ওপর দিয়ে গাঢ় সবুজ, নীল রঙ ছড়াতে ছড়াতে সগর্জনে ছুটে গেল কি যেন একটা, মুহূর্তে গাছপালার ওপাশে হারিয়ে গেল।

ammhsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'কি ওটা?' জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে টো ট্রাকে ড্রাইভারকে। 'দেখেছেন?'

'দেখেছি,' বললো প্রকাণ্ডদেহী ড্রাইভার। 'ফ্লাইং সসারের মতো লাগলো।'

'হোয়াট!' অর্ধেক শরীর জানালা দিয়ে ঠেলেঠুলে বের করে দিলো গুডউইল 'কি বললেন?'

সামনের বাঁকটা ঘুরলো এসময় ওরা। প্রায় সাথে সাথেই সেই বাসটার ওপর চোখ পড়লো, একটু আগেই ওদের পাশ কাটিয়েছিলো। যাত্রীরা সব রাস্তা পার হয়ে ছুটছে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে। উত্তেজিত গলায় চেঁচাচ্ছে সবাই, কিন্তু দূর থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। বাসের পিছনে ট্রাক দাঁড় করালো ড্রাইভার। আগেই ক্যামেরা নিয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েছে গুডউইল, সাঁই সাঁই ছুটতে শুরু করেছে গাছপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে, এঁকেবেঁকে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই থমকে দাঁড়ালো সে সামনের অবিশ্বাস্য দৃশ্যটি দেখে।

কিন্তু সে দু'তিন সেকেণ্ডের বেশি নয়। তৎপর হয়ে উঠলো মার্টিন গুডউইল। অনবরত 'ক্লিক' 'ক্লিক' আওয়াজ করতে লাগলো তার ক্যামেরার শাটার। এক রীল সাদাকালো, এবং এক রীল রঙিন ছবি তুললো সে বিধ্বস্ত ফ্লাইং সসারটির। এরপর অদ্ভুতদর্শন, মৃত দুই ভিন গ্রহবাসীর ছবিও তোলা হলো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। সবশেষে বাসের হতভম্ব যাত্রীদের ওটার সামনে দাঁড় করিয়েও তোলা হলো গোটা দশেক।

যতোবার 'ক্লিক' শব্দটা কানে গেল গুডউইলের, ততোবারই বিড়বিড় করে নিজেকে নিজে শোনালো সে, এক মিলিয়ান পাউণ্ড···আরেক মিলিয়ন পাউণ্ড···আরেক মিলিয়ন পাউণ্ড···। মানুষ যেমন অধিক শোকে পাথর হয়ে যায়, তেমনি একটা কিছু ঘটে গেছে ওর ভেতরেও, অধিক আনন্দে। পৃথিবীর সবচেয়ে নামকরা ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে চলেছে সে, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই বস্তা বস্তা টাকা নিয়ে তার পিছন পিছন ছুটবে মাথামোটা পত্রিকাওয়ালারা, যারা এতোদিন ওর ছবির কোনও মূল্যই দেয়নি। বুঝতে পেরেও কোনও উচ্ছ্বাস অনুভব করছে না সে ভেতরে।

হঠাৎ একটা বাক্য কানে যেতে চমক ভাঙলো মার্টিন গুডউইলের। ওর পাশেই দাঁড়িয়ে এক ধর্মযাজক। ঘন ঘন বুকে ক্রস আঁকছে লোকটা, গোঙাচ্ছে, 'আরমাগেডডন···আরমাগেডডন···ওহ, গড! শয়তান! ওরা শয়তান,' মৃত দুই ভিন গ্রহবাসীর দিকে চেয়ে আছে সে বিস্ফারিত চোখে। 'আমাদের ধ্বংস করতে এসেছে ওরা···ঈশ্বর, বাঁচাও!'

করুণার হাসি হাসলো মার্টিন গুডউইল। ব্যাটা বলে কি? ভাবলো সে, আমি দেখছি টাকা, খ্যাতি, আর ও বুড়ো দেখছে কি না শয়তানের মুখ! একটা বাস্তব বুদ্ধি খেলে গেল এ সময় তার মাথায়। নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে উপস্থিত সবার নাম-ঠিকানা লিখে নিলো সে। কারণ হিসেবে বলা হলো, ছবিগুলো ডেভেলপ করা হয়ে গেলে যার যার ঠিকানায় কয়েক কপি করে ছবি পাঠিয়ে দেবে সে।

সবাই তাই জানলেও আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ভিন্ন। ঠিকানা নিয়েছে সে কেউ যদি ছবিগুলোকে ভুয়া বলে চ্যালেঞ্জ করে বসে তখন কাজে লাগবে বলে। তালিকায়

চোখ বুলিয়ে খুশি হয়ে উঠলো সে, এদের অনেকেই সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এদের অবিশ্বাস করবে না কেউ।

হিথ্রো থেকে সোজা গ্রোভ রোডে এসেছে মার্টিন গুডউইল, নিজের ডেরায়। ডার্করুমে ঢুকে প্রথমেই সতর্কতার সাথে চেক করে নিয়েছে ফিল্ম ডেভেলপ করার যাবতীয় মালমশলা মজুত আছে কি না। এরপর ঘরের উজ্জ্বল বাতি নিভিয়ে অল্প শক্তির ওভারহেড লাল আলোটা জ্বেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে কাজে।

প্রথমে তরল ডেভেলপার পূর্ণ বড় একটা ট্যাঙ্কে ছাড়লো সে রীলগুলো। সতর্ক নজর রাখলো থার্মোমিটারের ওপর। পুরোটা সময় আটষট্টি ডিগ্রি ফারেনহাইট থাকতে হবে ট্যাঙ্কের তাপমাত্রা। হেরফের হলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে ছবির। এগারো মিনিট পর ডেভেলপার ফেলে দিয়ে ট্যাঙ্কে ফিক্সার ঢাললো গুডউইল। নির্দিষ্ট সময় পর ফিক্সার ফেলে বিশুদ্ধ পানিতে দশ মিনিট ডুবিয়ে রাখলো ফিল্ম। এরপর দু'মিনিট হাইপোক্লিনজিং এজেন্ট, এবং আবার বারো মিনিট পানি। সবশেষে ত্রিশ সেকেণ্ড স্নান করানো হলো ফিল্মগুলো ফটো-ফ্লো সলিউশনে।

ব্যাস্, কাজ শেষ। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দু'আঙুলে প্রথম ফিল্মটা আলোর সামনে তুলে ধরলো গুডউইল। পরক্ষণেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে লাফাতে আরম্ভ করলো ধেই ধেই করে। হয়েছে! চমৎকার হয়েছে! দারুণ এসেছে প্রত্যেকটি ছবি। ফটোগ্রাফির ভাষায় যাকে বলে মাস্টারপীস, প্রতিটি ছবিই তাই। যে কোনও ফটোগ্রাফারের জীবন ধন্য হয়ে যাবে এর একটি মাত্র ছবি তুলতে পারলেই।

শালার পত্রিকা আর ম্যাগাজিনওয়ালারা, দাঁড়াও, ভাবলো গুডউইল, বহু ভুগিয়েছো এতো বছর। এবার শোধ তুলবো তার। নাকে খত দিয়ে আসতে হবে তাদের, এতদিনের অন্যায়ের জন্যে সবিনয়ে ক্ষমা চাইতে হবে ওর কাছে। তারপর বিবেচনা করে দেখবে গুডউইল, এক আধটা ছবি দেয়া যায় কি যায় না। তবে এটা ঠিক, কোনো ছবিই এক মিলিয়ন পাউণ্ডের নিচে বেচবে না সে। সর্বনিম্ন দর ওটাই, ওপরে যতো পাওয়া যায়।

হিথ্রোর কাস্টমস ব্যারিয়ার পেরিয়ে ট্যাক্সি নিলো মাসুদ রানা, ছুটলো পুব লণ্ডনের দিকে। হোয়াইটচ্যাপেল রোডে ঢুকলো একসময় ট্যাক্সি। রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত সরু, তেমন পরিচ্ছন্নও নয়। গুলিস্তানের মতো ফুটপাথ দখল করে বসে আছে হকাররা। জামা-কাপড় থেকে শুরু করে তাজা শাক-সব্জি, এমনকি অল্প ব্যবহৃত কার্পেট পর্যন্ত বিক্রি করে এরা।

দুশো তেরোর এ, গ্রোভ রোডে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো মাসুদ রানা। শ্যাওলা পড়া নোংরা একটা দোতলা বিল্ডিং। এখানেই থাকে লোকটা, ভাবলো রানা, যার কাছে ইউএফও দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের সবার নাম-ঠিকানা আছে।

লিভিং রুমে বসে ছবিগুলো দেখছিলো মার্টিন গুডউইল। হঠাৎ ডোরবেলটা বেজে উঠতে চমকে গেল। ভয় পেয়ে গেছে। ছবিগুলো বড় একটা খামে ভরে ডার্করুমের ওয়েস্টবিনে ফেলে দিলো সে তাড়াতাড়ি। থামছে না বেল, বেজেই চলেছে। দরজা খুলে সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা নিষ্ঠুর চেহারার লোকটার দিকে তাকালো সে। সাথে সাথেই মনটা দমে গেল কেন যেন। কি যেন আছে আগন্তুকের

চাউনিতে।
'বলুন?' কোনোরকমে বললো সে।
'মার্টিন গুডউইল?' কঠোর শোনালো রানার কণ্ঠ।
'হ্যাঁ। কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'
'ভেতরে আসতে পারি?'
'বুঝতে পারছি না,' ইতস্তত করতে লাগলো গুডউইল। 'ব্যাপারটা কি?'
পকেট থেকে ব্রিটিশ ডিফেন্স মিনিস্ট্রির আইডি কার্ড বের করলো মাসুদ রানা। 'জরুরী কিছু আলাপ আছে আপনার সাথে।' নগ্ন আতঙ্ক ফুটে উঠতে দেখলো ও ফটোগ্রাফারের চোখেমুখে।
'বেশ, আসুন,' ঢোক গিললো গুডউইল।
লিভিংরুমে এনে বসালো ওকে লোকটা। বাইরের মতো ভেতরের চেহারাও প্রায় একই রকম–হদ্দ নোংরা তো মানুষটা, ভাবলো রানা। বাতাসে চাপা ঘামের দুর্গন্ধ ভাসছে।
'ব্যাপার কি, বলুন তো?'
'আপনার তোলা কিছু ছবির ব্যাপারে আলাপ করতে চাই,' বললো মাসুদ রানা।
পলকে চেহারা পাল্টে গেল ফটোগ্রাফারের, রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো চেহারা। মন শুধু শুধু বিপদ সঙ্কেত বাজায়নি, ভাবছে গুডউইল, ব্যাপারটা যে এ সংক্রান্তই কিছু হবে, তা সে ভোরবেলা বাজার সাথে সাথেই টের পেয়েছিলো। ওরা আমার সৌভাগ্য ছিনিয়ে নিতে এসেছে! রেগে গেল মার্টিন গুডউইল, যদিও মুখে তার ছায়া পড়তে দিলো না। 'কোন ছবির কথা বলছেন?'
নিষ্পলক চেয়ে আছে রানা লোকটার মুখের দিকে। 'আনটেনডর্ফে যেগুলো তুলেছেন, ফ্লাইং সসার ক্র্যাশের পর।'
মুহূর্তখানেক রানার দিকে চেয়ে থাকলো লোকটা বিস্মিত দৃষ্টিতে। তারপর জোর করে হাসলো। 'ও বুঝেছি। ওগুলো? কিন্তু ওগুলো তো আসলে তুলতে পারিনি আমি, সবগুলো নেগেটিভ জ্বলে গেছে, আনফরচুনেটলি।'
'খুব খারাপ,' গম্ভীর গলায় বললো রানা। ভাবলো, ব্যাটা মিথ্যে কথাটাও বলতে শেখেনি ভালো করে। কি ভেবে তালিকাটার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করলো না রানা। বুঝতে পেরেছে, ফটোর ব্যাপারে যখন মিথ্যে কথা বলে বসেছে, তখন ওটার ব্যাপারেও বলবে, কোনো সন্দেহ নেই।
রুমটার চারদিকে নজর বোলালো ও। এখানেই কোথাও ছবিগুলো লুকিয়ে রেখেছে ও নিশ্চয়ই। কিন্তু কোথায়?
'একটাও ওঠেনি? সব নষ্ট হয়ে গেছে?' আবার প্রশ্ন করলো ও।
'হ্যাঁ, স-ব!'
কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'দুর্ভাগ্য! কি আর করা। আচ্ছা, ঘটনার সময় একটা ট্যুরিস্ট বাসও ছিলো ওখানে, ওটা দেখেছিলেন?'
'দেখেছি।'
'ওটার প্যাসেঞ্জারদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?'
অবশ্যই পারি! তাদের সবার নাম-ঠিকানা জানি আমি। 'দুঃখিত, না। আসলে

আমি বাসে ছিলাম না, ছিলাম গাড়িতে। এই জন্যেই আর কি, বুঝলেন না?'
সাথে সাথে মাথা দোলালো রানা। 'বুঝেছি।' আসন ছেড়ে উঠলো ও। 'অল রাইট, মিস্টার গুডউইল। সহযোগিতার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'
বেরিয়ে এলো রানা। টেনে ভিড়িয়ে দিলো দরজা। তালাটার ওপর এক পলক নজর বুলিয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট হলো। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। এসব তালা খোলা ওর কাছে ডালভাত, কোনো ব্যাপারই নয়। ঠিক হ্যায়, মনে মনে বললো রাতে আবার আসবো আমি। ছবিগুলো আর লিস্টটা আমাকে পেতেই হবে।

'ইয়েস, মেজর মাসুদ রানা, বলুন?' বললেন জেনারেল হিলিংটন।
'তৃতীয়জনের পরিচয় পাওয়া গেছে।'
'গুড, গুড। বলুন।'
'মার্টিন গুডউইল। ঠিকানা: দুশো তেরোর এ, মোন্ড রোড...'
'এক্সেলেন্ট।'
ছবি বা তালিকাটার ব্যাপারে কিছু জানালো না ও জেনারেলকে। রেখে দিলো রিসিভার। তারপর ফটোগ্রাফারের নাম-ঠিকানা পাঠিয়ে দিলো ঢাকার উদ্দেশে।

গর্ডনস ফিশ অ্যাণ্ড চিপ শপ। দোকানটা ছোট, ব্রম্পটন রোডের দক্ষিণ প্রান্তে। খদ্দেররা সবাই বাঁধা ধরা, আশপাশের সরকারী অফিস-আদালতের কেরানি এবং সেক্রেটারি। ভেতরের দেয়ালগুলো বড় বড় ফুটবল পোস্টারে ঢাকা। অনেক পুরানো পোস্টার, ময়লা হয়ে গেছে রঙ।
কাউন্টারের পিছনের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। দু'বার রিঙ হতেই বিকট চেহারার এক লোক রিসিভার তুললো। সারা গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ঢোলা পাজামা আর তেলতেলে নোংরা একটা সোয়েটার পরে আছে সে।
বাঁ চোখে সাঁটা সোনার রিমের মনোকলটা তার চেহারায় কোনো আভিজাত্য ফোটাতে পারেনি। বরং আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। ওই একটিই চোখ তার, অন্যটি কাঁচের। নীল কাঁচের।
'গর্ডন বলছি।'
'আমি বিশপ।'
'ইয়েস, স্যার,' পলকে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার অ্যাটেন-শনের ভঙ্গিতে। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'বুঝতে পেরেছি, স্যার।'
'আমার পুরানো এক বন্ধুর সাথে আজ দেখা হঠাৎ করে। ওর সামনে তোমার ঝলসানো স্যামনের প্রশংসা করতে গিয়ে ফেঁসে গেছি। গাঁটের পয়সা খরচ করে খাওয়াতেই হবে তাকে, নইলে ছাড়বে না।'
'ছি, স্যার,' গলা আরও খাদে নেমে গেল গর্ডনের।
'কিন্তু তোমার ওখানে যেতে পারছে না সে, খুব ব্যস্ত। কষ্ট করে তোমাকেই তার বাসায় পৌঁছে দিতে হবে।'
'অবশ্যই, স্যার। এ তো আমার ব্যবসা। মাঝেমধ্যে খদ্দেরের সুবিধে-অসুবিধে না দেখলে চলবে কেন?'

amimsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'গুড। ঠিকানাটা লিখে নাও।'

'জ্বি, বলুন।' কাগজ কলম নিয়ে তৈরি হলো গর্ডন।

'মার্টিন গুডউইল। দুশো তেরোর এ, গ্রোভ রোড…। আজ রাতের ভেতর অবশ্যই পৌঁছে দিও, কেমন? ভুল হয় না যেন। ঝলসানো মাছ।'

'ভুল হবে না, স্যার। তবে আমি শিওর, স্যার, একবার জিনিসটার স্বাদ পেলে আবার আপনার পকেট খসাবে ভদ্রলোক।'

শেষের কথাগুলো সম্ভবত শোনেনি বিশপ, কারণ লাইনটা কেটে গেছে সেকেণ্ড দুয়েক আগেই।

পাঁচ

ওআর্ল্ড প্রেস ইন্টারভিউ নিচ্ছে মালটি বিলিওনেয়ার মার্টিন গুডউইলের। স্কটল্যাণ্ডে তার সদ্য কেনা বিলাসবহুল প্রাসাদ এবং সর্বাধুনিক বিশাল ইয়ট 'সান রাইজ' সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলো সে ঝাড়া দশ মিনিট।

'রানী এলিজাবেথ আপনাকে অফিশিয়াল রয়াল ফটোগ্রাফার পদে যোগ দেবার আহ্বান জানিয়েছেন, কথাটা কি ঠিক, মিস্টার গুডউইল?' প্রশ্ন করলো এক মেয়ে সাংবাদিক।

'ঠিক।'

'যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন?'

'নাহ। এখনও ঠিক করিনি কিছু।' অধৈর্য হয়ে উঠেছে মার্টিন গুডউইল। দাঁড়িয়ে পড়লো চট্ করে। 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, এবার ক্ষমা করতে হবে আমাকে। বিবিসি-তে শো আছে আজ আমার। দেরি হয়ে যাচ্ছে। প্লীজ…'

ধড়মড় করে উঠে বসলো মার্টিন গুডউইল। ডোরবেলটা বাজছে। এদিক-ওদিক তাকালো সে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া দৃষ্টিতে। এতোক্ষণ তাহলে স্বপ্ন দেখছিলো? হা ঈশ্বর! আর ও কি না…। আবার বেজে উঠলো ডোরবেল। তড়াক করে সোফা ছাড়লো গুডউইল। কে! সেই লোকটা আবার ফিরে এলো নাকি? মনটা কেমন যেন করে উঠলো। ঘড়ি দেখলো সে–রাত এগারোটা।

সাবধানে দরজা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিলো গুডউইল। না, সে নয়। খাটোমতো এক লোক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। 'ইয়েস?' গলায় রাগ রাগ একটা ভাব ফোটালো সে।

এমনিতেই ইতস্তত করছিলো লোকটি, ওর গলা শুনে ঘাবড়ে গেল। কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বললো, 'মিস্টার গুডউইল?'

'হ্যাঁ।'

'অসময়ে বিরক্ত করছি বলে কিছু মনে করবেন না, স্যার।' হাত কচলাচ্ছে লোকটি। 'নেমপ্লেটে দেখলাম আপনি একজন ফটোগ্রাফার…'

'তাতে কি?'

'না…মানে, পাসপোর্ট ছবি তোলেন কিনা, জানতে চাইছিলাম।'

বলে কি ব্যাটা আহাম্মক? ভাবলো সে, কদিন বাদে সারা পৃথিবী যার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছে, সে তুলবে পাসপোর্ট ছবি? মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর কাছে বাথরুম পেইন্ট করে দেবার আবদার? 'না!' খেঁকিয়ে উঠলো সে, দড়াম করে লোকটার মুখের ওপর লাগিয়ে দিতে যাচ্ছিলো দরজা।

তার আগেই বলে উঠলো আগন্তুক, 'আপনার অসুবিধে বুঝতে পারছি, মিস্টার গুডউইল। কিন্তু বিশ্বাস করুন, একান্ত নিরুপায় হয়েই এসেছি আমি। ভোর আটটায় আমার ফ্লাইট, একটু আগে কনফার্ম হয়েছে। কিন্তু পাসপোর্ট চেক করতে গিয়ে দেখি আমার ছবিটা ছিঁড়ে গেছে কি ভাবে যেন। ছবি না হলে আমি যেতে পারবো না, স্যার,' প্রায় কেঁদেই ফেললো লোকটা। 'টোকিও যাবো, স্যার। ওখানে চাকরি করি। একটা নতুন ছবি না হলেই নয়।'

'আমি দুঃখিত,' কিছুটা নরম হলো গুডউইল। 'অন্যখানে দেখুন।'

'দেখেছি, স্যার। সব বন্ধ হয়ে গেছে। স্যার,' এক পা এগুলো বেঁটে লোকটা। 'প্রয়োজনে একশো পাউণ্ড দিতেও রাজি আছি আমি।'

মর জ্বালা! ভাগ ব্যাটা!

'না হয় দুশো, না, তিনশো পাউণ্ড, স্যার?'

একটা পাসপোর্ট ছবির জন্য তিনশো পাউণ্ড? এবার প্রস্তাবটা ফেলতে পারলো না মার্টিন গুডউইল। কি আছে, করেই দিই, ভাবলো সে। ডেভেলপ করার সময়টুকু বাদ দিলে বড়জোর দশ সেকেণ্ড সময় লাগবে। দ্রুত হিসেব কষতে লাগলো সে, দশ সেকেণ্ডে তিনশো পাউণ্ড। তার মানে, প্রতি মিনিটে আঠারোশো পাউণ্ড। তাহলে ঘণ্টায় দাঁড়াচ্ছে গিয়ে এক লাখ আট হাজার পাউণ্ড। যদি রোজ আট ঘণ্টা কাজ করে সে, তাহলে অঙ্কটা…।

'প্লী-জ, স্যার। একটু কষ্ট করুন আমার জন্যে।'

'আসুন, ভেতরে আসুন,' দরজা ছেড়ে সরে গেল গুডউইল।

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

দরজার পাশের দেয়াল দেখিয়ে বললো সে, 'এখানেই দাঁড়ান।' লিভিংরুম সংলগ্ন ছোট্ট ডার্করুম থেকে একটা ভিভিটার ক্যামেরা নিয়ে এলো গুডউইল। 'নড়বেন না, সোজা হয়ে দাঁড়ান।'

'জ্বি।' টানটান হয়ে দাঁড়ালো লোকটা।

দশ সেকেণ্ড-ই লাগলো। 'ডেভেলপ করতে কিছুটা সময় লাগবে। আপনি আধঘণ্টা ঘুরে আসুন।'

'আমার কোনো তাড়া নেই, স্যার। এখানেই বরং বসি। ছবি হাতে না পাওয়া পর্যন্ত টেনশন যাবে না।'

কাঁধ ঝাঁকালো গুডউইল। 'বসুন তাহলে।'

ডার্করুমে এসে ঢুকলো সে। দরজা টেনে দিয়ে মাথার ওপরের লাল আলোটা জ্বেলে কাজে লেগে পড়লো। নিবিষ্টমনে কাজ করে চলেছে ফটোগ্রাফার। শেষবার যখন নেগেটিভটা পানিতে ডোবাতে যাবে, কেমন একটা গন্ধ এলো নাকে। হাত থেমে গেল গুডউইলের। কিসের গন্ধ? নাক টানতে লাগলো সে। দেখতে দেখতে

বেড়ে গেল গন্ধটা। মনে হচ্ছে ধোঁয়ার গন্ধ।

নেগেটিভটা ট্যাঙ্কে ফেলে দিয়ে বন্ধ দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো সে। খোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু খুলছে না দরজা। নব ঘুরিয়ে কাঁধ দিয়ে জোরে চাপ দিলো গুডউইল দরজায়, কাজ হলো না তাতেও।

'এই যে!' চেঁচিয়ে বললো মার্টিন গুডউইল। 'দরজা বন্ধ করলো কে?'

কোনো উত্তর নেই।

কাঁধের চাপ আরও বাড়ালো গুডউইল দরজায়। 'এই যে, মিস্টার?'

সাড়া নেই।

দরজায় কান পাতলো সে এবার। লিভিংরুম থেকে কেমন পড় পড় শব্দ আসছে না? 'ছ্যাৎ' করে উঠলো বুকের ভেতর—আগুন লেগে গেল নাকি ঘরে? দরজার ফাঁক দিয়ে ঘন কালো ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করেছে ডার্করুমে। খক খক করে কাশতে লাগলো মার্টিন গুডউইল। উন্মাদের মতো দমাদম কিল মারছে দরজায়। 'হেলপ! হে-ল-প!'

বাতাস নেই ঘরে এক ফোঁটাও, দম নিতে পারছে না মার্টিন গুডউইল। টাইটা খুলে ফেললো সে, টান মেরে ছিঁড়ে ফেললো কলারের বোতাম। হাঁ করে দম নেবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। আগুন ধরে গেছে যেন ফুসফুসেও। বুকের ভেতরটা জ্বালা করছে।

শক্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত গলা ফাটিয়ে চেঁচালো ফটোগ্রাফার, দেহের সব শক্তি এক করে ক্রমাগত ধাক্কা মারতে লাগলো দরজায়। শেষ মুহূর্তে হঠাৎ করেই দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল তার। বুঝতে পেরেছে, এ দরজা খোলার সাধ্য তার নেই। ওপাশ থেকে ভারি কিছু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার ওপর। আসলে সৌভাগ্য নয়, ফ্লাইং সসারটা তার মৃত্যু ডেকে এনেছে।

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মার্টিন গুডউইল। ভয়াবহ আগুনের পড় পড় পড় পড় আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, একদম কানের কাছে।

'পার্ডন, স্যার।'

'পৌঁছে দিয়েছো?'

'শিওর। তবে আজ একটু বেশি খলসে গেছে মাছটা, স্যার। আপনার বন্ধু পছন্দ করেন কি না...'

হা হা করে হেসে উঠলো বিশপ। 'না করলেই ভালো। তাতে আমার-ই তো লাভ হে!'

ব্যাপার দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মাসুদ রানা। ফায়ার এঞ্জিন, পুলিস কার আর অ্যাম্বুলেন্সে ভরে গেছে অপ্রশস্ত প্রাইভেট রোড। আর মানুষ? ভুড়োভুড়ি, চেঁচামেচি, ছোটাছুটিতে এলাকা সরগরম হয়ে আছে। মার্টিন গুডউইলের বাড়িটার কাঠামো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।

চারদিক থেকে ওটাকে ঘিরে রেখেছে পুলিস। এক ফায়ারম্যানকে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কি ভাবে লাগলো আগুন?'

'শর্ট সার্কিট।'

'আমার কাজিন থাকতো ওখানে। ও বেঁচে আছে তো?'

রানার দিকে তাকালো লোকটা। চেহারা যথাসম্ভব করুণ করে তুললো। 'আমি দুঃখিত, স্যার। একজনই থাকতো এখানে। বেঁচে নেই সে।'

ওয়াশিংটন। শ্বশুরের প্রাসাদোপম অট্টালিকার ডাইনিং রুমে লাঞ্চ করছে জিমি স্টুয়ার্ট, ওএনআই উপ-পরিচালক। তার মুখোমুখি বসে আছেন ডোনাল্ড রীক। নার্ভাস লাগছে স্টুয়ার্টের। শ্বশুরের সামনে সব সময়ই এরকম হয় তার। ঘন ঘন ঢোক গেলে, হাতের তালু ভিজে ওঠে বারবার। এছাড়া বুক ঢিপ ঢিপ তো রয়েইছে।

'কাল সন্ধ্যেয় ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিলো আমার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে,' হাসি মুখে বললেন রীক। আজ বেশ মুডে আছেন ভদ্রলোক বোঝা যাচ্ছে। 'কথায় কথায় প্রেসিডেন্ট বললেন, তোমার কাজে উনি সন্তুষ্ট, স্টুয়ার্ট।'

পুলকিত হলো ওএনআই উপ-পরিচালক। 'আমি কৃতজ্ঞ।'

মাথা দোলালেন শ্বশুর। 'আসলেই ভালো কাজ দেখিয়েছো তুমি।'

এক লোক এসে ঢুকলো ডাইনিং রুমে। লোকটা অপরিচিত। আগে কখনও এ বাড়িতে দেখেনি তাকে স্টুয়ার্ট। 'এক্সকিউজ মি,' ডোনাল্ড রীকের দিকে তাকিয়ে একঘেয়ে গলায় বললো লোকটা। 'ওরা এসে পড়েছেন।'

'ওহ্!' উঠে দাঁড়ালেন রীক। 'তুমি লাঞ্চ শেষ করো, স্টুয়ার্ট। আমি আছি পাশের রুমেই।'

জুরিখ। এক রেস্টুরেন্টে বসে আছে অদ্ভুত, অদ্ভুত রকম সুন্দরী এক যুবতী—নিঃসঙ্গ। মুখটা ম্লান। তার চারদিকে অগণিত দুই হাত, দুই পাওয়ালা এক ধরনের প্রাণী, দেখতে আজব। সমানে মুখ নড়ছে তাদের। কথা বলছে, আর গপাগপ গিলছে। এরা মাংসখেকো। এদের গায়ের দুর্গন্ধে বমি করে দিতে ইচ্ছে করছে মেয়েটির। মাংস খায় বলেই সম্ভবত এই দুর্গন্ধ।

সেদিনের ভয়াবহ দুর্ঘটনার স্মৃতি কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না সে, যে দুর্ঘটনা সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে তাকে। সেই থেকে কিছুই পেটে পড়েনি তার এ পর্যন্ত, পানি ছাড়া। দুর্ঘটনার পরদিন রাতে এক ফার্ম হাউস থেকে পানি খেয়েছিলো কেবল, বৃষ্টির পানি। এ গ্রহের কোনও কিছুই মুখে তুলতে পারছে না সে, সবকিছুতেই বিশ্রী দুর্গন্ধ।

এদের কাঁচা শাক-সবজী আর ফল-ফলাদী একেবারেই বিস্বাদ, ওদেরগুলোর ধারে কাছেও লাগে না।

নিজের চারপাশে তাকালো মেয়েটি। আজব প্রাণীগুলো থেকে থেকেই তাকাচ্ছে ওর দিকে। চাউনিগুলো কেমন যেন, খাই খাই ভাব। অস্বস্তি লাগছে ওর।

মেয়েটির বর্তমান এই রূপ তার আসল নয়, নকল। সে ছিলো সঙ্গীদের মতোই। কিন্তু দুর্ঘটনার পর নিজের আকৃতি-অবয়ব পাল্টে ফেলেছে সে বাধ্য হয়েই—এদের মতো চেহারা নিয়েছে। যাতে কেউ বুঝতে না পারে সে আলাদা, ভিন গ্রহবাসী।

annsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

নানান ভাষায় কথা বলছে লোকগুলো, কোনটিই তার বোঝার কথা নয়। তবুও বুঝতে পারছে সে। কথাগুলো তার কানের ভেতর দিয়ে ফিল্টার হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছুচ্ছে, অনুবাদ হয়ে। এ জন্যেই বুঝতে পারছে মেয়েটি তাদের মুখের কথা, এমনকি মনের ইচ্ছেটাও।

বুঝতে পারছে বলেই অস্বস্তি। ওরা তার রূপ-যৌবন নিয়ে নোংরা কথা ভাবছে। কিন্তু করার কিছুই নেই মেয়েটির। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মাত্র একবারই চেহারা পাল্টানোর ক্ষমতা আছে তার, এবং তা সে করে ফেলেছে। আর বদল করার উপায় নেই।

করতে অবশ্য পারতো, যদি তার বয়স পঞ্চাশ হাজার বছরের বেশি হতো। তাহলে একবার কেন, হাজারবার হাজাররকম চেহারা নিতে পারতো। কিন্তু তা তো হবার নয়, কারণ, তার বয়স তো সবেমাত্র আঠারো হাজার বছর—বাচ্চা মেয়ে-ই বলা চলে।

হঠাৎ সচকিত হলো মেয়েটি। মাদার শিপের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করতে হবে। হাতে ধরা ছোট রুপালী ট্রান্সমিটার সেটটার দিকে তাকালো সে, দু'ধরনের যৌগিক পদার্থ এক করে তৈরি করা হয়েছে এটা। অর্ধেকটা জ্যান্ত জৈব পদার্থের বাকি অর্ধেকটা ধাতব পদার্থের। প্রথম অর্ধেকে আছে হাজার হাজার সিগন্যাল সেল, যা মাদারশিপের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে।

কিন্তু এ মুহূর্তে পুরো কাজ করছে না ট্রান্সমিটারটা। এটাকে চালু করার যে ডিভাইসটা, সেটা নেই—দুর্ঘটনার সময় খুলে পড়ে গেছে। আগে জানতে হবে, ওটা যার কাছে আছে, সে কোথায়। নিজের ভেতরের সন্ধানী শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করলো মেয়েটি, কিন্তু পারলো না।

শক্তি নেই। একদম জোর পাচ্ছে না। না খেয়ে আর কতো পারা যায়! আর কিছু না হোক, অন্তত একটু বৃষ্টিও যদি হতো…।

রাথাউসগেস বা বার্নের প্রধান সড়ক ধরে ছুটছে রানার ট্যাক্সি, ব্যাহ্নগাসস্ট্রেস-এর দিকে। ইউনিভার্সিটি অভ বার্ন ওখানেই। পিছনের সীটে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে মাসুদ রানা। গুডউইলের তালিকাটার ওপর খুব বেশি নির্ভর করেছিলো ও। এভাবে ফট করে মরে যাবে লোকটা, কল্পনাই করেনি। এইটুকু সময়ের মধ্যে এতোবড় একটা দুর্ঘটনা…ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ও।

সামনে অন্ধকার দেখছে এখন মাসুদ রানা। চতুর্থজনকে কি করে খুঁজে বের করবে ভেবে পাচ্ছে না। সূত্র নেই। অবশ্য একেবারে যে নেই, তা নয়। আছে। এক বৃদ্ধ…বারবার ফিরে যাওয়ার জন্যে তাগাদা দিচ্ছিলো…পরদিন ভার্সিটিতে লেকচার আছে, ওটা রেডি করতে হবে। নাম? জানা নেই। কোন ভার্সিটি? বার্ন, সম্ভবত। লোকটি কোনদেশী? মনে হয় জার্মান। 'জানা নেই' 'সম্ভবত' আর 'মনে হয়'-এই সূত্র ধরে বৃদ্ধকে খুঁজে বের করতে হবে ওকে। কপালে কি আছে কে জানে।

ভার্সিটির অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিংয়ের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলো রানা। খুঁজে পেতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পি.এ.-কে পাওয়া গেল। নাদুসনুদুস, খাটোমতো

এক মাঝবয়সী মহিলা। টান টান করে আঁচড়ানো চুল ঘাড়ের কাছে কষে বাঁধা। চোখে কালো ফ্রেমের পুরু কাঁচের চশমা।

'ইয়েস?' রানাকে ঢুকতে দেখে মুখ তুললো মহিলা।

একটা আইডি কার্ড ধরলো ও তার চোখের সামনে। গম্ভীর গলায় বললো, 'ইন্টারপোল। একটা তদন্তে এসেছি। আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন।'

'শিওর, বলুন?'

'একজন প্রফেসরকে খুঁজছি আমি।'

কপাল কুঁচকে গেল মহিলার। 'কি নাম তাঁর?'

'সরি,' মাথা দোলালো রানা। 'নাম জানি না।'

'নাম জানেন না?' বিস্মিত হলো মহিলা।

'না। উনি ভিজিটিং প্রফেসর। গত সোমবার লেকচার ছিলো ওঁর।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো মহিলা, 'অনেক ভিজিটিং প্রফেসর আসেন এখানে রোজ। কোন সাবজেক্ট তাঁর?'

'জানি না। তবে ভদ্রলোক জার্মান।'

কোঁচকানো কপাল সমান হয়ে গেল। হেলান দিয়ে বসলো মহিলা।

'দুঃখিত। এভাবে কাউকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। আপনি এবার আসুন। আমি ব্যস্ত…'

'শুনুন,' গলায় রাগ রাগ একটা ভাব ফোটালো মাসুদ রানা। 'একে যে ভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে। এই লোক নারী ব্যবসায়ে জড়িত। বড় একটা গ্যাঙ পরিচালনা করে বলে রিপোর্ট পেয়েছি আমরা।'

চমকে গেল পি.এ। মহাবিস্ময়ে ঠোঁটজোড়া শূন্যের মতো ছোট একটা 'O'-র রূপ নিলো। 'নারী ব্যবসা?'

'হ্যাঁ। আমরা খবর পেয়েছি, গত সোমবার লেকচার ছিলো তাঁর। আপনি যদি সাহায্য না করেন, আমরা অফিশিয়াল তদন্ত শুরু করতে বাধ্য হবো। সেক্ষেত্রে যে পাবলিসিটি হবে…'

'না, না!' চেঁচিয়ে উঠলো মহিলা। 'ওসব করবেন না, প্লীজ! দাঁড়ান, আমি দেখছি।' সশব্দে চেয়ার ছাড়লো সে। পিছনের র‍্যাক থেকে একটা ফাইল নিয়ে ফিরে এলো তক্ষুণি। কাভার উল্টে নজর বোলাতে লাগলো ভেতরে। 'কবে লেকচার দিয়েছিলেন…বললেন?'

'সোমবার।'

খসড় খসড় করে কয়েকটা পাতা ওল্টালো মহিলা। 'এই যে, পেয়েছি। মোট তিনজন ভিজিটিং প্রফেসর ওইদিন লেকচার দেন।'

'আমি যাকে খুঁজছি তিনি জার্মান।'

'এঁরা সবাই জার্মান। একজন ইকোনমিকস, একজন কেমিস্ট্রি এবং আরেকজন সাইকোলজির।'

'দেখি,' হাত বাড়ালো মাসুদ রানা। 'দেখতে দিন শীটটা।'

'শিওর,' তাড়াতাড়ি ফাইলটা ঘুরিয়ে দিলো মহিলা। 'আপনি চাইলে ফটোকপি করে দিতে পারি।'

amitsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

'দরকার নেই।' এক পলক দেখেই তিন প্রফেসরের নাম-ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার মুখস্থ করে নিলো ও। 'কি মুশকিল!' ইতস্তত ভঙ্গিতে বললো, 'এরা তো দেখছি...কেউ-ই আমাদের সে লোক নন। তিনি থাকেন কলোনে...'

হাসি ফুটলো পি.এ-র মুখে। 'ওহ্‌, গড! বাঁচা গেল।'

'সরি। আপনাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলাম,' উঠলো রানা।

'না না, তাতে কি?' অমায়িক হাসিতে ভরে উঠেছে মহিলার গোলগাল মুখ।

শহরের দিকে মাইলখানেক এগোতেই পথের ধারে একটা ফোন-বুদ দেখে ট্যাক্সি থামালো মাসুদ রানা। প্রথম কলটা করলো বার্লিনে। 'প্রফেসর হেইঙ্গ?'

'জা!'

'আমি সানশাইন ট্যুর বাস কোম্পানি, বার্ন থেকে বলছি। গত রোববার আমাদের বাসে একজোড়া সানগ্লাস ফেলে গেছেন আপনি, স্যার।'

'সানগ্লাস! ফেলে এসেছি? কে বললো?'

'আপনি গত রোববার সুইটজারল্যাণ্ড এসেছিলেন না, ভার্সিটিতে লেকচার দেবার জন্যে?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। কিন্তু রোববার নয়, সোমবার।'

'আই সী,' চিন্তিত যেন রানা, এমনভাবে বললো, 'আপনি তাহলে আমাদের ট্যুর বাসে ছিলেন না রোববার?'

'নিশ্চয়ই না। হাওয়া খেয়ে বেড়ানোর সময় আমার নেই,' বলেই দড়াম করে রিসিভার রেখে দিলেন তিনি।

দ্বিতীয়টা করলো হামবুর্গে। 'প্রফেসর ওয়েনবার্গার?'

'বলছি।'

'গত রোববার আপনি সুইটজারল্যাণ্ড এসেছিলেন, প্রফেসর?'

'কেন জানতে চাইছেন?'

'আমি আসলে সানশাইন ট্যুর বাস কোম্পানি থেকে বলছি, স্যার। ওইদিন আমাদের বাসে ব্রীফকেস ফেলে গেছেন আপনি।'

'ভুল করছেন। অন্য কারো হবে ওটা, আমার নয়।'

'আপনি তাহলে আমাদের বাসে...'

'না। আমি কোনো ট্যুর বাসে চড়িনি।'

তৃতীয় এবং শেষ নাম্বারে ফোন করলো এবার মাসুদ রানা। এটা মিউনিখে। 'প্রফেসর অটো শিগুলার?'

'দিস ইজ অটো শিগুলার।'

'আমি সানশাইন ট্যুর বাস কোম্পানি থেকে বলছি। গত রোববার ট্যুর শেষে একটা ডায়েরী ফেলে গেছেন আপনি আমাদের বাসে, স্যার।'

'নাহ্‌! ভুল হয়েছে আপনাদের।'

ধড়াস করে উঠলো ওর বুকের মাঝে। সর্বনাশ! তবে কি? এখন কি হবে? এরা দেখছি কেউই...

আবার কথা বলে উঠলেন প্রফেসর শিগুলার। 'ডায়েরী হারাবার প্রশ্নই আসে না। ওটা সবসময়ই কোটের পকেটে রাখি আমি।'

আরেকবার লাফ দিলো কলজেটা। ভুল শোনেনি তো? 'আপনি শিওর, প্রফেসর? রোববারের ট্যুরে...?'

'হ্যাঁ, ছিলাম আমি। কিন্তু ডায়েরী হারায়নি আমার। ওটা এখন আমার সামনেই আছে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার!'

লাইন কেটে দিয়ে জেনারেল হিলিংটনের নাম্বার ঘোরালো রানা। এক মিনিটের মধ্যেই স্থাপিত হলো লাইন। 'ইয়েস, মেজর?'

'আমাদের লণ্ডনের উইটনেস, মার্টিন গুডউইল, মারা গেছে কাল রাতে।'

'হোয়াট! সে কি, কিভাবে?'

'আগুনে পুড়ে। শর্ট সার্কিটের ফলে আগুন ধরে যায় তার বাড়িতে। পুরো বাড়ি ছাই হয়ে গেছে।'

'হোলি গড! তাই নাকি? আমি দুঃখিত, মেজর। ইশ্‌শ্‌!'

'যাকগে। আরেকজনকে ট্রেস করা গেছে, মিউনিখে। যাচ্ছি আমি ওখানে।'

'আমি আপনার অপেক্ষায় থাকলাম।'

'কোবরা।'

'আরেকজন উইটনেসকে লোকেট করেছে মাসুদ রানা।'

'গুড। এদিকে এরা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। ভয় পাচ্ছে, এসডি-আই কর্মসূচীর আসল উদ্দেশ্য ফাঁস না হয়ে যায়।'

একটু চিন্তা করে বললেন হিলিংটন, 'আমি অ্যালার্ট আছি, কোবরা। নতুন খবর হলেই জানাবো আপনাকে।'

'খবর চাই না আমি। আমি রেজাল্ট চাই।'

'ইয়েস! ইয়েস, কোবরা।'

প্লাটেনস্ট্রেস, মিউনিখ। পশ্চিম জার্মানি। উচ্চ মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা। বিল্ডিংগুলো ধূসর পাথরের তৈরি, চারতলার ওপরে নেই কোনো বিল্ডিং। একটার সাথে লেগে আছে আরেকটা। পাঁচ নম্বর বাড়িটার সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো মাসুদ রানা। ঢোকার মুখেই একসার মেইলবক্স ঝোলানো রয়েছে দেয়ালে। ওর একটায় সাঁটা একটা ভিজিটিং কার্ড: প্রফেসর অটো শিগুলার।

ডোরবেলে চাপ দিলো রানা। প্রায় ওর-ই সমান লম্বা, ছিপছিপে এক বৃদ্ধ দরজা খুললেন। চুলগুলো ধপধপে সাদা, রুক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মাথায় চিরুনি পড়েছে কি না, সন্দেহ। শিশুসুলভ, অভিজাত চেহারা। পাইপ টানছেন বৃদ্ধ। 'ইয়েস?'

'প্রফেসর শিগুলার?' প্রশ্ন করলো রানা।

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিলো। আমি এসেছি...'

'সানশাইন ট্যুর বাস কোম্পানি থেকে, তাই তো? কিন্তু আপনি যা জানতে চেয়েছিলেন, সে তো তখনই জানিয়ে দিয়েছি আপনাকে।' ওকে বিস্মিত হতে দেখে

যোগ করলেন বৃদ্ধ, 'আমি ভয়েস রিকগনাইজিং এক্সপার্ট। কাম ইন।'

'ধন্যবাদ।' প্রফেসরকে অনুসরণ করে প্রকাণ্ড লিভিংরুমে এসে ঢুকলো মাসুদ রানা। ফ্লোর থেকে সিলিং পর্যন্ত দেয়াল নেই যেন এ ঘরের, ঢাকা পড়ে আছে বুক শেলফের আড়ালে। বইপত্রে ঠাসা শেলফগুলো। ওগুলো ছাড়াও আরও বই আছে–টেবিলের ওপর, চেয়ারের ওপর, এবং ফ্লোরেও। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে।

'আপনি আসলে কোনো বাস কোম্পানির সাথে জড়িত নন, তাই না?' একটা চেয়ার দেখিয়ে রানাকে বসতে বললেন শিঙ্গার।

'আমি এসেছি···'

'পত্রিকা থেকে। সাংবাদিক।'

'জ্বি।'

'এবং আপনার এই সফরের সাথে আমার "সো কলড্" ফেলে আসা ডায়েরীরও কোনো সম্পর্ক নেই, যেটা আদৌ ফেলে আসিনি আমি।'

'জ্বি, ঠিক ধরেছেন।'

'আপনি ইউএফও সম্পর্কে জানতে আগ্রহী,' মৃদু হাসলেন প্রফেসর। 'বড় ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতা ছিলো ওটা। ওদের অস্তিত্ব আছে জানতাম, কিন্তু এভাবে চোখের সামনে দেখতে পাবো, ভাবিনি কখনও।'

চুপ করে বসে আছে মাসুদ রানা। প্রশ্ন করার আপাতত প্রয়োজন নেই। আগে বলা শেষ হোক বুড়োর।

'ব্যাপারটা বলে বোঝানো সম্ভব নয়, মিস্টার···?'

'রবার্ট স্মিথ।'

'ওটার চারদিক থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছিলো ভীতিকর উজ্জ্বল আলো। কখনও গাঢ় সবুজ, পরক্ষণেই গাঢ় নীল···আর সেই সঙ্গে কেমন হিস্ হিস্ একটা আওয়াজ। মনে পড়লে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়।' পাইপে কষে একটা টান লাগালেন প্রফেসর শিঙ্গার।

'ব্যাপারটা নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করেছেন?'

হো হো করে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। 'নিজেকে পাগল সাব্যস্ত করতে? নেভার, নেভার! কে বিশ্বাস করবে? তাছাড়া, পত্রিকায় দেখেছি সুইস সরকার ব্যাপারটাকে মিথ্যে প্রমাণিত করার জন্যে আদাজল খেয়ে লেগেছে। কি দরকার বাপু আগ বাড়িয়ে ফ্যাসাদ বাধাবার?'

'আপনার আর যারা সঙ্গী ছিলেন, তাদের ব্যাপারে কিছু বলুন।'

'যতোদূর মনে পড়ে, তাদের একজন ছিলো ইটালিয়ান প্রিস্ট, একজন আমেরিকান উইথ টেক্সান অ্যাকসেন্ট। আর···ও, একজন ইংলিশ এবং একটি রাশান মেয়েও ছিলো।'

'রাশান?'

'হ্যাঁ, তবে মস্কো বা তার আশপাশের নয়। তার অ্যাকসেন্ট অনেকটা কিয়েভ, অথবা তার খুব কাছেপিঠের, এটুকু বলতে পারি।'

'আর প্রিস্ট?'

'রোমান অ্যাকসেন্টে কথা বলছিলো লোকটা। তার পাশেই ছিলো সেই টেক্সান্। ভীষণ বক্ বক্ করছিলো লোকটা। বিরক্তি লাগছিলো আমার।'

'প্রফেসর, আপনার সাবজেকট তো কেমিস্ট্রি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

পকেট থেকে কার্ল মাল্লিডেন্সের দেয়া ধাতুর টুকরোটা বের করলো মাসুদ রানা। 'দেখুন তো, এটা কি জিনিস চিনতে পারেন কি না।'

ওটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন প্রফেসর। লক্ষ করেছে রানা, মুহূর্তে মুখের ভাব পাল্টে গেছে ভদ্রলোকের। 'এটা···জিনিসটা কোথায় পেয়েছেন আপনি?'

'নেভার মাইণ্ড। ওটা কি বলতে পারবেন?'

'খুব···খুব সম্ভব কোনো ট্রান্সমিটিং ডিভাইসের অংশ।'

'তাই?'

'এই যে খাঁজ দেখছেন, বড় কোনো ইউনিটের সাথে জোড়া লাগাবার জন্যেই খাঁজটা কাটা হয়েছে মনে হয়। ধাতুটার নাম ডিলিথিয়াম। এটা হচ্ছে···মাই গড! জীবনেও এ ধরনের কোনো আলট্রা মডার্ন ডিভাইস দেখিনি আমি। ক'দিনের জন্যে এটা দিতে পারেন আমাকে? কয়েকটা স্পেক্টোগ্রাফিক স্টাডি করতে চাই।'

'সম্ভব নয়, প্রফেসর।'

'কিন্তু···'

'আমি খুবই দুঃখিত, স্যার,' টুকরোটা ফিরিয়ে নিয়ে পকেটে পুরলো রানা।

চেহারায় হতাশা চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন প্রফেসর কয়েক মুহূর্ত। ক্ষোভ মেশানো গলায় বললেন, 'না হয় একটা কার্ড দিয়ে যান আপনার। পরে যোগাযোগ করবো আমি।'

মিছেমিছি এ পকেট ও পকেট হাতড়ালো রানা। 'সরি, কার্ড সঙ্গে নেই দেখছি।'

'থাকার কথাও নয়,' গলা খাদে নামিয়ে বললেন প্রফেসর। চিন্তিত।

বুনদেসভারফ্যাসাঙসুশুটযামট। সংক্ষেপে বিএফভি। পশ্চিম জার্মান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। দেশের পবিত্র সংবিধানের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই যার লক্ষ্য। সেন্ট্রাল বার্লিনের নিউমার্কটারস্ট্রেস-এর কাছের সাদামাঠা এক বিল্ডিংয়ের দোতলায় বিএফভি-র হেডকোয়ার্টারস।

কনফারেন্স রুম থেকে এইমাত্র মীটিং সেরে বেরোলেন ডেপুটি চীফ অভ দ্য ডিপার্টমেন্ট, ইন্সপেকটর হেরম্যান স্টেমি। নিজের অফিসরুমে এসে বসামাত্র একটা বার্তা পেলেন। ওটা পড়ে কয়েক মুহূর্ত নিথর হয়ে বসে থাকলেন তিনি। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টেবিলের ওপরের লাল টেলিফোন সেটটার দিকে হাত বাড়ালেন।

পরদিন সকালে যথারীতি বাসা থেকে বেরোলেন প্রফেসর অটো শিঙ্গার, নিজের

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

কেমিস্ট্রি ল্যাবে যাবেন। গাড়ি চালাতে চালাতে রবার্ট স্মিথের কথা ভাবতে লাগলেন বৃদ্ধ। কালকের ঘটনার পর থেকে এ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে থাকতে পারেননি তিনি লোকটিকে। বিশেষ করে ওই ডিলিথিয়ামটির কথা, ওটা কোত্থেকে পেলো লোকটি, ভাবনাটা কিছুতেই ছাড়ছে না তাঁকে।

পুরো ব্যাপারটাই যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে প্রফেসরের। ডায়েরীর কথা বলে সকালে ফোন করলো বাসায়, তারপর আবার সন্ধের আগেই সশরীরে হাজির হলো এসে। তাঁর সফরসঙ্গীদের ব্যাপারে জানতে চাইছিলো লোকটা। কেন? তারা সবাই ইউএফও দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে? তাদেরকে মুখ না খোলার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে? কিন্তু তাহলে তাঁকে কেন সতর্ক করে দিয়ে গেল না সে?

ইশ্! সারারাত সেই ধাতব খণ্ডটি ঘুমুতে দেয়নি তাঁকে। একবার যদি পেতাম জিনিসটা! ল্যাবে পৌঁছে জ্যাকেট খুলে অ্যাপ্রন পরলেন বৃদ্ধ। বড়সড় ঘরটায় ঢুকে ভেতর থেকে লাগিয়ে দিলেন দরজা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে খুব জটিল এক এক্সপেরিমেন্টে ব্যস্ত প্রফেসর অটো শিঙলার। কেমিকেল এক্সপেরিমেন্ট। যদি সফল হতে পারি, ভাবছেন বৃদ্ধ, তাহলে নোবেল প্রাইজ ঠেকায় কে?

গোছগাছ করে নিয়ে কাজে লেগে পড়লেন তিনি। টেবিলের ওপর রাখা একটা বড় কনটেইনার নিজের দিকে টেনে আনলেন। মুখ খুলে ভেতরে উঁকি দিলেন। এক ধরনের হলুদ তরল পদার্থে অর্ধেকটা পর্যন্ত ভর্তি হয়ে আছে কনটেইনারটা। বিশুদ্ধ পানির একটা জার তুলে নিলেন প্রফেসর পাশ থেকে, আরেকবার উঁকি দিলেন কনটেইনারের ভেতরে।

আশ্চর্য! ভাবলেন তিনি, কাল তো এতো উজ্জ্বল হলুদ মনে হয়নি লিকুইডটা। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকালেন অটো শিঙলার, পানি ঢালতে শুরু করলেন কনটেইনারে।

ভয়াবহ বিস্ফোরণের সাথে ছিটকে শূন্যে উঠে গেল পুরো ল্যাবরেটরি। দালানের ইট-কাঠ, আর প্রফেসরের হাড়-মাংস ছুটলো দিগ্বিদিক।

ঢাকা। বিসিআই। সংস্থার প্রধান, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের মুখোমুখি বসে আছে চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ। বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে আছে ও। কপালের দু'পাশের রগ তড়াক তড়াক লাফাচ্ছে তাঁর। দাঁতে ধরা পাইপ কখন নিভে গেছে, খেয়াল নেই। টেনেই চলেছেন আনমনে। সামনের ফাইলে গাঁথা কয়েকটা মেসেজের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে দৃষ্টি। ইউরোপের কয়েকটি দেশের বিসিআইয়ের শাখা থেকে এসেছে ওগুলো। রানার বার্তাগুলোও রয়েছে ওর মধ্যে।

একসময় মুখ তুললেন রাহাত খান। বাঘের দৃষ্টিতে তাকালেন সোহেলের দিকে। 'কি মনে হয় তোমার?'

'কী অপরাধে নিরীহ মানুষগুলোকে হত্যা করছে ওরা, বুঝতে পারছি না, স্যার। ফ্লাইং সসারের দুর্ঘটনা দেখে ফেলাটা এমন কোনো অপরাধ নয়। এর মধ্যে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র আছে হয়তো। চার চারজন নিরপরাধ মানুষ খুন হয়ে গেল—বাকি ছ'জনও নিশ্চই...' উত্তেজিত হয়ে উঠলো সোহেল। 'আপনি বরং ওকে ফিরে আসতে বলুন, স্যার।'

চোখ বুজে ঝাড়া দু'মিনিট ধ্যান করলেন বৃদ্ধ। তারপর সিধে হয়ে বসলেন।

'বেশ। কোথায় আছে রানা, খোঁজ নাও। ফিরে আসতে বলো।' একটা নোট শীটে খস্ খস্ করে লিখলেন তিনি: এম আর নাইন: স্টপ ইমিডিয়েটলি: দে আর কিলিং ওয়ান আফটার অ্যানাদার: আর কে।

কাগজটা সোহেলের হাতে তুলে দিলেন বৃদ্ধ। 'এখনই পাঠিয়ে দাও।'

চেয়ার ছাড়লো সোহেল। 'জ্বি, স্যার।'

অল্পের জন্যে বার্তাটা মিস করলো মাসুদ রানা। রাহাত খানের বার্তার একটা করে কপি নিয়ে বিসিআইয়ের অপারেটররা যখন ওকে সুইটজারল্যাণ্ড আর জার্মানিতে গরু খোঁজা করে বেড়াচ্ছে, রানা তখন আকাশে—রোম চলেছে।

প্লেনের নরম গদিতে পা এলিয়ে দিয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই। সেই মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে ও চোখ বুজলেই। একই আর্তি জানাচ্ছে: 'আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!'

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো রানা কয়েকবার। কেন এমন হচ্ছে? নিজেকে প্রশ্ন করলো ও. কে মেয়েটি?

ছয়

রোম। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট। অন্যমনস্কের মতো নিজের চারপাশে তাকালো মাসুদ রানা। মনে হলো, একমাত্র ও ছাড়া আর সবাই প্রিস্ট এখানে। কতো প্রিস্ট আছে রোমে? এক লাখ? দু'লাখ? দশ লাখ? নাকি আরও বেশি? এর মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট একজনকে খুঁজে বের করতে হবে ওকে। যার নামটা পর্যন্ত জানা নেই।

ট্যাক্সি ডেকে হ্যাসলার হোটেলের উদ্দেশে চললো রানা। জানালা দিয়ে ব্যস্ত রাজপথ দেখছে আনমনে। অসাধ্য সাধনেরও একটা সীমা আছে, ভাবছে ও। কেমন করে কোনখান থেকে শুরু করবে অনুসন্ধান, ভেবে দিশে করতে পারছে না কিছুতেই। বারবার জট পাকিয়ে যাচ্ছে চিন্তার সুতোটা।

আবার প্রথম থেকে শুরু করা যাক, নিজেকে শোনালো রানা। একজন ধর্মযাজক সুইটজারল্যাণ্ড যাবে কেন? অনেক কারণ থাকতে পারে। হয়তো ছুটিতে বেড়াতে অথবা যাজকদের কোনও সমাবর্তনে যোগ দিতে। সেদিন বাসে একা সে-ই ছিলো প্রিস্ট। এর মধ্যে কি কোনও ইঙ্গিত আছে? নেই। কেবল একা ভ্রমণ করছিলো সে, সঙ্গে আর কোনও প্রিস্ট ছিলো না, এই যা। সাধারণত একা চলাফেরা করে না এরা। তবে ওর মধ্যে কোনও ইঙ্গিত আছে বলে মনে করে না রানা।

অথবা, হতে পারে, প্রিস্টদের একটা গ্রুপের সাথেই ওদেশে যায় সে। গত রোববার সঙ্গীদের হয়তো আর কোনও প্রোগ্রাম ছিলো...। বিরক্ত হয়ে মাথা ঝাঁকালো রানা, অন্য লাইনে ভাবতে হবে। তা তো বটেই। কিন্তু কোন্ লাইনে?

হোটেলে শাওয়ার শেভ সেরে বেরিয়ে পড়লো রানা। রিসটোরান্ট সিকিলায় লাঞ্চ সেরে ছুটলো ভ্যাটিকান। রোমের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, টাইবার নদীর পশ্চিম তীরের ভ্যাটিকান হিলের ওপর গড়ে উঠেছে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের পুণ্যভূমি, ভ্যাটিকান সিটি- পোপের অফিশিয়াল আবাস। মাইকেলঅ্যাঞ্জেলের ডিজাইনে তৈরি এর সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকা ডোম আর অসংখ্য কারুকাজ খচিত স্তম্ভ দেখার জন্যে দিন-রাত সারাক্ষণ প্রচণ্ড ভিড় লেগে থাকে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের।

আশপাশে দেখার অনেক কিছুই আছে, যা দেখে নয়ন মন দুই-ই সার্থক করা যায়, কিন্তু সেসবে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই মাসুদ রানার। একে তাকে জিজ্ঞেস করে ভ্যাটিকানের জনসংযোগ অফিসটা খুঁজে বের করলো ও। জনসংযোগ কর্মকর্তার বয়স অল্প, সৌম্য চেহারা।

'কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে, সেনর?'

জেনারেল হিলিংটনের ভাণ্ডারের আরেকটা আইডি কার্ড বের করলো রানা। 'টাইম ম্যাগাজিন থেকে এসেছি আমি। এখান থেকে গত সপ্তা, কি তার আগের সপ্তায় সুইটজারল্যাণ্ডে এক কনভোকেশনে গিয়েছিলেন কয়েকজন প্রিস্ট, তাদের নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখছি। কনভোকেশনের ব্যাকগ্রাউণ্ড ইনফরমেশন...'

রানাকে নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করছিলো লোকটা। হঠাৎ মাথা নাড়লো। 'না না, সুইটজারল্যাণ্ডে নয়, ওটা হয়েছিলো ভেনিসে। তা-ও গত মাসে। গত দুই-এক সপ্তার মধ্যে আমাদের কোনো প্রিস্ট সুইটজারল্যাণ্ড যাননি।' রানাকে দ্বিধান্বিত হয়ে উঠতে দেখে আবার বললো সে, 'সরি, সেনর। আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারলাম না বোধহয়।'

'ব্যাপারটা সত্যিই খুব জরুরী,' প্রায় অনুনয়ের সুরে বললো ও।

'অ! তা...' থেমে নাকের ডগা চুলকালো লোকটা, টেনেটুনে ঠিক করলো ঢিলে রোব। '...যে গ্রুপটাকে খুঁজছেন, তারা কোথাকার, আই মীন, চার্চের কোন্ ব্রাঞ্চের?'

'বুঝলাম্ না।'

'রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে অনেকগুলো সম্প্রদায় আছে। যেমন: ফ্রানসিসকান, মারিস্ট, বেনেডিকটাইন, ট্রাপিস্ট জেসুইট, ডোমিনিকান ইত্যাদি। সবচে' ভালো হয় ওঁরা যে সম্প্রদায়ের প্রিস্ট সেখানে গিয়ে খুঁজলে।'

'সেখানে' আবার কোন জাহান্নামে? ভাবলো মাসুদ রানা, ভালো ফ্যাসাদেই পড়া গেল তো! বেরিয়ে এলো অফিস থেকে। কি করবে বুঝতে পারছে না। হতাশায় ছেয়ে গেছে মনটা। শেষ পর্যন্ত কি ব্যর্থ হতে হবে? আনমনে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এলো ভ্যাটিকান থেকে। কি করা যায়? এক কাপ কফি খাওয়া যায় আপাতত। মাথা ঠাণ্ডা করে আরও একটু ভাবনা চিন্তা করা যায়।

পিয়াযযা ডেল পোপোলোয় একটা আউটডোর ক্যাফে দেখে এগোলো রানা। ফুটপাথ ঘেঁষে সাজিয়ে রাখা হয়েছে টেবিল-চেয়ার। একটা খালি টেবিল খুঁজে নিয়ে বসলো ও, কফির অর্ডার দিলো। কখন ওয়েটার কফি রেখে গেছে টেবিলে, খেয়াল করেনি রানা। ভাবছে তো ভাবছেই।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাস, প্যাসেঞ্জার তুলছে। অন্যমনস্কের মতো সেদিকে চেয়ে আছে। প্যাসেঞ্জারদের সারিতে দু'জন প্রিস্টকে দেখা যাচ্ছে। সবাই বাসে উঠেই যার যার ভাড়া পরিশোধ করলো, খালি আসনে গিয়ে বসে পড়লো। কিন্তু প্রিস্ট দু'জন ভাড়া দিলো না। কনডাকটরের সামনে গিয়ে মুখে মধুর হাসি ফোটালো দু'জনেই, নিচু গলায় কিছু বললো। সে-ও পাল্টা হাসি দিলো-বিনয়ে বিগলিত। পিছনদিকের দুটো আসনে বসে পড়লো দুই প্রিস্ট। একটু পর চলতে আরম্ভ করলো বাসটা।

বাহ্! ভাবলো রানা, চমৎকার! কি মজার বিনে পয়সার ভ্রমণ। পরক্ষণেই সচকিত হলো ও। ইউরেকা! তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা কফিটুকু এক ঢোকে পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দিলো। বিল মিটিয়ে ট্যাক্সি ডাকলো রানা। তর সইছে না। ছুটলো দশ নম্বর ভায়া পো, সুইসএয়ারের রোম অফিসের উদ্দেশে। কাছেই। আগে বিমান সার্ভিসগুলোয় দেখতে হবে। পরে প্রয়োজন হলে ট্রেন, ইন্টার-কান্ট্রি বাস সার্ভিস, সবখানে যাবে ও।

মাথা ভরা টাক, এক প্রৌঢ় দোরগোড়ায় অভ্যর্থনা জানালো ওকে। 'কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে, সেনর?'

'আপনাদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বললো মাসুদ রানা।

'আমিই ম্যানেজার, বলুন?'

কার্ড বের করে প্রৌঢ়ের নাকের সামনে ঘোরালো ও। 'পিটার হিউস্টন, ক্রম ইন্টারপোল।'

'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি?'

'কিছু কিছু আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার কাছ থেকে কমপ্লেন পেয়েছি আমরা যে ইউরোপে, বিশেষ করে রোমে, প্যাসেঞ্জারদের বেআইনী ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকেন আপনারা।'

'না, মিস্টার হিউস্টন। সুইসএয়ার কোনো ডিসকাউন্ট দেয় না একমাত্র অথেনটিকেটেড ট্রাভেল এজেন্ট ছাড়া। সবাইকেই পুরো দাম দিতে হয় টিকেটের।'

'সবাইকেই?'

'হ্যাঁ। আমাদের স্টাফরা কেবল ডিসকাউন্ট পেয়ে থাকেন। এটা সব এয়ারলাইন-ই দেয়।'

'প্রিস্টদের ডিসকাউন্ট দেন না?'

'না। এখানে তাদেরকেও পুরো পয়সা দিতে হয়।'

'ধন্যবাদ।'

বেরিয়ে এলো রানা। কাছেই আলইটালিয়ার অফিস, রাস্তার ওপারে। ফুটপাথের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে দ্রুত পা চালালো মাসুদ রানা।

'বেআইনী ডিসকাউন্ট?' থতমত খেয়ে গেল ম্যানেজার প্রশ্ন শুনে। 'না তো! আমরা কেবল সংস্থার এমপ্লয়ীদের ডিসকাউন্ট দিই। এছাড়া আর কাউকে তো...'

'প্রিস্টরাও নিশ্চয়ই পান ডিসকাউন্ট?'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ম্যানেজারের। 'ও-ও, হ্যাঁ, তা পান বৈকি! কিন্তু ওটা মোটেই বেআইনী নয়, সেনর হিউস্টন। ক্যাথলিক চার্চের সাথে আমাদের চুক্তি আছে।'

'তার মানে কোনো প্রিস্ট, ধরুন যদি সুইটজারল্যাণ্ড যেতে চান, আপনাদের এয়ারলাইনার-ই ব্যবহার করবেন তিনি?'

'অবশ্যই। তাতে খরচ অনেক কম পড়বে তাঁর।'

'আই সী! এবার দয়া করে আপনার রেকর্ডস দেখে বলুন, গত দুই সপ্তায় কতোজন প্রিস্ট সুইটজারল্যাণ্ড গেছেন। ইন্টারপোলের কম্পিউটার আপ-টু-ডেট করতে তথ্যটা প্রয়োজন। নামের তালিকা রাখেন না আপনারা?'

'নিশ্চই। একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি।'

পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলো ম্যানেজার, হাতে একটা কম্পিউটর প্রিন্টআউট। 'এই যে। গত দুই সপ্তায় মাত্র একজন প্রিস্ট আমাদের প্লেনে চড়েছেন। গত সাত তারিখে রোম থেকে জুরিখ যান তিনি। রিটার্ন টিকেটও বুক করা ছিলো। গত পরশু ফিরে আসার কথা তাঁর।'

লম্বা করে দম নিলো মাসুদ রানা। 'তাঁর নাম?'

'ফাদার পিয়েত্রো বোযযিনি।'

'ঠিকানা?'

চোখ নামিয়ে প্রিন্টআউটটার দিকে তাকিয়ে বললো ম্যানেজার, 'অরভিয়েটো থাকেন তিনি। আর যদি কোনো তথ্য...।' মুখ তুলে অবাক হলো সে।

চলে গেছে পিটার হিউস্টন।

অরভিয়েটো। ইটালি। সুপ্রাচীন এট্রুসকান শহর। আয়তন বেশি বড় নয়। কিন্তু অবিশ্বাস্যরকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো শহর। মসৃণ রাস্তার দুপাশে খোলা বাজার। কৃষকরা নিজেরাই বিক্রি করছে তাদের বাগানের তাজা শাক-সব্জি। ভোরের মিষ্টি রোদে চমৎকার লাগছে পরিবেশ।

পিয়ায্যা ডেল ডুওমোয় একটা পার্কিং লট দেখে ট্যাক্সি থামাতে বললো মাসুদ রানা। কাছেই প্রকাণ্ড এক ক্যাথেড্রাল। প্রথমে ওখানে খোঁজ নিয়ে দেখবে। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে চলে এলো রানা। হলটা প্রকাণ্ড। বয়স্ক একজন প্রিস্টকে দেখা গেল, বেদী থেকে নেমে এদিকেই আসছেন ধীর, ছোট ছোট পায়ে।

'মাফ করবেন, ফাদার,' হাসলো মাসুদ রানা। 'ফাদার পিয়েত্রো বোযযিনিকে খুঁজছি আমি, যিনি গত সপ্তায় সুইটজারল্যাণ্ড গিয়েছিলেন।'

নামটা কানে যাওয়ামাত্র ভীষণভাবে চমকে উঠলেন প্রিস্ট। ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো চেহারা। সামলে নিয়ে কঠিন গলায় বললেন, 'আমি কিছু জানি না।'

বিস্মিত হলো রানা। 'বুঝলাম না। আমি তাঁকে খুঁজছি...'

'বললাম তো,' খেঁকিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ, 'আমি জানি না। এই চার্চের কেউ নয় সে। সান গিওভেনেল চার্চে খোঁজ করুন গিয়ে।' বলেই রানার গা ঘেঁষে হন হন করে হেঁটে চলে গেলেন তিনি।

ব্যাপার কি? পিছন থেকে বেকুবের মতো চেয়ে থাকলো রানা তাঁর দিকে। নামটা শুনেই অমন ঘাবড়ে গেলেন কেন ফাদার? কাঁধ ঝাঁকালো রানা। বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো, 'সান গিওভেনেল চার্চ কোনটা, চেনো?'

মাথা দোলালো লোকটা। 'সি, সি!'

বাজার পেরিয়ে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে এগোলো ট্যাক্সি। থামলো এসে কোয়ার্টিয়েরে ভেক্কিয়ো। প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে গির্জা, হাত তুলে মাঝেরটা দেখালো ড্রাইভার। ওটার সামনের খানিকটা জায়গা কোমর সমান কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা, ভেতরে ফুলের বাগান।

সরু পাইপের সাহায্যে বাগানে পানি দিচ্ছিলো অল্পবয়সী এক ধর্মযাজক। রানাকে দেখে এগিয়ে এলো। 'গুড মর্নিং, সেনর।'

'বুওন গিওরনো, সেনর,' প্রত্যাভিবাদন করলো মাসুদ রানা। 'একজন প্রিস্টকে খুঁজছি আমি, গত সপ্তায় সুইটজারল্যাণ্ড গিয়েছিলেন তিনি। চেনেন তাঁকে?'

'সি, সি! ফাদার পিয়েত্রো বোযযিনি। বেচারা!' করুণ মুখভঙ্গি করে মাথা নাড়তে লাগলো সে। 'হঠাৎ কি যে হয়ে গেল মানুষটার!'

'কি হয়েছে তাঁর?'

'শয়তানের রথ দেখে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে ফাদারের,' তাড়াতাড়ি বুকে ক্রুশ আঁকলো যাজক।

'কি দেখে?'

'শয়তানের রথ,' আবার হাত ঘোরালো সে বুকের ওপর।

'শুনে খুব দুঃখ পেলাম,' বললো রানা। 'কোথায় আছেন ফাদার? তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি।'

'দেখা করবেন? কোত্থেকে এসেছেন?'

'ওয়াশিংটন।'

'তিনি তো হাসপাতালে। পিয়ায্যা ডি সান প্যাট্রিজিনে। কিন্তু,' ঠোঁট উল্টে মাথা দোলালো সে। 'ডাক্তাররা দেখা করতে দেবে কিনা, কে জানে।'

'দেখি গিয়ে, দেয় কি না। আপনাকে ধন্যবাদ।'

ট্যাক্সিতে ফিরে এলো রানা। ড্রাইভারকে হসপিটালের ঠিকানা বলে ভাবতে লাগলো। নার্ভাস ব্রেকডাউনে ভুগছে যে মানুষ, তার সাথে দেখা করে কি লাভ? কি আশা করছে ও তাঁর কাছে? শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে একটা পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে আছে হাসপাতালটা। উঠে এলো ট্যাক্সি। ছোট লবির এক কোণের রিসেপশন ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালো রানা।

'বুওন গিওরনো, সেনরিনা,' ডিউটি নার্সকে বললো। 'ফাদার বোযযিনির সাথে দেখা করতে চাই।'

'দুঃখিত। সম্ভব নয়। কারও সাথে দেখা করা নিষেধ আছে তাঁর।'

নরম গলায় বললো রানা, 'আপনি বুঝতে পারছেন না। ফাদার নিজেই আমাকে তাঁর সাথে দেখা করতে বলেছেন।'

'তিনি নিজে...?'

'হ্যাঁ। আমেরিকায় ফোন করেছিলেন তিনি আমাকে গত রোববার। তাঁর কল পেয়েই আমি এসেছি।'

'আমেরিকা থেকে এসেছেন আপনি?'

'সি, ওয়াশিংটন থেকে।'

ইতস্তত করতে লাগলো নার্স। 'কি করবো বুঝতে পারছি না। ফাদার খুবই অসুস্থ।'

'আমার মনে হয় আমাকে দেখলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন উনি।'

'কি যে করি…ডাক্তারও আসেননি এখনও…।' একটু চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো নার্স। 'ঠিক আছে, সেনর। কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দেয়া যাবে না। ওর অবস্থা খুবই খারাপ।'

'ওতেই চলবে। ধন্যবাদ।'

'আসুন।' ডেস্ক ঘুরে এপাশে চলে এলো নার্স। হাই হীলের খুট খুট শব্দ তুলে ওর আগে আগে হাঁটতে লাগলো লম্বা করিডর ধরে। দুপাশে অনেকগুলো কেবিন। বাঁ দিকের আট দশটা কেবিন ছাড়িয়ে এসে একটা বন্ধ দরজার সামনে থেমে দাঁড়ালো সে। 'এটাই। কিন্তু, সেনর, ওনলি ফাইভ মিনিটস।'

'মনে আছে। ধন্যবাদ।'

আস্তে করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো মাসুদ রানা। একটা ধপধপে সাদা চাদরে ঢাকা স্টীল কট আর একটা স্টীল বেডসাইড টেবিল, এতেই ভরে গেছে ছোট কেবিনটা। বিছানার সাথে প্রায় মিশে গেছেন ফাদার পিয়েত্রো বোয়ঘিনি, ওর দিকে ফিরে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। গর্তে ঢুকে গেছে চোখ, চারদিকে গাঢ় কালির দাগ। বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। নিচু গলায় ডাকলো, 'ফাদার…'

চমকে উঠে তাকালেন যাজক। চাউনিতে তাঁর যন্ত্রণার ছাপ। থতমত খেয়ে গেল মাসুদ রানা। আর কিছু বলতে সাহস হলো না।

চট্ করে ওর একটা হাত মুঠোয় চেপে ধরলেন ফাদার। 'হেলপ মি,' প্রায় ফিস ফিস্ করে ভয়তাড়িত গলায় বললেন, 'দয়া করুন, আমাকে সাহায্য করুন, প্লীজ! আমার বিশ্বাস…আমার আস্থা, সব শেষ হয়ে গেছে। সারাজীবন ঈশ্বরকে ডেকেছি আমি, তাঁর দয়া ভিক্ষা চেয়েছি। অথচ আজ…আজ বুঝতে পারছি ঈশ্বর মিথ্যে! ঈশ্বর বলে কেউ নেই। আছে কেবল শয়তান…পাপাত্মাদের অধিপতি। ওরা…ওরা আমাদের…।' উত্তেজিত হয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন তিনি। আস্তে করে কাঁধে চাপ দিয়ে শুইয়ে দিলো রানা।

'ফাদার, আপনি যদি…'

চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো হতভাগ্য ফাদারের। 'আমি নিজের চোখে দেখেছি, বিলিভ মি! শয়তানের রথে চড়ে এসেছিলো ওরা…দুটো! দলে আরও অনেক আছে। তারাও আসবে, বেশি দেরি নেই। যে কোনোদিন এসে পড়বে।'

'ফাদার,' গলা খানিকটা চড়ালো রানা। 'আমার কথা শুনুন। আপনি যা দেখেছেন, ওটা একটা স্পেসশিপ, বা ইউএফও। শয়তানের রথ নয়। আপনি আসলে…'

ওর হাতটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন ফাদার। হুঁশ হয় নিজের পরিবেশ সম্পর্কে সচকিত হয়েছেন হঠাৎ করেই। 'কে আপনি? কি চান আমার কাছে?' ক্লান্ত চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকলেন যাজক।

'আমি আপনার বন্ধু, ফাদার। আপনার সেদিনের বাস ট্যুর সম্পর্কে জানতে এসেছি। সুইটজারল্যান্ডে…'

ওকে শেষ করতে না দিয়েই বিলাপ শুরু করলেন বোয়ঘিনি। 'কেন গেলাম! কেন গেলাম আমি!'

মানুষটিকে চাপাচাপি করতে একদম ইচ্ছে হচ্ছে না রানার। কিন্তু না করেও উপায় নেই। 'আপনার পাশে যিনি বসেছিলেন, টেক্সান ভদ্রলোক, তার কথা মনে আছে আপনার? অনেক আলাপ করেছিলেন সেদিন আপনারা দুজন?'

'আলাপ করেছিলাম…টেক্সান…হ্যাঁ, মনে আছে।'

'টেক্সাসের কোথায় থাকেন ভদ্রলোক, জায়গাটার নাম জানেন?'

'হ্যাঁ, জানি। আমেরিকায়।'

'জ্বি, টেক্সাসে,' বললো রানা। 'কিন্তু কোথায়? টেক্সাসের কোথায় তাঁর বাড়ি?'

'মনে আছে, মনে আছে। টেক্সাসে। টেক্সানদের মতো কথা বলছিলো সে।'

'ঠিক বলেছেন। কিন্তু…'

'ওদের আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওহ্, ঈশ্বর, কেন অন্ধ করে দিলে না আমাকে? কেন…?'

'ফাদার, টেক্সাসের ওই লোকটা, বাড়ি কোথায় তার, জানেন?' ধৈর্যের সাথে চেয়ে আছে রানা তাঁর দিকে।

'হ্যাঁ। পনডেরোসা।'

'পনডেরোসা?' ভুরু কোঁচকালো মাসুদ রানা। 'ফাদার, ওটাতো টিভির জনপ্রিয় শো'র নাম। আমি জানতে চাইছি টেক্সান লোকটার বাড়ি কোথায়।'

'ওয়াকো।'

'ওয়াকো?'

আবার অসংলগ্ন হয়ে পড়লো ফাদারের কথাবার্তা। 'ওরা আসছে!' ফ্যাসফেঁসে গলায়, থেমে থেমে বলতে লাগলেন তিনি, 'ওরা আসছে একজোট হয়ে। আরমাগেডডন! বাইবেল মিথ্যে! ঈশ্বর মিথ্যে!' গলা চড়ে গেল, চেঁচিয়ে উঠলেন বোয়ঘিনি, 'সাবধান! সাবধান! আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি, দল বেঁধে আসছে ওরা।'

ফাদারের উঁচু গলা শুনে ছুটে এলো ডিউটি নার্স। বিরক্ত মুখে রানার দিকে তাকিয়ে বললো, 'সরি! আপনি এবার আসুন।'

শেষবারের মতো মানুষটির দিকে তাকালো রানা। কি এক নীরব যন্ত্রণায় দুর্বল দেহটা ক্রমাগত মোচড় খাচ্ছে তাঁর বিছানায়। গোঙানি বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে। তাড়াতাড়ি বেডসাইড টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল নার্স। ড্রয়ার থেকে সিরিঞ্জ বের করে খানিকটা তরল পদার্থ ঢোকালো তাতে। তারপর ফাদার কিছু টের পাওয়ার আগেই সুঁচটা ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিলো তাঁর বাহুতে।

'একটা তথ্য চাই, জেনারেল।'

'অফকোর্স! বলুন, মেজর?'

'টেক্সাসের ওয়াকোতে পনডেরোসা নামে কোনো জায়গা আছে কি না।'

'পনডেরোসা?'

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

'জ্বি।'

'ঠিক আছে, দেখছি আমি। তবে সময় লাগবে কিছুটা।'

'অসুবিধে নেই। এক ঘণ্টা পর আবার ফোন করবো।'

'ও কে। আর কিছু? আর কোনো উইটনেসকে লোকেট করা গেছে?'

'হ্যাঁ। ইটালিয়ান এক প্রিস্ট ইনি।'

'প্রিস্ট?'

'জ্বী। ফাদার পিয়েত্রো বোয়্যিনি। কিন্তু তিনি অসুস্থ, অরভিয়েটোর হাসপাতালে আছেন। নার্ভাস ব্রেকডাউন।'

'আই সী!' চিন্তিত গলায় বললেন জেনারেল হিলিংটন।

'তাঁর সঙ্গে কথা বলে লাভ হবে না ইটালিয়ান অথরিটির। উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলছেন ফাদার, অর্থহীন।'

'তাহলে…অপ্রকৃতিস্থ কোনো মানুষের সাথে কথা বলে অনর্থক সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। না কি বলেন, মেজর?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'ওয়েল, মেজর, এক ঘণ্টা পর যোগাযোগ করবেন। আমি খোঁজ নিচ্ছি পনডেরোসার।'

'আপনার কলের অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

'বলুন,' বললো রানা।

'ওয়াকোর এক র‍্যাঞ্চের নাম পনডেরোসা। মাইকেল কেন ওটার মালিক।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো মাসুদ রানা। 'থ্যাঙ্ক ইউ, জেনারেল।'

ফাদার পিয়েত্রো বোয়্যিনির নাম-ঠিকানা ঢাকার উদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটলো রানা।

মাঝরাতের একটু আগে বৃদ্ধা এক নান এলো অরভিয়েটো হাসপাতালে। ডিউটিরত নার্সের দিকে ফিরে একটুকরো মিষ্টি, পবিত্র হাসি দিলো সে। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে করিডর ধরে এগিয়ে চললো। নার্সের জানা আছে, অসুস্থ ফাদারকে দেখতে যাচ্ছে নান। রোজই আসে। তবে আজকের আসাটা অসময়ে হয়ে গেছে। কিন্তু ও নিয়ে মাথা ঘামালো না সে, চোখ নামিয়ে হাতের পর্নো ম্যাগাজিনের ছবি গিলতে শুরু করলো।

নিঃশব্দে দরজা খুললো নান ফাদার বোয়্যিনির কেবিনের, ভেতরে পা রাখার আগে চকিতে একবার নজর বুলিয়ে নিলো পিছনের করিডরে। নাহ্, কেউ নেই। আশঙ্কা ছিলো নার্সটা হয়তো সঙ্গে আসবে। কিন্তু আসেনি। ঢুকে পড়লো সে। চিত হয়ে ঘুমাচ্ছেন ফাদার। গভীর ঘুম, নির্দিষ্ট ছন্দে বুকটা ওঠানামা করছে। হাত দুটো বুকের ওপর এমনভাবে রাখা, দেখলে মনে হবে বুঝি প্রার্থনা করছেন। জানালার গ্রাইভের ফাঁক গলে এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাঁর গলায়, সাদা ফাঁসের মতো দেখতে লাগছে।

আলখাল্লার ভেতর থেকে ছোট্ট একটা কাঠের বাক্স বের করলো নান। বড় বড় পুঁতির মালার মতো খুব দামী একটা জপমালা বেরোলো তা থেকে। চমৎকার সৌখিন জিনিস। কাঁচের তৈরি। ফিনিশড্ হীরের মতো প্রতিটি কাঁচের গায়ে অসংখ্য সূক্ষ্ম কোণ জেগে আছে। প্রতিটি কোণ ক্ষুরের মতো তীক্ষ্ণ, ধারালো।

মালাটা আলতো করে ফাদারের ডান হাতের বুড়ো আঙুলে ঝুলিয়ে দিলো নান। এখন মনে হচ্ছে, জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ।

এবার খুব সাবধানে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা কাঁচের টুকরো চেপে ধরলো নান, একটা কোণ ফাদারের আঙুলে ঠেকিয়ে আস্তে করে টান দিলো। পরক্ষণেই চিকন রক্তের একটা ধারা বেরিয়ে এলো ওখান থেকে–কেটে গেছে আঙুল।

বাক্স থেকে তাড়াতাড়ি কাচের তরল পদার্থ ভরা একটা ছোট্ট শিশি আর আই-ড্রপার বের করলো নান। শিশি থেকে দু'তিন ফোঁটা লিকুইড ড্রপারে ভরে নিয়ে ঢেলে দিলো কাটা জায়গাটায়। খুবই দ্রুত কাজ করলো মারাত্মক বিষ। ঘুমের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন ফাদার পিয়েত্রো বোয়্যিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিধে হলো নান। বাক্স বন্ধ করে ঝোলার ভেতর পুরলো। জপমালাটা আগের মতোই জড়িয়ে থাকলো ফাদারের আঙুলে। তাঁর মৃতদেহের ওপর শূন্যে একটা ক্রুশ আঁকলো বৃদ্ধা। তারপর বেরিয়ে গেলো কেবিন ছেড়ে।

রোমের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে অনেকগুলো ফার্ম হাউস ঘেরা বিশাল এক এলাকা, ভায়া ভেল্লা পিনেটা। ফার্ম হাউসগুলোর ঠিক মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কারখানার মতো দেখতে নিরীহ গোছের বিশাল এক দুর্গ, দুর্ভেদ্য উঁচু দেয়াল, এবং তার ওপরে কাঁটাতারের বেড়াজালে ঘেরা। চব্বিশ ঘণ্টা হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে ওর মধ্যে দিয়ে। সেই সাথে আছে অগণিত সিকিউরিটি পোস্ট–মানুষ আর কুকুর, দুই-ই আছে ওগুলোর দায়িত্বে। প্রধান গেটে বড় বড় অক্ষরে লেখা: ডিয়েটার পাসারি অলট্রি ই লিমিটি, বা জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ইটালিয়ান সিকিউরিটি এজেন্সি, সাইফার-এর প্রধান দফতর এটা। দোতলায় নিজের সুবিশাল অফিস কক্ষে বসে আছে সংস্থার উপ-পরিচালক, কর্নেল জিয়ানলুকা ফোয়্যি। লম্বা-চওড়া, পেশীবহুল কর্নেলকে দেখলে মনেই হয় না পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে সে। প্রকাণ্ড মুখ ভর্তি চাঁদের উল্টোপিঠের মতো ছোট বড় গর্ত–তরুণ বয়সে ব্রণ খোঁচাখুঁচির সাক্ষী। চেহারাটা সব মিলিয়ে বুলডগের মতো।

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, অথচ অফিস ছেড়ে নড়ার লক্ষণ নেই কর্নেলের। কি এক প্রতীক্ষায় আছে। অস্থির। হাতে একটা কাগজ। বিশেষ একটা বার্তা আছে ওতে, ওয়াশিংটন থেকে এসেছে। মাঝে মধ্যে ওটার লেখাগুলো পড়ছে, আবার ওটা দিয়েই বাতাস করছে নাকেমুখে। যদিও এর প্রয়োজন নেই কোনও, বিল্ডিংটা সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশণ্ড।

সাড়ে বারোটায় এলো টেলিফোনটা। অন্যমনস্ক ছিলো কর্নেল ফোয়্যি, চমকে উঠলো বেলের তীক্ষ্ণ আওয়াজে। 'ইয়েস!' প্রায় হালুম করে উঠলো রিসিভার

animesumon@yahoo.com
www.murchona.com

ধরেই। ও প্রান্তের বক্তব্য শুনলো কয়েক সেকেণ্ড। তারপর আবার হুঙ্কার ছাড়ালো, 'শিওর?'

ভিয়েতনাম যুদ্ধে 'বিশেষ কৃতিত্ব' দেখাতে পারায় 'গ্রীন বেরেট' লাভ করে হ্যারিসন কেলার। এবং এই জন্যেই দলে ঢোকানো হয়েছে তাকে। যুদ্ধের সময় সুপিরিয়র অফিসার থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই আদর করে নাম রাখে তার 'কিলিং মেশিন'। হত্যা করার মতো আনন্দ আর কিছুতেই পায় না লোকটা। তখন অবশ্য লেফটেন্যান্ট ছিলো সে, অবসর নিয়েছে কর্নেল হয়ে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী কর্নেল হ্যারিসন কেলার। এবং নিবেদিত প্রাণ।

'একে দলে আনতে পারলে দারুণ হয়,' মন্তব্য করেছিলো কোব্রা। 'খুব সাবধানে, একটু একটু করে এগোও। ফসকে যায় না যেন।'

সে প্রায় আড়াই বছর আগের কথা। প্রথম মীটিং বসে এক আর্মি ব্যারাকে। তার সঙ্গে দেখা করতে আসে এক ক্যাপ্টেন। 'এ দেশে সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে যে কতো রাজ্যের ঝামেলা পোহাতে হয় ক্ষমতাসীনদের, তা কি আপনি জানেন, কর্নেল?' প্রশ্ন করে ক্যাপ্টেন।

'যেমন?'

'যেমন ধরুন,আমাদের আরও নিউক্লিয়ার পাওয়ার চাই, আরও অনেক প্ল্যান্ট ইমিডিয়েটলি বসানো প্রয়োজন। অথচ হারামজাদা পলিটিশিয়ানরা তা হতে দেবে না। এ নিয়ে কথা তুলতে গেলেই চেঁচিয়ে সেনেট মাথায় তোলে খোঁয়াড়ের শুয়োরগুলো। তেলের জন্যে আরবদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে হয় আমাদের। অথচ প্রচুর তেল জমা আছে জেনেও নিজেদের উপকূলে ড্রিল করতে দেয়া হয় না আমাদের। কেন জানেন? কারণ, তাতে মাছের ক্ষতি হবে। বুঝুন তাহলে, মানুষ ছেড়ে মাছ নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তাদের। আপনিই বলুন, এর কোনো অর্থ হয়?'

চট করে কোনো মতামত দিতে রাজি নয় কর্নেল। তাছাড়া, সে জানেই না কোনদিকে গড়াচ্ছে আলোচনা। ধীরস্থির কণ্ঠে বললো সে, 'আই সী ইওর পয়েন্ট।'

'আমি জানতাম আপনি বুঝবেন। আপনার মতো বুদ্ধিমান মানুষ খুব কমই দেখেছি।' কেলারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেন তীক্ষ্ণ চোখে, কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে হয়তো। 'দেশকে রক্ষার ব্যাপারে সরকার যদি তেমন শক্ত ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে আমার আপনার মতো দেশপ্রেমিকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। কিছু একটা করতে হবে।'

চিন্তায় পড়ে গেল কর্নেল হ্যারিসন কেলার। 'আমাদেরকে?'

'হ্যাঁ।' প্রথম দিনে আর বেশি এগোনো ঠিক হবে না, ভাবলো ক্যাপ্টেন। 'এ নিয়ে পরে আবার না হয় আলোচনা করবো আমরা।'

'বেশ।'

পরের বৈঠকটা ছিলো আরও ইঙ্গিতবহ। 'দেশপ্রেমিকদের একটা গ্রুপ, কর্নেল,' বললো ক্যাপ্টেন, 'প্রত্যেকেই অপরিসীম ক্ষমতাবান। আমাদের দেশকে রক্ষার দৃঢ়

সংকল্প নিয়েছেন তাঁরা। প্রয়োজনে আইন অমান্য করবে তাঁদের গ্রুপ, নতুন আইন তৈরি করবে। আপনি কি আগ্রহ বোধ করছেন, কর্নেল?'

'অবশ্যই।'

ক্যাপ্টেনের তরফ থেকে হ্যারিসন কেলারকে গ্রুপের নেতৃস্থানীয় একজন কর্মী হিসেবে নিয়োগ করার সুপারিশ গেল গ্রুপের হেড অফিস, অটোয়ায়। সেই থেকে শুরু। পরের মীটিং বসলো হেড অফিসে, গ্রুপের কয়েকজন পরিচালকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো কেলারকে।

'আমরা ওয়েল অর্গানাইজড,' পরিচালকদের একজন জানালেন কেলারকে। 'অনেকগুলো শাখা আছে আমাদের, যেমন, প্রপাগাণ্ডা উইং, রিক্রুটিং, ট্যাকটিকস, লিয়াজোঁ---এবং ডেথ স্কোয়াড। পৃথিবীর প্রায় সব ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন আমাদের সহায়তা করছে। যখন যে দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, বিনা প্রশ্নে তা পালন করবে তারা।'

'আপনি বলছেন ওদের প্রধানরা---?'

'না। উপ-প্রধানরা। ডেপুটিজ। যারা জনসাধারণের কাছের মানুষ, জানে, পৃথিবীর কোথায় কি চলছে। মানুষ কি চায়। কোনটা আগে প্রয়োজন তাদের।'

সুইটজারল্যাণ্ড, মরক্কো, চীন, জাপানসহ আরও অনেক দেশে মীটিং বসলো গ্রুপের কর্নেল হ্যারিসন কেলারকেও যোগ দিতে হলো তার সবগুলোয়। এরপর কোব্রার সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ হলো তার।

'আপনার ব্যাপারে যে রিপোর্ট আমি পেয়েছি, তা এক কথায় একসেলেন্ট, কর্নেল,' কেলারকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললো কোব্রা।

বিনয়ের হাসি ফুটলো কেলারের মুখে। 'ধন্যবাদ। যে কোনো কাজই খুব সিরিয়াসলি করি আমি সবসময়।'

'আমিও তাই শুনেছি,' সায় দিলো কোব্রা। 'আপনার সহযোগিতা আমাদেরকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।'

'গ্রুপের জন্যে যে-কোনো কাজ করতে প্রস্তুত আছি আমি।'

'গুড। আপনার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের বাছাই করা কিছু স্বেচ্ছাসেবককে ট্রেনিং দেয়া। ফুল কম্যাণ্ডো ট্রেনিং।'

'বেশ।'

'আমার ইচ্ছে, কম্যাণ্ডো গ্রুপে কাকে কাকে নেয়া হবে, আপনিই বাছাই করবেন। সবাইকে তো নেয়া যাবে না।

'ওটা কোনো সমস্যা হবে না,' বললো কেলার। 'তবে---'

'বলুন?'

'এসব আসলে আমার বাঁ হাতের কাজ। আমি আরও বড় কিছু করতে আগ্রহী।'

'আছে। আরও বড় কাজও আছে। আপনি করতে আগ্রহী?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর সে কাজ।' থেমে গেল কোব্রা, অপলক চোখে দেখছে কর্নেলকে।

'ভয়ঙ্কর কাজই আমার প্রিয়, ইউ নো।'

'আমাদের বিশেষ একটা প্রকল্প আছে। ভেরি ভেরি সিক্রেট।'

'ওটায় কাজ করতে চাই আমি।' আগ্রহের আতিশয্যে সামনে ঝুঁকে এলো হ্যারিসন কেলার।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো কোব্‌রা। তারপর হঠাৎ করেই মাথা দোলালো। 'অল রাইট। ইউ আর মোস্ট ওয়েল কাম।'

এরপর দীর্ঘ দু'ঘণ্টা চললো তাদের গোপন বৈঠক।

পরদিন খুশিমনে ওয়াশিংটন ফিরে গেল হ্যারিসন কেলার।

বিসিআইয়ের রোম চীফ মাসুদ রানার সন্ধান পেলো অনেক দেরিতে। ততোক্ষণে ওয়াকো পৌঁছে গেছে ও। এবং ইহলোকের দেনা-পাওনা চুকিয়ে মুক্তি লাভ করেছেন ফাদার গিয়েত্রো বোয়র্যিনি। খবরটা ঢাকাকে জানিয়ে দিলো সে।

সাত

ওয়াকো। টেক্সাস। বড্ড দুঃসময় চলছে মাইকেল কেনের। বলতে গেলে দিন-রাত সারাক্ষণ দুঃস্বপ্ন দেখছে। এইমাত্র ওয়াকো কাউন্টি কোর্টহাউস থেকে ফিরলো সে। ওখানে তাকে দেউলিয়া ঘোষণার ষড়যন্ত্র চলছে। ওদিকে আরেক খেলা শুরু করেছে কেনের প্রিয়তমা স্ত্রী। অনেকদিন থেকেই অল্পবয়সী, অবিবাহিত এক পারিবারিক চিকিৎসকের সাথে লটরপটর চলছিলো তার। বুঝেও না বোঝার ভান করছিলো কেন।

ফলটা হয়েছে মারাত্মক। বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ওরা। কেনের সাথে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা ঠুকে দিয়েছে স্ত্রী। এবং বিচ্ছেদের প্রার্থনায় মাইকেল কেনের বিরুদ্ধে স্ত্রী যে সব অভিযোগ এনেছে, তার সবগুলোই ডাহা মিথ্যে। দিশেহারা অবস্থা হয়েছে কেনের দুটো মামলা সামলাতে গিয়ে।

পিতার একমাত্র সন্তান কেন। হাজার একরেরও বড় র‍্যাঞ্চ আর প্রায় দু'হাজার পশু-বহরের মালিক হয় সে পিতার মৃত্যুর পর। র‍্যাঞ্চের সীমানা বাড়াতে পারেনি সে ঠিকই, তবে বহরের পশুর সংখ্যা দু'হাজার থেকে দশ হাজারে উন্নীত করেছে গত ছয় বছরে। এ জন্যে প্রচুর ঋণ করতে হয়েছে কেনকে।

সেই ঋণ গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দু'বছর এক পয়সাও শোধ করতে পারেনি কেন। পশুর দাম পড়ে গেছে সাংঘাতিক হারে। বেচতে গেলেই লোকসান। গত একশো বছরেও এমনটি ঘটেনি টেক্সাসের ইতিহাসে। একদিকে স্ত্রীর ডিভোর্স স্যুট, অন্যদিকে ব্যাঙ্কের নোটিস, কি করে বাঁচা যায়, ভেবে পাচ্ছে না সে।

মরিয়া হয়ে একজন ক্রেতা খুঁজছিলো মাইকেল কেন। র‍্যাঞ্চ বিক্রির টাকা দিয়ে ব্যাঙ্কের এবং এর-ওর কাছে খুচরো-খাচরা যে সব দেনা আছে, তা শোধ করে যা থাকবে, তা দিয়ে অন্য কিছু করে খাবে। গত দু'সপ্তাহ আগে এক সুইস কোটিপতির খোঁজ পায় কেন, টেক্সাসে র‍্যাঞ্চ কিনতে আগ্রহী তিনি। তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই

জুরিখ গিয়েছিলো সে। ভদ্রলোকের সাথে সাক্ষাৎ করে জানা গেল, র‍্যাঞ্চ নয়, এক কি বড়জোর দুই একরের একটি শাক-সবজির বাগানের খোঁজে আছেন তিনি। শখ।

ভাগ্যকে গোটাকয়েক ভালোমন্দ গালাগাল দিয়ে ফিরে আসছিলো মাইকেল কেন। জুরিখ থেকে বার্ন আসার পথে আর সবার মতো তারও বিধ্বস্ত ফ্লাইং সসার দেখার 'সৌভাগ্য' হয়। ওয়াকো ফিরেই এক বন্ধু, স্থানীয় এক পত্রিকার সম্পাদককে টেলিফোনে জানায় সে ব্যাপারটা।

'যীশুর কিরে, দোস্ত, নিজের চোখে দেখেছি। ভেতরে দুটো ডেড বডিও ছিলো-কানি লুকিং।'

'তাই নাকি? ছবি তুলেছো?' জিজ্ঞেস করলো সম্পাদক।

'না।'

'ঠিক আছে। আমিই পাঠাচ্ছি একজন ফটোগ্রাফার। কোথায় পড়েছে, তোমার র‍্যাঞ্চেই তো?'

'আরে না। সুইটজারল্যাণ্ডে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো সম্পাদক। 'তাই? ও. কে। তোমার র‍্যাঞ্চে যদি কখনও ক্র্যাশ করে ওই জিনিস, আবার ফোন কোরো, প্লীজ।'

'শোনো, ছবি দেয়া যাবে। ওখানে এক ফটোগ্রাফারও ছিলো...' থেমে গেল মাইকেল কেন। ফোন রেখে দিয়েছে সম্পাদক।

ওই পর্যন্তই। এ নিয়ে আর চিন্তা করার সুযোগ হয়নি তার। ব্যাঙ্ক আর উকিলের অফিসে ছোটাছুটি করতে গিয়ে জান পেরেশান। হঠাৎ গাড়ির শব্দে সচকিত হলো মাইকেল কেন। কে এলো আবার! পাওনাদার নয়তো? সোফা ছাড়লো সে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা ট্যাক্সি। অপরিচিত, লম্বা একহারা এক লোক নামলো। দৃঢ়, মাপা পায়ে এগিয়ে আসছে এদিকে।

লোকটির চমৎকার ছাঁটের কমপ্লিট স্যুট আর হাঁটার ভঙ্গিটা দেখার মতো, ভাবলো মাইকেল কেন। কে লোকটা? তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোলো। ডোরবেল টেপার জন্যে হাত তুলেছিলো আগন্তুক, তার আগেই দরজা খুলে দিলো সে। হাসিমুখে বললো, 'হাউডি?'

'মিস্টার মাইকেল কেন?' পাল্টা হাসলো মাসুদ রানা। নামিয়ে নিলো হাত।

বাহ্! গলাটাও তো দারুণ! 'রাইট। বন্ধুরা অবশ্য মাইক বলে ডাকে। তা কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'কয়েক মিনিট সময় নষ্ট করবো আপনার।'

'কোনো অসুবিধে নেই। ইন ফ্যাক্ট, সব গেছে আমার, শুধু সময় বাদে। অঢেল সময় হাতে। কিন্তু...আপনি...পাওনাদার নন তো?'

'পাওনাদার?' ভুরু কোঁচকালো রানা। 'না।'

'বাঁচালেন। ভেতরে আসুন।'

লিভিং রুমে বসালো সে রানাকে। ওয়েস্টার্ন ধাঁচের দামী আসবাবে সাজানো প্রকাণ্ড রুমটা। 'বসুন। কি খাবেন, বলুন। কোল্ড ড্রিঙ্ক?'

'নো, থ্যাঙ্কস।'
'বেশ। তাহলে, কি জন্যে এসেছেন।'
'গত সপ্তায় সুইটজারল্যাণ্ড গিয়েছিলেন আপনি? সানশাইন ট্যুর কোম্পানির বাসে...'
'হ্যাঁ। কিন্তু কেন? আমার ওয়াইফ কি আপনাকে আমার পিছনে লাগিয়েছেন? আপনি প্রাইভেট গোয়েন্দা?'
'নো, স্যার।'
'ও।' হঠাৎ করেই রানার আগমনের কারণ বুঝে ফেললো ব্যাঙ্কার। 'বুঝতে পেরেছি। আপনি সেই ইউএফও সম্পর্কে জানতে এসেছেন, তাই না?'
'হ্যাঁ।'
'বলুন, কি জানতে চান?'
'বাসে আর যারা ছিলেন তাদের সম্পর্কে জানতে চাই। তাঁরা কে কোথাকার, তাদের নাম-ধাম...'
'সরি, তেমন কাউকে মনে করতে পারছি না। দাঁড়ান,' কি একটু ভাবলো মাইকেল কেন। '...একজনের কথা মনে পড়ছে। একজন প্রিস্ট, ইটালিয়ান। এঁর সঙ্গে কথা বলেছি আমি। ইউএফও ক্র্যাশ দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন তিনি...বারবার বুকে ক্রুশ আঁকছিলেন। আর, ডেভিল সম্পর্কে কি সব বলছিলেন বিড়বিড় করে।'
'আর কারও কথা মনে নেই?'
'আরেকজন,' জিভ বের করে নিচের ঠোঁটের এমাথা-ওমাথা চাটলো লোকটা, 'কানাডিয়ান ব্যাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো।'
'ব্যাঙ্কার?'
'হ্যাঁ। ব্যাঙ্কের নাম অবশ্য মনে নেই। নর্থওয়েস্ট টেরিটোরিজের ফোর্ট স্মিথের একটা ব্যাঙ্ক।'
'কি বিষয়ে আলাপ হয় আপনাদের?'
'এই লোন-টোনের ব্যাপারে। ব্যাঙ্ক নিয়ে এ মুহূর্তে বড় বিপদে আছি। ভদ্রলোক ব্যাঙ্কার শুনে ভাবলাম, হয়তো সাহায্য করতে পারবেন আমাকে। এই...আর কি!'
'ধন্যবাদ, মিস্টার মাইক,' উঠলো মাসুদ রানা। 'আর কিছু জানার নেই।'
বিস্মিত হলো ব্যাঙ্কার। 'ব্যস! এই-ই?'
'এই-ই।'
ঘড়ি দেখলো মাইকেল কেন। 'তা, ইয়ে, থেকে যান। সাপারটা সেরে যান গরীবখানায়।'
'মেনি থ্যাঙ্কস, মাইক। সময় পেলে আরেকদিন আসবো।'

'ইয়েস, মেজর?' জেনারেল হিলিংটনের গলা শোনা গেল।
'মাইকেল কেন। গুডিনার অড পনডেরোসা ব্যাঙ্ক। ওয়াকো।'
'ভেরি গুড। ডালাসের সাথে এখনই কথা বলছি আমি।'

*

সি আই এ কমপ্লেক্স। ল্যাংলি। ভার্জিনিয়া। সদ্য পাওয়া বার্তাটার দিকে চেয়ে আছেন ডেপুটি ডিরেক্টর, ম্যালকম হগ। নামের সাথে চমৎকার মিল ভদ্রলোকের চেহারায়–চর্বি সর্বস্ব বুনো শুয়োরের মতোই লাগে দেখতে। এ মুহূর্তে চিন্তিত। ছয় নম্বর, ভাবছেন তিনি, তার মানে ভালোই এগোচ্ছে কাজ। মাসুদ রানা লোকটার সত্যিই তুলনা নেই।

একে সিলেক্ট করে বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন কোবরা। আসলে এ পর্যন্ত তাঁর সব সিদ্ধান্তই ছিলো সঠিক, সব প্ল্যানিং-ই ছিলো নিখুঁত। যেমন লোকটার বুদ্ধি, তেমনি প্রভাব। কোবরা এতো বেশি প্রভাবশালী যে...নজর নামিয়ে বার্তাটার শেষের ফুটনোটটা পড়লেন হগ আরও একবার।

হুঁম! ভাবলেন, অ্যাক্সিডেন্টের মতো সাজাতে হবে মৃত্যুটা। কোনো সমস্যা হবে না। বাযার চাপলেন ডেপুটি ডিরেক্টর।

সন্ধের পর গাঢ় নীল রঙের ভ্যানে চড়ে মাইকেল কেনের বাসায় এলো দুই লোক। সামনের বড় কোর্টইয়ার্ডে গাড়ি পার্ক করে বেরিয়ে এলো তারা, সতর্ক নজর বোলালো চারদিকে। কারা এলো আবার? ভাবতে ভাবতে দরজা খুললো মাইকেল কেন।

'মাইকেল কেন?' প্রশ্ন করলো একজন।
'ইয়েস। কি করতে পারি...?' আর কিছু বলার সুযোগ হলো না।
ট্রাউজারের পকেটে ছিলো দ্বিতীয়জনের ডান হাত। চট করে নিজের ডানদিকে, ব্যাঙ্কারের বাঁ দিকে এক পা সরে এলো সে। বিদ্যুৎগতিতে রিভলভার বের করলো পকেট থেকে। ওটার বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলো সে কেনের কানের সামান্য ওপরে। হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছিলো ব্যাঙ্কার, তার আগেই প্রথমজন ধরে ফেললো তাকে। অনায়াসে কাঁধে তুলে নিলো অজ্ঞান দেহটা।

প্রায় অন্ধকার কোর্টইয়ার্ড পেরিয়ে দ্রুত আস্তাবলে এলো তারা। এক সারিতে আটটা স্টল। হাফ ডোরের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আটটা ঘোড়া। প্রথম সাতটার দিকে তাকালোও না লোকগুলো। সোজা এসে দাঁড়ালো আট নম্বরটার সামনে। প্রকাণ্ড এক স্ট্যালিয়ন এটা–কুচকুচে কালো। মাইকেল কেনের গর্ব।

অজ্ঞান দেহটা মাটিতে শুইয়ে দিলো প্রথমজন। 'এটাই,' সঙ্গীর উদ্দেশে বললো সে। দেয়ালে ঝোলানো ইলেকট্রিক হান্টারটা তুলে নিলো এবার দ্বিতীয়জন, ওটা দিয়ে ভীষণ জোরে মারলো ঘোড়াটার নাকের হাড়ে। আতঙ্কে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো স্ট্যালিয়ন, পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে গেল। পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু সব ছোটি বলে পারছে না, নিতম্ব ঠেকে গেছে পিছনের দেয়ালে।

আবারও মারলো লোকটা, একই জায়গায়। স্রেফ উন্মাদ হয়ে গেলো এবার বিশাল দানবটা। হিংস্র হয়ে উঠেছে। বেরিয়ে পড়েছে দাঁত, কালোর মধ্যে বিস্ফারিত চোখের সাদা অংশটুকু ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

'এইবার,' শান্ত গলায় বললো হান্টারধারী। অন্যজন কেনের দেহটা টানা হ্যাঁচড়া

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

করে কাঁধে তুলে নিলো, এগিয়ে গেল হাফ ডোরের আরও কাছে। এরপর দুজনে মিলে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে মারলো তাকে স্টলের ভেতরে।

নীরবে কয়েক মুহূর্ত উন্মত্ত স্ট্যালিয়নটার তাণ্ডব নৃত্য দেখলো লোক দুটো। তারপর সন্তুষ্ট মনে ফিরে চললো।

কৌতূহলটা হঠাৎ করেই পেয়ে বসলো মাসুদ রানাকে। আচ্ছা, জেনারেল হিলিংটন কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এদের ব্যাপারে? ভাবলো ও, কী বলে সতর্ক করা হচ্ছে লোকগুলোকে? কোনও হুমকি দেয়া হচ্ছে তাদের? কিসের? জেল-জরিমানা? না কি প্রাণনাশের?

খোঁজ নিতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিলো মাসুদ রানা। প্রথম সুযোগেই যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে হবে তাদের সাথে। সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে মেয়েটিকে নিয়ে পড়লো ও এবার। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। কেন এমন হচ্ছে, কে ওই মেয়ে, কিছুতেই মাথায় আসছে না ওর। এ নিয়ে যতো ভাবছে, ততোই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব।

আট

ফোর্ট স্মিথ। নর্থওয়েস্ট টেরিটোরিজ। কানাডা। ছিমছাম ছোট্ট শহর। সব মিলিয়ে হাজার দুয়েক মানুষের বাস এখানে। প্রধান জীবিকা কৃষি আর পশুপালন। প্রত্যেকেই মোটামুটি অবস্থাপন্ন। তবে আবহাওয়া এখানকার তেমন সুবিধের নয়। প্রায় আট মাসই প্রচণ্ড শীত থাকে ফোর্ট স্মিথে। গরম স্থায়ী হয় মাত্র দু'মাস। বাকি দু'মাসের এক মাস যায় শীতের বিদেয় আর গরমের আগমন ঘটতে ঘটতে, আরেক মাসও তেমনি; গরম শেষ হয়ে শীতের প্রস্তুতিতে। কঠোর পরিশ্রম করতে হয় সবাইকে এখানে।

জন রীডও তাদের মধ্যে একজন। ভদ্রলোকের জন্ম মিশিগানে। লেখাপড়াও ওখানেই শেষ করেন তিনি। বিষয় ছিলো ইকোনমিকস। প্রথম থেকেই মাথায় একটা প্রাইভেট ব্যাঙ্ক খোলার আইডিয়া ছিলো তাঁর। কিন্তু দেশে সে ঝুঁকি নিতে মন সায় দেয়নি। ওখানে প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক—টিকে থাকা মুশকিল হবে।

কোথায় শুরু করা যায় ব্যবসা, জায়গা খুঁজতে থাকেন জন রীড। ঘুরতে ঘুরতে ফোর্ট স্মিথকেই পছন্দ হয় তাঁর। মাত্র একটাই ব্যাঙ্ক ছিলো তখন এখানে। সুযোগটা লুফে নিলেন জন রীড। দু বছরও লাগলো না, প্রতিযোগীকে কোণঠাসা করে ফেললেন তিনি। হেরে গেল তারা জন রীডের কাছে, ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলো। ফাঁকা মাঠে একা জন রীড, কে পায় তাঁকে? মাত্র কয়েক বছরেই ফুলে ফেঁপে উঠলো ব্যবসা, আঙুল ফুলে কলাগাছ নয়, বটগাছ হয়ে উঠলেন তিনি।

জন রীডের প্রিয় কৌতুক হচ্ছে: একবার এক প্রতিবেশী এলো এক ব্যাঙ্কারের

কাছে। ছেলের প্রাণ রক্ষার্থে তার পেটে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন এখনই, সেজন্যে কিছু টাকা ঋণ চাই। তার কাছে লোনের সিকিউরিটি চাইলো ব্যাঙ্কার। লোকটি জানালো, সিকিউরিটি দেয়ার মতো কিছুই নেই তার। সোজা দরজা দেখিয়ে দিলো ব্যাঙ্কার, 'গেট আউট।'

'ঠিক আছে,' হতাশ কণ্ঠে বললো ঋণপ্রার্থী। 'যাচ্ছি। আমারই ভুল, আপনার মতো হৃদয়হীনের কাছে আসা উচিত হয়নি।'

পিছন থেকে ডাকলো তাকে ব্যাঙ্কার। 'দাঁড়ান। একটা বাজি হয়ে যাক। আমার একটা চোখ কাঁচের। যদি বলতে পারেন, কোনটা, তাহলে টাকা পাবেন।'

'বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই বললো লোকটি, 'বাঁ চোখটা।'

তাজ্জব হয়ে গেল ব্যাঙ্কার। 'আশ্চর্য! কেউ জানে না, আপনি জানলেন কি করে?'

'খুব সহজ। আপনার ওই চোখটায় মুহূর্তের জন্যে সমবেদনার ছাপ ফুটতে দেখেছি আমি। তখনই বুঝেছি ওটা কিছুতেই চামড়ার চোখ হতে পারে না।'

জন রীডের খুব প্রিয় জোক এটা। তাঁর জানা আছে, যার ভেতর সহানুভূতি নামের অপদার্থের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট রয়েছে, তাকে দিয়ে ব্যবসা হয় না। এবং থিওরিটা জানা আছে বলেই আমেরিকা আর কানাডার প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে তাঁরটাই সেরা ব্যাঙ্ক। সোজা দর্শন জন রীডের: ব্যবসা শুরু করার প্রারম্ভিক পুঁজি যোগানোর জন্যে কাউকে এক আধলাও ধার দেয়া যাবে না, কোনো জাহাজ ব্যবসায়ে টাকা খাটানো চলবে না, এবং প্রতিবেশীর মরণাপন্ন ছেলের অপারেশনের জন্যে কর্জ দেয়া চলবে না।

সুইস ব্যাঙ্কিং সিস্টেমকে চিরদিনই অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন জন রীড। ওদের সাথে কোনো তুলনাই চলে না, ভাবেন তিনি। জুরিখের ওরা হচ্ছে যাকে বলে ব্যাঙ্কারদের ব্যাঙ্কার। এদের দুয়েকটি ব্যাঙ্কের সাথে আলোচনা করার জন্যেই আসলে ওদেশে যাওয়া তাঁর। ভেবেছিলেন ওদের পুরো সিস্টেম সম্পর্কে জানা গেলে হয়তো উপকার হবে। ধরতে পারবেন, তাঁর সাথে ওদের কোথায় কি পার্থক্য আছে। ওদের কোনটা নিলে লাভ আরও খানিকটা বাড়ানো যেতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ধরতে গেলে সফরটা ব্যর্থই হয়েছে জন রীডের। নতুন কিছুই শেখাতে পারেনি তাঁকে সুইস ব্যাঙ্কাররা। বরং তাঁর ব্যাঙ্কিং মেথডই ওদের চাইতেও অনেক উন্নত এবং আধুনিক বলে রায় দিয়েছে সুইসরা বিনা দ্বিধায়। হৃষ্টচিত্তে দেশে ফেরার উদ্যোগ নিলেন তিনি। এই সময় সখ চাপলো বিশ্বখ্যাত সুইস আলপস্ দেখার।

কিন্তু বাস ট্যুর মোটেই ভালো লাগছিলো না জন রীডের। চারদিকের দৃশ্য মনোরম ছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু ফোর্ট স্মিথের চাইতে বেশি সুন্দর মনে হয়নি তাঁর। বিরক্ত মুখে একটা বইয়ে মন দেবার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় আলাপ জমাতে আসে এক টেক্সান, ব্যাঙ্কার। কিন্তু তার আলাপের উদ্দেশ্য টের পেতে দেরি হয়নি অভিজ্ঞ ব্যাঙ্কারের, সরাসরি নাকচ করে দেন তিনি লোকটির প্রার্থনা। একটি রূপসী মেয়ের সাথেও আলাপ হয় তাঁর।

এরপরই ঘটে অদ্ভুত সেই ক্র্যাশের ঘটনা, যাকে সবাই বলে ফ্লাইং সসার,

তথাকথিত। এসব কাল্পনিক ব্যাপার-স্যাপার মোটেই বিশ্বাস করেন না জন রীড। ট্যুরিস্টদের প্রভাবিত করার জন্যে সুইস সরকারই যে এ নাটক উপস্থাপন করেছে কায়দা করে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই তাঁর। এর আগে ডিজনী ওয়ার্ল্ড দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, সেখানেও এ ধরনের শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য দেখেছেন তিনি। মনে হয় যেন সত্যি। অথচ মিথ্যে, সাজানো।

মহিলা সেক্রেটারি ঘরে ঢুকতে চোখ তুললেন জন রীড। এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন তাঁর সাথে। 'কি চান তিনি?' প্রশ্ন করলেন রীড।

'উনি রিপোর্টার, স্যার। আপনার ইন্টারভিউ নিতে এসেছেন। আপনাকে নিয়ে বিশেষ এক আর্টিকেল লিখছেন।'

গুড, মনে মনে ভাবলেন রীড। সোজা হয়ে বসলেন। চুলগুলো ব্রাশ করে নিলেন তাড়াতাড়ি। 'পাঠিয়ে দাও ভদ্রলোককে।'

কয়েক মুহূর্ত পরই ভেতরে ঢুকলো মাসুদ রানা। ওর পোশাক-আশাক দেখে সন্দেহ রইলো না জন রীডের যে কোনো নামী পত্রিকা থেকেই এসেছে লোকটি।

'মিস্টার রীড?'

'ইয়েস।'

'হ্যারি ওয়াটসন।'

'আমার সেক্রেটারির কাছে শুনলাম আমাকে নিয়ে কি আর্টিকেল লিখতে চাইছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'কোন পত্রিকায় আছেন আপনি, মিস্টার ওয়াটসন?'

'ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল।'

চমৎকার! পুলকিত হলেন জন রীড। ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের মতো পত্রিকায় সাক্ষাৎকার ছাপা হওয়া তো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

'আমাদের ধারণা, প্রাইভেট ব্যাঙ্কাররা বহির্বিশ্ব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। পৃথিবীর অর্থনৈতিক হালচাল নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না, শুধু নিজের ব্যাঙ্ক নিয়েই ব্যস্ত,' আলোচনা শুরু করলো মাসুদ রানা।

'আপনার অভিযোগটা পুরোপুরি ঠিক নয়, মিস্টার ওয়াটসন। আমি আমার কথা বলছি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সব সময়ই নিজেকে জড়িত রাখার চেষ্টা করি আমি। অন্যান্য ব্যাঙ্কারদের কাজকর্মের ওপর সতর্ক নজর রাখি। এই তো, মাত্র গত সপ্তাহেই সুইটজারল্যাণ্ড ঘুরে এলাম। ওদেশের ব্যাঙ্কিং সিস্টেম নিয়ে ডিসকাস করে এলাম।'

'তাই? কেমন অভিজ্ঞতা হলো?'

'মোটামুটি ভালোই।'

'কোনো সাইট সিয়িং...?'

'আলপস দেখতে গিয়েছিলাম। আগে কখনও দেখিনি।'

জন রীডের উত্তরগুলো একটা নোট বইয়ে টুকে নিলো মাসুদ রানা। 'হুম! এ ধরনের প্লেযার ট্রিপ কাজের স্পিরিট বাড়ায়। ঠিক না?'

'একদম ঠিক। আলপস দেখাও হলো, সেই সাথে বাসের সহযাত্রীদের কারো কারো সাথে আলাপ আলোচনাও হয়েছে। ওদের মধ্যে ছিলো একটি রাশান মেয়ে। চমৎকার লেগেছে ওকে আমার। বুদ্ধিমতি।'

'আচ্ছা! গর্বাচভের গ্লাসনস্ত বেশ সুবিধে করে দিয়েছে ওদের তাহলে?'

'শিওর! আগে কখনও ওরা দেশের বাইরে ট্যুর করার কথা কল্পনাও করতে পারতো না। অথচ এখন পারছে। শুধু পারছে নয়, আসছেও। দলে দলে বাইরের পৃথিবী দেখতে আসছে রাশানরা। তবে একটা ব্যাপার, মিস্টার ওয়াটসন,' তর্জনী তুললেন ব্যাঙ্কার শাসানোর ভঙ্গিতে। 'পলিটিক্যাল ফিল্ডে গর্বাচভ যতো ফাস্ট মুভ করেছেন, অর্থনৈতিক ফিল্ডে তাঁর মুভমেন্ট কিন্তু ততোই স্লো। মেয়েটিকে বলেছি আমি, দেশে ফিরে পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখি করতে, সমাজ পাল্টানোর পদক্ষেপ নেয়ার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে।'

'আচ্ছা!' মুগ্ধ হওয়ার ভান করলো মাসুদ রানা। 'কে এই মেয়ে? ছাত্রী, না কি...?'

'না না, চাকরি করে। কিয়েভ মেইন ব্রাঞ্চ লাইব্রেরিতে আছে। ওলগা কি যেন নাম। ওর কথাবার্তা খুব ভালো লেগেছে আমার।'

আরও আধঘণ্টার মতো বসলো ওখানে মাসুদ রানা। ক্লাইং সসারসহ এটা সেটা নিয়ে আলোচনা করলো জন রীডের সঙ্গে।

ওয়াশিংটনে ফোন করলো রানা। লাইন পেয়ে গেল সাথে সাথেই। 'বলুন, মেজর?'

'আরেকজনকে পাওয়া গেছে, জেনারেল।'

'কি নাম?'

'জন রীড। ফোর্ট স্মিথ, কানাডার এক ব্যাঙ্কার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'এঁর কাছে আরেকজনের নাম-ঠিকানাও পেয়েছি। তাকে ট্রেস করতে রাশিয়া যেতে হচ্ছে আমাকে আজই।'

'ভিসা লাগবে, এই তো?' প্রশ্ন করলেন জেনারেল হিলিংটন।

'হ্যাঁ। ইনট্যুরিস্ট ভিসা।'

'এখন কোথায় আছেন আপনি?'

'ফোর্ট স্মিথ।'

'ওয়েল। স্টকহোম চলে যান, ভিসিগথ হোটেলে উঠবেন। আপনার জন্যে একটা এনভেলপ থাকবে ডেস্কে। অল রাইট?'

'অল রাইট। থ্যাঙ্কস।'

ফ্ল্যাশ মেসেজ
নোভা রেড আলট্রা
এনএসএ টু ডেপুটি ডিরেক্টর সিজিএইচকিউ
সাবজেক্টঃ অপারেশন ডুমসডে
সেভেন, জন রীড—ফোর্ট স্মিথ
এণ্ড অভ মেসেজ

*

রাত এগারোটা। ঘুমুতে যাবেন বলে স্টাডি ছেড়ে বেরিয়েছেন জন রীড, এই সময় ডোরবেল বেজে উঠলো। এ সময় ডোরবেল বেজে ওঠা একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাঁর বাড়িতে। হাউসকীপারও নেই যে দরজা খুলে দেখবে, কে এলো। ডিনারের পরই ছুটি হয়ে যায় তার, বাসায় চলে যায়। ওদিকে স্ত্রীও ঘুমিয়ে পড়েছেন, দোতলায়। ছেলেমেয়েরাও। অতএব তাঁকেই এগোতে হলো।

দোরগোড়ায় দুজন সুবেশধারী আগন্তুককে দেখে অবাক হলেন জন রীড। খানিকটা কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'ইয়েস? হোয়াট...?'

'জন রীড?' জিজ্ঞেস করলো একজন।

'হুঁম্।' মহাখাপ্পা হয়ে উঠলেন ব্যাঙ্কার অসৌজন্যমূলক আচরণে। 'মিস্টার' অথবা 'স্যার' ছাড়া শুধু নামটা অন্যের মুখে শুনতে অভ্যস্ত নন তিনি।

পকেট থেকে একটা আইডি কার্ড বের করলো লোকটি। 'ব্যাঙ্ক অভ কানাডা থেকে এসেছি আমরা। ভেতরে আসতে পারি?'

বিস্মিত হলেন জন রীড, ব্যাঙ্ক অভ কানাডা! 'ব্যাপার কি, এতো রাতে?'

'এখনই জানতে পারবেন,' বললো অন্যজন। 'বলবো বলেই তো এসেছি।'

'অল রাইট।' দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন জন রীড। 'কামন ইন।' লিভিং রুমে এনে বসালেন তাদের। 'বলুন এবার।'

'ক'দিন আগে সুইটজারল্যাণ্ড গিয়েছিলেন আপনি, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তা দিয়ে কি দরকার আপনাদের?' বিরক্ত হলেন রীড।

'ওই সময়ে আপনার ব্যাঙ্ক অডিট করেছি আমরা। আপনি কি জানেন, পুরো এক মিলিয়ন ডলারের শর্টেজ আছে আপনার অ্যাকাউন্টে?'

থতমত খেয়ে গেলেন ব্যাঙ্কার। 'কী যা তা বলছেন! প্রত্যেক সপ্তায় আমি নিজে চেক করি সমস্ত খাতা, অ্যাকাউন্টস। এক পেনিও কম থাকতে পারে না,' শেষেরটুকু খুব জোর দিয়ে বললেন তিনি।

'এক মিলিয়ন ডলার, মিস্টার রীড,' একঘেয়ে সুরে বললো প্রথমজন। 'এবং এই তসরুফের জন্যে আপনিই দায়ী বলে আমাদের ধারণা।'

পলকে মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠলো জন রীডের। প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন তিনি। 'এত্তোবড় সাহস! বেরোও এখান থেকে, নইলে পুলিস ডাকবো আমি।'

'কাজটা ঠিক হবে না,' এপাশ ওপাশ মাথা দোলালো লোকটা। 'যদি আমরা বুঝি যে আপনার মধ্যে অনুশোচনা...'

'অনুশোচনা? কিসের অনুশোচনা?' খেঁকিয়ে উঠলেন জন রীড। তড়াক্ করে সোফা ছাড়লেন। হাত তুলে দরজা দেখিয়ে চাপা গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন, 'গেট আউট! অ্যাট ওয়ান্স।'

হাসিমুখে পকেট থেকে একটা বেরেটা অটোমেটিক বের করলো দ্বিতীয়জন। 'বসুন, মিস্টার রীড।' অস্ত্রটা ঝাঁকালো সে।

জিনিসটা দেখামাত্র আতঙ্কে উঠলেন ব্যাঙ্কার। ও মাই গড্, ভাবলেন তিনি, ডাকাতি করতে এসেছে এরা? ভয়ে কেঁপে গেল গলা। 'দেখুন, যা ইচ্ছে নিয়ে যান

আপনারা। আমি বাধা দেবো না। আমার ঘরে...'

'সীট ডাউন, প্লীজ।'

লোকটার সাপের মতো ঠাণ্ডা চোখের দিকে চেয়ে থাকলেন রীড কয়েক সেকেণ্ড। বসে পড়লেন কাঁপতে কাঁপতে। ধীরেসুস্থে আসন ছাড়লো এবার অন্যজন। দাঁড়ালো গিয়ে এক কোণের বড়, সুদৃশ্য লিকার কেবিনেটের সামনে। ওটার কাঁচের স্লাইডিং ডোর ধরে টান দিলো লোকটা। খুললো না। তালা মারা। বুটের শক্ত এক লাথিতে পুরু কাঁচ চুরমার করে দিলো সে। তারপর বড় একটা পানির গ্লাস ভর্তি করে স্কচ হুইস্কি ঢেলে নিয়ে ফিরে এলো।

'নিন,' জন রীডের মুখের সামনে গ্লাসটা ধরলো সে। 'খেয়ে ফেলুন। ভালো লাগবে।'

'ডিনারের পর ড্রিঙ্ক করি না আমি। ডাক্তারের...'

কানের ওপর বেরেটা চেপে ধরলো দ্বিতীয়জন। 'অতো কথা শুনতে চাই না। ড্রিঙ্ক!'

বুঝতে বাকি রইলো না জন রীডের, দুই বদ্ধ পাগলের পাল্লায় পড়েছেন আজ তিনি। নিস্তার নেই সহজে। কাঁপা হাতে গ্লাসটা নিলেন তিনি।

'গুড। খেয়ে ফেলুন ঢক্ ঢক্ করে।'

বড় এক ঢোক হুইস্কি গিললেন ব্যাঙ্কার। 'আসলে কি চান আপনারা?' গলা চড়িয়ে বললেন, আশা, যদি বাই চান্স ঘুম ভাঙে স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে কারও। 'যা খুশি নিয়ে যান না। বললাম তো বাধা দেবো না আমি।'

'কথা পরে। আগে হাতের কাজ শেষ করুন।'

'কি দরকার এসবের? আমি...'

দড়াম করে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলো অস্ত্রধারী রীডের বাঁ কানের ওপর। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন তিনি, চট্ করে তার মুখের ভেতর বেরেটার নল পুরে দিলো এবার সে। 'শেষ করুন।'

এক ঢোকে বাকি পানীয়টুকু শেষ করলেন জন রীড। হাত পা কাঁপছে আতঙ্কে। গলা দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে নেমে গেল হুইস্কি। কয়েক মুহূর্ত থম্ মেরে বসে থাকলেন তিনি। শূন্য হয়ে গেছে যেন মাথার ভেতরটা—সবকিছু ফাঁকা লাগছে। জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, 'টাকা-পয়সা সব দোতলায় আছে। চলুন, লক্ আমিই খুলে দিচ্ছি।'

'আমাদের কোনো তাড়া নেই, মিস্টার রীড,' অমায়িক গলায় বললো অস্ত্রধারী। 'আগে আরও এক গ্লাস হুইস্কি শেষ করুন।'

আবার গ্লাসটা ভরে আনলো প্রথমজন। 'নিন।'

নিস্তেজ কণ্ঠে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। 'না না, আর পারছি না। সত্যি।'

'শাট আপ! ড্রিঙ্ক ইট ডাউন!'

'সত্যিই আর...'

আরেকটা জোরালো ঘুসি পড়লো একই জায়গায়। প্রচণ্ড ব্যথায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো ব্যাঙ্কারের। 'ড্রিঙ্ক ইট!'

amsimon@yahoo.com www.murchona.com

ঠিক আছে, অসচেতন অবস্থায় ভাবলেন তিনি, এটাই যদি ওদের কাম্য হয়ে থাকে, তো তাড়াতাড়ি করাই ভালো। কিন্তু অর্ধেকটা পান করে থেমে গেলেন ভদ্রলোক। আর কিছুতেই নামছে না গলা দিয়ে। করুণ গলায় বললেন, 'আর খেলে বমি করে ফেলবো আমি।'

'বমি করেই দেখো না। এক গুলিতে যমের বাড়ি পাঠাবো তোমাকে।'

অনেকটা জোর করেই মাথা তুললেন জন রীড। চোখ মেলে তাকালেন প্রথমে অস্ত্রধারী, পরে তার সঙ্গীর দিকে। মনে হচ্ছে দু'জন দু'জন চারজন ওরা। পরমুহূর্তেই আটজন হয়ে গেল। 'কেন এভাবে আমার পিছনে লেগেছেন?' প্রায় কেঁদে ফেললেন ব্যাঙ্কার। 'কি ক্ষতি করেছি আমি আপনাদের?'

'আমরা চাই, তহবিল তসরুফের জন্যে অনুশোচনা জাগুক আপনার মনে।'

পুরোপুরি মাতাল হয়ে গেছেন ততোক্ষণে জন রীড। 'ঠিক আছে,' মাথা দোলালেন তিনি। 'কিভাবে প্রকাশ করবো অনুশোচনা?'

হাসলো অস্ত্রধারী। 'এই তো কাজের কথা।' পকেট থেকে একটা সাদা কাগজ আর একটা কলম বের করলো সে। 'এটায় লিখতে হবে, "আমি দুঃখিত। ক্ষমা করো আমাকে"।'

'শুধু এটুকুই?'

'হ্যাঁ। লিখে দিন। আমরা চলে যাই।'

'ঠিক আছে।' কলমটা বাঁ হাতে নিলেন জন রীড। কিন্তু আঙুলে জোর পাচ্ছেন না একেবারেই। ওটা ধরে রাখা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। কাগজটা টেবিলে রেখে ঝুঁকে বসলেন। দেখতেও পাচ্ছেন না পরিষ্কার। 'কি যেন লিখতে হবে বললেন?'

'শুধু একটা লাইন, "আমি দুঃখিত। ক্ষমা করো আমাকে"।'

'ঠিক।' বহু কষ্টে শব্দ ক'টা লিখলেন তিনি প্রচুর সময় নিয়ে, থেমে থেমে।

'দেখলেন, কতো সহজে মিটে গেল ঝামেলা?' বলে কলমটা পকেটে পুরলো অস্ত্রধারী। চোখ বোলালো লেখাটার ওপর।

'হ্যাঁ, খু-উ-ব সহজে।' চোখের সামনে ঘরদোর সব ঘুরতে আরম্ভ করেছে জন রীডের। 'এবার দয়া করে আসুন আপনারা।'

'আপনি বাঁ-হাতি, মিস্টার রীড?'

'কি বললেন?'

'আপনি বাঁ-হাতি।'

'ও…হ্যাঁ। কেন?'

'এই জায়গাটা ভালো নয়, বুঝলেন? প্রায়ই ডাকাতি-রাহাজানি হয়। আপনি একজন ব্যাঙ্কার, সবসময় নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে আপনার। না কি বলেন?'

'হ্যাঁ। তা ঠিক।'

'ঠিক আছে। এটা আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি আমি।' বেরেটা অটোমেটিকটা দোলালো সে। আলতো করে ধরিয়ে দিলো জন রীডের শিথিল বাঁ হাতে। 'এ জিনিস ব্যবহার করতে জানেন তো?'

'না। জানি না।'

'খুব সহজ। এই যে, তর্জনী রাখুন এই ট্রিগারের ওপর,' ব্যাঙ্কারের আঙুলটা জায়গামতো বসিয়ে নিজের তর্জনী তার ওপর রাখলো লোকটা। তারপর অন্যহাতে তাঁর হাতটা ঠেলে ওপরে তুললো। বেরেটার নল জন রীডের কপালের পাশে ঠেকিয়েই তার তর্জনী চেপে ধরলো ট্রিগারে। 'দপ' করে চাপা একটা আওয়াজ বেরোলো। ব্যাঙ্কারের রক্ত আর ঘিলুতে স্বীকারোক্তি লেখা কাগজটা মাখামাখি হয়ে গেল। গড়িয়ে সোফার ওপর কাৎ হয়ে পড়ে গেল জন রীডের প্রাণহীন দেহ।

পরদিন সকালে জন রীডের মৃতদেহ আর নোটটা পাওয়ার পর ব্যাঙ্কের হিসেব আর অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করা হলো। দেখা গেল, এক মিলিয়ন ডলারের ঘাটতি রয়েছে ভল্টে। জন রীড আত্মহত্যা করেছেন, ধরে নিলো পুলিস।

টাকাটার কোনো হদিশই পাওয়া গেল না।

ব্রাসেলস। ভোর রাতে অ্যাডজুটেন্টের ডাকে ঘুম ভাঙলো ন্যাটো সদর দফতরের কমাণ্ডান্ট, জেনারেল লী বাটলারের। 'আমি দুঃখিত, জেনারেল,' বললো অ্যাডজুটেন্ট। 'আমার মনে হয়, আপনার একবার রাডার রুমে আসা প্রয়োজন, স্যার।'

বিছানায় উঠে বসলেন কমাণ্ড্যান্ট। দু'চোখ কচলে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমেরিকার এক দল ভিজিটিং সিনেটরকে আপ্যায়ন করতে গিয়ে দেরি হয়ে গিয়েছিলো শুতে। বড়জোর দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন তিনি। 'সমস্যাটা কি?'

'রাডার টাওয়ার এইমাত্র ফোন করেছিলো, স্যার। ওরা বলছে, হয় আমাদের সবগুলো ইকুইপমেন্টে গোলযোগ দেখা দিয়েছে, নয়তো আমাদের আশেপাশে কোনো অনাহূত অতিথির আনাগোণা চলছে।'

'বলো কি!' তড়াক করে বিছানা ছাড়লেন জেনারেল। 'তুমি যাও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

কোনোরকমে ড্রেস-আপ করলেন তিনি, তারপর বিশাল দেহ নিয়ে ছুটলেন টাওয়ারের উদ্দেশে। মেইন রাডার রুমটা বিশাল। ভেতরে অন্ধকার। শুধু রাডারের আবছা সবুজ আলোয় আলোকিত। সদর দফতরের এনলিস্টেড অফিসাররা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ওটাকে। পায়ের শব্দে ঘুরে তাকালো সবাই। জেনারেলকে দেখামাত্র স্প্রিঙের মতো অ্যাটেনশন হয়ে গেল।

'ইজি,' বললেন জেনারেল বাটলার। অফিসার ইন চার্জ, ক্যাপ্টেন ডেনিস মুরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ধ্যানরত তাপসের মতো রাডারের স্ক্রীনের দিকে চেয়ে আছে ক্যাপ্টেন।

'ব্যাপার কি, মুর?'

আঙুলের গাঁট দিয়ে নিজের মাথায় সশব্দে আঘাত করলো ক্যাপ্টেন। 'বুঝতে পারছি না, স্যার, কি বলবো। জেনারেল, আপনার জানা আছে, কোনো প্লেন ঘণ্টায় বাইশ হাজার মাইল স্পীডে ছুটতে পারে? ওই গতিতে চলতে চলতে হঠাৎ জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়তে পারে, সাথে সাথে আবার রিভার্স করতেও পারে?'

ডেনিসের মুখের দিকে চেয়ে আছেন জেনারেল। বিরক্তি ফুটে উঠলো

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

চেহারায়। 'কি যা তা বলছো!'

'যা তা নয়, জেনারেল, যা তা নয়। গত আধ ঘণ্টা ধরে রাডারে তা-ই দেখছি আমরা। প্রথমে মনে করেছিলাম ধারেকাছে কোথাও হয়তো কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস পরীক্ষা করা হচ্ছে। সত্যি কি না জানার জন্যে রাশিয়া ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের সাথে যোগাযোগ করেছি আমি। ওরা কেউ কিছু জানে না। ওরাও আমাদের মতো একই রিডিং পিক করছে স্ক্রীনে।'

'তাহলে তো ভুল হওয়ার কথা নয়,' অন্যমনস্কের মতো মাথা দোলালেন জেনারেল বাটলার। 'ইকুইপমেন্টেও কোনো ত্রুটি থাকতে পারে না।'

'ঠিক, স্যার। তাহলে বুঝতে হবে পৃথিবীর সব রাডার একসাথে উন্মাদ হয়ে গেছে।'

'ওগুলোর সংখ্যা কতো?'

'এক ডজনেরও বেশি, স্যার। এতো ফাস্ট মুভ করছে যে কিছুতেই ট্র্যাক ধরতে পারছি না। চোখের পলক ফেলার আগেই গায়েব হয়ে যাচ্ছে। কয়েকবার বেসের কিছু ফাইটার পাঠিয়ে খোঁজ নেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু এতো উঁচু দিয়ে উড়ছে যে আমাদের প্লেনগুলোর কাছেপিঠে পৌঁছারও ক্ষমতা নেই।'

পায়ে পায়ে রাডারের সামনে এসে দাঁড়ালেন কমাণ্ডান্ট। ঝুঁকে চোখ রাখলেন স্ক্রীনে। 'এ মুহূর্তে জিনিসগুলো আছে পর্দায়?'

'না, জেনারেল, চলে গেছে।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আবার বললো ডেনিস মুর, 'কিন্তু, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, স্যার, আবার আসবে ওরা।'

অটোয়া। কানাডা। জেনারেল লী বাটলারের রিপোর্টটা কমিটিকে পড়ে শোনালো কোব্রা। সে থামতেই প্রচণ্ড হট্টগোল শুরু হয়ে গেল সদস্যদের মধ্যে। সবাই একযোগে বলতে চায়। হাত তুলে বহুকষ্টে তাদের থামালো কোব্রা। 'আপনারা একজন একজন করে বলুন, প্লীজ!' আবেদন জানালো সে।

'যে-কোন মুহূর্তে আমাদের ওপর হামলা চালাবে ওরা,' আতঙ্কে গলা চড়ে গেছে ইটালিয়ান প্রতিনিধির। 'কি করে ঠেকাবো আমরা ওদের?'

'দেরি করে ফেলেছি বোধহয় আমরা,' বললো রাশান। 'মহা সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে···ভয়ঙ্কর অবস্থা···'

বাধা দিলো কোব্রা। 'অবস্থা ভয়ঙ্কর, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরাও ওদের সামাল দিতে প্রস্তুত।'

'কিন্তু ওদের দাবি···' বাধা পেয়ে থেমে গেল ব্রিটিশ প্রতিনিধি।

খেঁকিয়ে উঠলো ব্রাজিলিয়ান। 'ওদের দাবি মানার প্রশ্নই আসে না। আমরা আমাদের গাছ নিয়ে কি করবো না করবো সে আমাদের ব্যাপার। ওদের তাতে কি? তথাকথিত গ্রীন হাউস এফেক্ট একটা বাজে, খোঁড়া অজুহাত। প্রমাণিত সত্য নয়।'

'তাছাড়া বাতাস দূষণমুক্ত রাখার জন্যে যদি সব কারখানা বন্ধ করে দিতে হয়, কি অবস্থা হবে আমাদের?' প্রশ্ন করলো জার্মান। 'সভ্যতা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?'

রাশান কথা বলে উঠলো আবার। 'ওদের দাবি মেনে নেয়া মানে, নিজেদের গড়া পৃথিবী নিজ হাতে ধ্বংস করে ফেলা। হাউ অ্যাবসার্ড!'

'এস ডি আই চালু হতে আর কতো দেরি?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো লাজুক চেহারার জাপানী।

সবাইকে শান্ত করতে এক ঘণ্টার মতো লাগলো কোব্রার। এরপর বৈঠক শেষ হলো। কথা থাকলো আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আবার মিলিত হবে তারা।

নয়

কিয়েভ। শহর কেন্দ্রের লেনকমসোমল স্কয়ারে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের তৈরি বিশাল এক ভবন–কিয়েভ মেইন ব্রাঞ্চ লাইব্রেরি। ওলগা রেভজোভনায়া গত সাত বছর ধরে এর লাইব্রেরিয়ান। বয়স ত্রিশ, অবিবাহিতা। চমৎকার চেহারা। চোখের রঙ হালকা নীল। হাসলে আরও সুন্দর লাগে মেয়েটিকে। এই বয়সেই দু' দু'বার বিচ্ছেদ সইতে হয়েছে ওলগাকে। দু'জনকে ভালোবেসেছিলো, কিন্তু ধরে রাখতে পারেনি কাউকে। ছেড়ে গেছে তারা ওকে।

প্রথমজন আন্দ্রেই ঝুকভ, অন্যজন ভলাদিমির সেরভ। দু'জনেই কিয়েভের ছেলে, অথচ এখানে চাকরি জোটাতে পারেনি। পেটের দায়ে জন্মস্থান ছেড়ে লেনিনগ্রাড চলে যেতে হয়েছে ঝুকভকে। আর সেরভ গেছে মস্কো। এর বিচ্ছেদ খুবই কষ্ট দিয়েছিলো ওলগাকে, সব ছেড়ে-ছুঁড়ে মস্কো চলে যেতে চেয়েছিলো সে সেরভের সঙ্গে।

কিন্তু পারেনি। পেটের দাবির কাছে হার মানতে বাধ্য হয় প্রেম। এরকম একটা চাকরি ছেড়ে দিলে এদেশে আবারও যে চাকরি জুটবে, এক জনমে তা আশা করা চূড়ান্ত বোকামি। তাই চোখের জলে বিদেয় দিয়েছে ওলগা প্রেমিককে। এরপর আর ও পথ মাড়ায়নি মেয়েটি, বিয়ের চিন্তাও ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু মন মানে না, মাঝেমধ্যে হাঁপিয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় দূরে কোথাও চলে যায়।

এই দূরে কোথাও যাওয়ার চিন্তা থেকেই সুইটজারল্যাণ্ড সফরের আইডিয়া জন্মায় ওলগা রেভজোভনায়ার মাথায়। একত্রিশতম জন্ম-বার্ষিকীর আর মাত্র ক'দিন বাকি, এই সুযোগে ছুটি নিয়ে বেড়িয়ে আসা যাক, ঠিক করলো সে। পেরেস্ত্রোইকা আর গ্লাসনস্ত, দুইয়েরই মুমূর্ষু অবস্থা এখন, চেষ্টা করলে এখনও হয়তো লৌহ যবনিকার ওপাশের মুক্ত বিশ্বটাকে একপলক দেখে আসা সম্ভব। এ সুযোগ পরে আর পাওয়া যাবে না, নিশ্চিত সে।

পেরেস্ত্রোইকার বোলচাল প্রথম থেকেই খুব একটা সুবিধের মনে হয়নি ওলগার। শুধু সে কেন, দেশের বেশিরভাগ মানুষই সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে ক্রেমলিনের এইসব 'বাগাড়ম্বর'। কি চমৎকার সব প্রতিশ্রুতি–এখন থেকে সরকার নিয়ন্ত্রিত সব দোকানে তাজা মাংস, শাক-সবজি পাওয়া যাবে হরদম, এবং সবার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই থাকবে তা। হালফ্যাশানের সুন্দর সুন্দর ড্রেস আরও সহজলভ্য হবে, সেই সাথে পাওয়া যাবে সত্যিকার চামড়ার জুতো এবং অন্য হাজারো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। কিন্তু যেমন আশঙ্কা করা হয়েছিলো, দু'টি বছর

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

ঘুরতে না ঘুরতে তা-ই হলো। আগে যে-সব জিনিসপত্র পাওয়া যেতো খোলাবাজারে, আজকাল সে-সবও কালো-বাজার থেকে কিনতে হয়। সরকারী দোকানগুলোয় মাছিও বসে না। জীবন ধারণের একমাত্র ভরসা কালো-বাজার। দাম অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সীমা ছাড়িয়ে গেছে ক্রাইম, আরও কড়াকড়ি হয়েছে সরকারী বিধিনিষেধ।

ওলগা রেভজোভনায়ার মন বলছে, খুব বড় ধরনের একটা পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে এদেশে। কিন্তু তার ফলাফল কি হবে অনুমান করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে সে। তবে দিন যে খারাপ ছাড়া ভালো হবে না, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই তার। অতএব, প্রথম এবং শেষ বারের মতো বাইরের পৃথিবীটা ঘুরে আসার এই-ই সুযোগ।

'কোথায় যেতে চাও?' ওলগার মৌখিক আবেদনের জবাবে প্রশ্ন করলেন প্রধান লাইব্রেরিয়ান।

'সুইটজারল্যাণ্ড।'

'কবে?'

'আগামী শুক্রবার।'

'এনজয় ইওরসেলফ।'

ব্যাস, দু'কথায় মিটে গেল। অথচ কয়েক বছর আগে এ ভাবাই যেতো না। তখন ছুটিতে যাওয়া বলতে বোঝাতো ব্ল্যাক-সী, অথবা সমরখন্দ বা তবিলিসি বা দেশের ভেতরেরই আর কোথাও থেকে ঘুরে আসা। বিদেশ? অসম্ভব! প্রশ্নই আসে না।

আসলে সুইটজারল্যাণ্ড যেতে চাওয়ার বিশেষ কারণ হলো একবার ওদেশী চকলেট খাওয়ার সুযোগ ঘটেছিলো ওলগার। আহ্! কি তার স্বাদ আর গন্ধ! এটাই একমাত্র কারণ, আর কিছু নয়। ওদেশে গিয়ে প্রাণভরে চকলেট খাবে ওলগা রেভজোভনায়া।

বেচারী জানে না, এই চকলেটই ওর জীবনের কাল হয়ে দাঁড়াবে।

অ্যারোফ্লোটের কিয়েভ-মস্কো-জুরিখ ফ্লাইটের মধুর স্মৃতি জীবনে ভুলবে না ওলগা। ওটাই ছিলো জীবনের প্রথম আকাশ ভ্রমণ তার। জুরিখ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। চোখ কপালে তুলে নিজের চারদিকের দৃশ্য গিলতে শুরু করে। এ কোন স্বর্গে এলাম, ভেবে আত্মহারা হয়ে উঠলো সে। ভাবলো, এ দেশের বাতাসও কিয়েভের বাতাসের তুলনায় অনেক অনেক ভালো-নির্মল। বোধহয় একেই মুক্ত বাতাস বলে।

সঙ্গে জমানো টাকা-পয়সা যা ছিলো, সবই প্রায় নিয়ে এসেছে ওলগা রেভজোভনায়া, যদিও খুব একটা বেশি নয়। তাই আগে থেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা হোটেলে রুম বুক করিয়েছে সে ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে। একশো ছত্রিশ লিমাটকোয়াই-এর লিডনহফ্ হোটেল।

রিসেপশন ক্লার্ককে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললো ওলগা, 'এই প্রথমবার আপনার দেশে এসেছি। কোথায় কোথায় গেলে সুইটজারল্যাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবো—যদি বলে দেন...'

'অবশ্যই,' আন্তরিক হাসি ফুটলো ক্লার্কের মুখে। 'প্রথমে সিটি ট্যুরই ভালো হবে আপনার জন্যে। ওপরে গিয়ে রেস্ট নিন, আমি ব্যবস্থা করছি।'

'ধন্যবাদ।'

দু'চোখ ভরে কেবল দেখে গেল ওলগা রেভজোভনায়া। সুইসদের দামি পোশাক আর দামি গাড়ি দেখে একটাই বিশ্বাস জন্মালো তার, এরা প্রত্যেকেই মিলিওনেয়ার। আর দোকান পাট! জুরিখের মেইন শপিং স্ট্রীট, বাহনহফস্ট্রেস-এ এসে খতমত খেয়ে গেল মেয়েটি রীতিমতো। এ দৃশ্য কখনও দেখতে পাবে ভাবেনি।

হাজারো ডিজাইনের লেটেস্ট পোশাক, কোট, জুতো, জুয়েলারি, সিরামিকের বাসন-কোসন, আসবাবপত্র, যানবাহন: সাইকেল থেকে শুরু করে লিমুজিন পর্যন্ত, বই, টিভি, রেডিও, খেলনা এবং পিয়ানো সাজানো রয়েছে দোকানগুলোয়। মনে হলো ভোগ্যপণ্যের সমুদ্রে এসে পড়েছে সে, হাবুডুবু খাচ্ছে।

এখানেই আছে জুরিখের বিখ্যাত কনফেকশন এবং চকলেট নির্মাতা, 'স্প্রাংলি'স। চারটে প্রকাণ্ড স্টোর ফ্রন্ট জানালার ধারে সাজানো চকলেটের হরেক লোভনীয় সুস্বাদু খাবার। বড় বড় বাক্সে মিক্সড চকলেট, চকলেট বানি, চকলেট পাউরুটি, চকলেট মোড়া বাদাম, চকলেট মোড়া কলা আর চকলেট বীন। এর ভেতরে থাকে মিষ্টি রস। মুখে দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে ওপরের শক্ত আবরণ গলে মুখের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে এ রস। সারা পৃথিবীতে 'স্প্রাংলি'স-এর এই চকলেট বীন রফতানী হয়।

এর সবই কিনতে ইচ্ছে হলো রেভজোভনায়ার। কিন্তু অর্থের স্বল্পতার কথা চিন্তা করে সে দুরাশা ত্যাগ করলো ও। বড় এক বাক্স পাঁচমিশালী চকলেট আর একটা ক্যানডি বার কিনলো সে কেবল। দেখতে দেখতে একটা সপ্তাহ কেটে গেল কোথা দিয়ে। দেশে ফেরার আগে শেষ প্রোগ্রাম ছিলো তার আলপস্ পর্বতমালা দেখা।

জীবনের সবচেয়ে বড় চমক অপেক্ষা করছিলো আনটেনডর্ফে। ফ্লাইং সসারের বিধ্বস্ত হওয়ার দৃশ্য চিরদিন মনে থাকবে ওলগা রেভজোভনায়ার। যদিও তার পাশেই, আইলের ওপাশে যে কানাডিয়ান ব্যাঙ্কার বসে ছিলেন, তিনি ওটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করেননি। তাঁর মতে ওটা সাজানো ঘটনা-ট্যুরিস্টদের চমৎকৃত করার একটা সরকারী প্রচেষ্টা। ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক মানতে রাজি নন যে ফ্লাইং সসার বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব সত্যিই আছে।

দেশে ফিরেই প্রধান লাইব্রেরিয়ানকে ঘটনাটা জানায় ওলগা রেভজোভনায়া। ওর মনের কথার সাথে মিলেও যায় তাঁর মন্তব্য। 'অবশ্যই ফ্লাইং সসার আছে,' খুব জোর দিয়ে বলেছেন প্রধান লাইব্রেরিয়ান। 'সারা বছরই রাশিয়ার আকাশে দেখা যায় ওদের, এখানে ওখানে।'

নতুন তৈরি চওড়া, মসৃণ রাজপথ ধরে কিয়েভ কেন্দ্রের দিকে ছুটছে মাসুদ রানার ইনট্যুরিস্ট বাস। একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে। ভেজা রাস্তায় টায়ারের চড় চড় শব্দ দরজা-জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। পথের দু'ধারে অজস্র সুন্দর

সুন্দর আকাশছোঁয়া অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, ঝলমল করছে আলোয় আলোয়।
কিয়েভের সেরা হোটেল 'দিয়েনপার' পৌঁছুতে পুরো এক ঘণ্টা লাগলো।
নেমেই ঘড়ি দেখলো রানা, সাড়ে আটটা। অর্থাৎ আজ আর করার মতো কিছু নেই।
অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে লাইব্রেরি। তবে ওটা কোথায়, খুঁজে বের করে রাখা
যায়। সকালে সোজা গিয়ে হাজির হওয়া যাবে।
দিয়েনপারেই রাতের খাওয়া সারলো রানা। তারপর ওয়াক এ মাইল করতে
বেরোলো। আগেই রিসেপশন ক্লার্কের কাছ থেকে পথের হদিশ জেনে নিয়েছে।
হোটেলের কাছ দিয়ে গেছে না-চওড়া, না-সরু এক নদী–দিয়েনপার। এখানে ওখানে
সবুজ বাগান ঘেরা অনেকগুলো পার্ক চোখে পড়লো রানার। রাশিয়ার সবচেয়ে
পুরানো শহরগুলোর অন্যতম কিয়েভ।
ইউরোপিয়ান ধাঁচের শহর, খুবই আকর্ষণীয়। রাস্তাঘাট ঝকঝকে তকতকে।
ঝরা পাতা ছাড়া কোথাও ফেলে দেয়া টুকরো কাগজ বা সিগারেটের গোড়া, কিছুই
চোখে পড়লো না রানার। লেনকমসোমল স্কয়ারে এলো ও। দূর থেকে বিশাল
ভবনটার দিকে চেয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে চললো।
পরদিন লাইব্রেরি খোলার প্রায় সাথে সাথেই পৌঁছে গেল মাসুদ রানা। বয়স্ক
রিসেপশনিস্টকে ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখে নিজেও হাসলো। 'গুড মর্নিং।'
চোস্ত রুশ ভাষায় বললো ও।
'গুড মর্নিং। বলুন, কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'
'আমি ওলগাকে খুঁজছি। গত সপ্তায়...'
'ওলগা?' ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো লোকটা, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। ভেতরে আছে ও।
সোজা চলে যান,' হাত তুলে একটা রুম দেখিয়ে দিলো সে।
'ধন্যবাদ।'
মাঝারী আকারের একটা রিডিং রুম এটা। ভেতরে এক মহিলা ছাড়া আর কেউ
নেই। ব্যস্ত হাতে তাকের বইগুলো ঠিকঠাক করে রাখছে সে।
'এক্সকিউজ মি,' বললো রানা।
ঘুরলো মহিলা। 'বলুন?' বিদেশীর মুখে চমৎকার রুশ ভাষা শুনে খুশিই হয়েছে
মনে হলো।
'ওলগা?'
'হ্যাঁ। কেন খুঁজছেন আমাকে?'
'আমেরিকান এক পত্রিকা থেকে এসেছি আমি। আপনাদের পেরেস্ত্রোইকার
ওপর বিশেষ একটা আর্টিকেল লিখছি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।
আপনার কি মনে হয়, পেরেস্ত্রোইকা কোনো পরিবর্তন আনতে পেরেছে রুশ সমাজ
ব্যবস্থায়?'
'গর্বাচভের আগে বাইরে মুখ খোলার সাহস পেতাম না। এখন পাই।
এটুকুই যা বদলেছে, আর কিছু নয়,' চটপট উত্তর দিলো ওলগা।
অনা নাইন বয়লো মাসুদ রানা। বললো, 'কেন, এই যে ইচ্ছে হলেই বিদেশ
ভ্রমণে যেতে পারছেন আজকাল, আমার তো মনে হয় এ-ও একটা শুভ পরিবর্তন।'
মুখে হাত চাপা দিয়ে লাজুক হাসি দিলো ওলগা। 'ঠাট্টা করছেন? ছয় ছেলে-

মেয়ে, স্বামী, এদের নিয়ে বিদেশ ভ্রমণ? এতো পয়সা কোথায় পাবো?'
'তাহলে? একাই গিয়েছিলেন সুইটজারল্যাণ্ড?'
'সুইটজারল্যাণ্ড?' চোখ কোঁচকালো ওলগা। 'কে বললো আপনাকে? জীবনে
ওদেশে যাইনি আমি।'
'কখনও যাননি?' বিস্মিত হলো মাসুদ রানা।
'নাহ্!' দ্রুত মাথা দোলালো ওলগা। পরক্ষণেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মুখটা। 'ও
বুঝেছি। আপনি আসলে চিনতে ভুল করেছেন। সুইটজারল্যাণ্ড গিয়েছিলো ওলগা
রেভজোভনায়া, আমি নই।'
'তাই নাকি? দুঃখিত। আপনার সময় নষ্ট করলাম বোধহয়।'
'না, ঠিক আছে। আপনি পাশের রুমে যান। ওখানে বসে ওলগা।'
পাশের রুমে এলো মাসুদ রানা। পাঁচ মিনিট পর, ওকে ওলগা রেভজোভনায়ার
সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে ব্যস্ত দেখা গেল। রানার প্রশ্ন শুনে কি যেন একটু ভাবলো
মেয়েটি। তারপর বললো, 'রাজনীতির সাথে জড়িত সে। সেনেটরদের নিয়ে প্রায়ই
বিদেশ ভ্রমণে যায়, তাদের দামি দামি গিফট দেয়। এর বিনিময়ে সেনেটররা তার
ক্লায়েন্টের স্বার্থ দেখে। তার জন্যে ভোটের মাধ্যমে নানান প্রজেক্ট পাস করিয়ে নেয়
কংগ্রেসে।'
লবিস্ট, ভাবলো রানা। 'কি নাম তার?'
'কি যেন...,' চিন্তা করতে লাগলো রেভজোভনায়া, '...হ্যারি, হ্যারি গিবসন।
হ্যাঁ, হ্যারি গিবসন-ই।'

'রাশান উইটনেসকে পেয়েছি,' বললো রানা। 'নাম, ওলগা রেভজোভনায়া।
কিয়েভ মেইন ব্রাঞ্চ লাইব্রেরিতে চাকরি করে।'
'অনেক ধন্যবাদ, মেজর রানা,' বললেন জেনারেল হিলিংটন। 'অন্য দু'জনের
খোঁজ পেলেন?'
'একজনের পেয়েছি।'
'কোথাকার লোক?'
'ওয়াশিংটন। আমি আসছি।'
'আই সী! আর তাহলে একজন থাকে, তাই না? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সনাক্ত
করা যাবে তাকে? আপনার কি মনে হয়?'
'চেষ্টা করবো। শিওর নই।'

অ্যারোফ্লোটের একটি টুপোলভ টিইউ–একশো ছয়ান্ন জেটে সকাল এগারোটায়
প্যারিসের পথে কিয়েভ ত্যাগ করলো মাসুদ রানা। তিন ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটে অরলি
পৌঁছুলো ও, এর আধ ঘণ্টা পর এয়ার ফ্রান্সের কানেকটিং ফ্লাইটে উড়াল দিলো
ওয়াশিংটনের উদ্দেশে।

রাত দুটো। ভারট্রাইক স্ট্রীটে নিজের ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে ঘুমিয়ে ছিলো ওলগা
রেভজোভনায়া। আচমকা সামনের রাস্তায় ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজে জেগে

emsumon@yahoo.com
www.murchona.com

উঠলো। পরমুহূর্তেই দু'টো দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়লো ওলগা, রাস্তার দিকের জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলো নিচে। একটা কালো চইকা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে। তার সামনে দু'জন সাদা পোশাকের গাট্টাগোট্টা লোক–নিচু গলায় আলাপ করছে কিছু।

কারা এরা? চোখ কুঁচকে উঠলো ওলগার। গাড়ির মডেলটা চেনে সে, সরকারী অফিশিয়ালরা ব্যবহার করে এ গাড়ি। হঠাৎ করেই একযোগে এই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটার দিকে পা বাড়ালো লোক দুটো। অস্বস্তি লেগে উঠলো মেয়েটির, কোন্ ফ্ল্যাটে আসছে ওরা, ক'তলায়? অন্যমনস্ক ছিলো সে, তাই নিজের দরজায় জোরে জোরে নকের আওয়াজ উঠতে আঁতকে উঠলো। অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে অজান্তেই। আমার কাছে কি চায় ওরা? ভাবলো ওলগা, নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে ওদের। তাড়াতাড়ি দরজা খুললো সে।

সামনেই দাঁড়িয়ে আছে লোক দুটো। দুটোর-ই চেহারার মধ্যে অশুভ কিছু আছে, কোনো সন্দেহ রইলো না তাতে ওলগার।

'কমরেড ওলগা রেভজোভনায়া?' প্রশ্ন করলো একজন।

'হ্যাঁ?'

'গ্রাভনোই রাযডেদিভেটেল্নই আপরাভলেনিই।'

কেঁপে উঠলো মেয়েটি। গ্রু! সিক্রেট পুলিস! ওর নাম জিজ্ঞেস করছে, তার মানে কি, ওকেই খুঁজতে এসেছে? ধাক্কা খেয়ে সচকিত হলো সে। ওর গা ঘেঁষে ভেতরে ঢুকে পড়েছে দুই গুপ্ত পুলিস।

'কি…কি চান আপনারা?' কোনও রকমে বললো ওলগা।

'প্রশ্ন আমরা করবো, আপনি শুধু উত্তর দেবেন,' বললো প্রথমজন। 'আমি সার্জেন্ট এগ্রোনভ, সেগেই এগ্রোনভ। আর এ সার্জেন্ট ফিওদর গ্রাচেভ।'

'আমি…আমি কি অপরাধ করেছি?'

গ্রাচেভ কথা বললো এবার। বাঁকা হাসি হেসে বললো, 'আপনি তাহলে জানেন যে একটা কিছু অপরাধ আপনি করেছেন?'

'নিশ্চয়ই না, কোনো অপরাধ করিনি আমি,' জোর গলায় বলতে চাইলো ওলগা রেভজোভনায়, কিন্তু পারলো না।

'ক'দিন আগে সুইটজারল্যাণ্ড গিয়েছিলেন আপনি, নিয়েত?'

'হ্যাঁ। কিন্তু…কিন্তু সেতো অনুমতি নিয়েই…'

'এসপিওনাজ বেআইনী, ওলগা রেভজোভনায়,' বললো এগ্রোনভ।

'এসপিওনাজ?' শিউরে উঠলো মেয়েটি। 'কি বলছেন এসব…?' থেমে গেল গ্রাচেভকে লোভীর মতো ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে। হঠাৎ করেই খেয়াল হলো, পাতলা নাইটগাউন ছাড়া আর কিছুই নেই পরনে। গায়ে কাঁটা দিলো ওলগার।

'চলুন। আমাদের সাথে যেতে হবে আপনাকে।'

'আপনাদের নিশ্চয়ই কোনো ভুল হচ্ছে,' মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলো ওলগা। 'আমি চাকরি করি, লাইব্রেরিয়ান। যাকে খুশি জিজ্ঞেস…'

তার নগ্ন, মসৃণ বাহু ধরে টান দিলো লোকটা। 'কথা নয়। চলুন।'

আতঙ্কে কেঁদে ফেললো ওলগা। 'কোথায় যেতে হবে?'

'আমাদের হেডকোয়ার্টারে।'

নাইটগাউনের ওপর শুধু একটা কোট চড়াবার অনুমতি দেয়া হলো ওকে। তারপর প্রায় ঠেলে ধাক্কিয়ে গাড়িতে এনে তোলা হলো। গ্রাচেভ আর কোনও কথা বলেনি। চুপচাপ আছে। চইকার পিছনের আসনে ওলগার সাথে বসলো সে। গাড়ি ছাড়লো এগ্রোনভ। নিঃশব্দে কাঁদছে ওলগা রেভজোভনায়া। ভেতর থেকে বুঝতে পারছে, এই যাওয়া তার শেষ যাওয়া। কয়েক বছর আগে এই নাটক চলতো হর-হামেশা। রাত দুপুরে বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো যাকে খুশি। যারা যেতো, আর কখনই ফিরে আসতো না তারা। এরকম অনেক কাহিনী জানা আছে ওলগার। শুধু জানা ছিলো না, তার নিজের জীবনেও এ নাটক কোনোদিন মঞ্চায়িত হতে পারে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলো ওলগা। সাহস করে বললো, 'প্লীজ, বিশ্বাস করুন, আমি কখনও দেশের সাথে বেঈমানী…'

'শাট আপ!' খেঁকিয়ে উঠলো এগ্রোনভ।

পাশ থেকে গ্রাচেভ বললো, 'এর সাথে অনর্থক চোটপাট দেখিয়ে কি লাভ, সেগেই? আমার মনে হয় ওলগা সত্যি কথাই বলছে।'

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলো না মেয়েটি, ঝট্ করে ঘুরে তাকালো গ্রাচেভের আবছা মুখটার দিকে। আশার ক্ষীণ একটু আলো যেন দেখতে পেলো সে।

'সময় পাল্টে গেছে,' বলে চললো সার্জেন্ট ফিওদর গ্রাচেভ। 'নিরীহ নির্দোষ মানুষকে শুধু শুধু হয়রানী করা পছন্দ করেন না কমরেড গর্বাচভ। সে দিন চলে গেছে অনেক আগে।'

'কে বললো ও নির্দোষ?' খ্যাঁক করে উঠলো এগ্রোনভ। 'আর যদি হয়েই থাকে, তো আমাদের সঙ্গে যেতে এতো ভয় কিসের?'

শক্ত হয়ে বসে থাকলো ওলগা রেভজোভনায়া। ওদের আলাপ শুনছে কান খাড়া করে।

'দেখো, দোষী হোক আর না হোক, ওখানে গেলে এর মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় না করে ছাড়বে না ওরা। জোর করে অপরাধী বানাবে একে। আমার মনে হয়…।' থেমে গেল গ্রাচেভ।

'আমাদের কিছু করার আছে, বলো?' বললো সেগেই। 'আমরা হুকুমের চাকর। যা হুকুম হবে, তাই তো পালন করতে হবে, না কি?'

'ইচ্ছে থাকলে একটা পথ খুঁজে নেয়া যায়।'

'হোয়াট!' বিস্মিত হয়ে ঘুরে তাকালো সেগেই। 'কিসের কথা বলছো?'

এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলো গ্রাচেভ। তারপর নিচু গলায় বললো, 'শোনো, একে বরং ছেড়েই দেই। গিয়ে ওদের বললেই হবে ওলগাকে পাইনি আমরা। কাল আবার পাঠালে আবার আসবো। ফিরে গিয়ে আবারও বলবো, পাইনি। পালিয়ে গেছে ওলগা। আমার মনে হয়, এভাবে দুয়েকদিন কাটাতে পারলে এর কথা ভুলে যাবে হেডকোয়ার্টার। অন্য হাজারজনের মধ্যে এ মেয়ের কথা আর মনে থাকবে

amarsumon@yahoo.com
www.murchona.com

না।'

কিছু বলার চেষ্টা করলো ওলগা রেভজোভনায়া। কিন্তু স্বর বেরোলো না, শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে গলা থেকে বুক পর্যন্ত। মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে লাগলো সে, যেন ওর পাশের লোকটিরই জয় হয় শেষ পর্যন্ত।

সেগেই বললো, 'কিন্তু এর জন্যে এতোবড় ঝুঁকি কেন নিতে যাবো আমরা? তাতে আমাদের কি লাভ? বিনিময়ে কি পাবো ওর কাছ থেকে?'

ওলগার দিকে ফিরলো ফিওদর গ্রাচেভ। ওর মতামতের অপেক্ষা করছে। এবার কথা বলতে সক্ষম হলো ওলগা। 'আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই,' তাড়াতাড়ি বললো, 'যা জমিয়েছিলাম সব খরচ হয়ে গেছে সুইটজারল্যাণ্ড বেড়াতে গিয়ে।'

'টাকা পয়সা কে চেয়েছে?' বিরক্ত হলো সেগেই এগ্রোনভ। 'টাকার অভাব নেই আমাদের, আমরা চাই অন্য কিছু।'

ওলগা মুখ খোলার আগেই বলে উঠলো গ্রাচেভ। 'পাগল নাকি? এর কাছে তা কি করে আশা করো তুমি?'

'আমার চাওয়ার কাজ চাইলাম, দেয়া না দেয়া ওর ইচ্ছে। আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে ওরই লাভ। আমরা মাত্র দু'জন, আর হেডকোয়ার্টারে আছে একদল শকুন। মাতাল। ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে ওকে।'

যেন তর্কে হেরে গেছে, এমন একটা হতাশার ভাব ফুটলো গ্রাচেভের চেহারায়। ওলগার দিকে ফিরলো সে। 'কি করবেন?'

'কি চাইছেন আপনারা, আমি বুঝতে পারছি না,' ইতস্তত ভঙ্গিতে বললো ওলগা।

'কমরেড সেগেই বলছেন, আমাদের প্রস্তাবে রাজি হলে প্রাণে বেঁচে যাবেন আপনি।'

'কি করতে হবে আমাকে?' বেকুবের মতো প্রশ্ন করলো মেয়েটি। এখনও বুঝতে পারছে না আলোচনা কোনদিকে গড়িয়েছে।

পিছন ফিরে দাঁত বের করে হাসলো সেগেই। 'কিছু শক্ত কাজ নয়। কেবল আমাদের পিছনে কয়েক মিনিট মূল্যবান সময় খরচ করুন, তাহলেই খুশিমনে ফিরে যাবো আমরা।'

এইবার বুঝলো লাইব্রেরিয়ান। দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'এ আমার দ্বারা হবে না।'

'ঠিক।' ঘুরে বসে গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিলো সেগেই। 'ওরাই তাহলে দলে দলে ভোগ করুক তোমাকে।'

'দাঁড়ান!' অজান্তেই গলা চড়ে গেল ওলগা রেভজোভনায়ার। কলজে হিম হয়ে গেছে ভয়ে। এ ধরনের কাহিনীও অনেক শুনেছে সে। সুন্দর চেহারার অল্পবয়সী মেয়েদের জিজ্ঞাসাবাদের নামে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যেতো এরা। ধর্ষণের পর হত্যা করা হতো তাদের।

হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গেলে ওকে হয়তো সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আটকে রাখা হবে। মারধোর করা হবে, অফিসাররা পালা করে ধর্ষণ করবে। হয়তো—এরা মাত্র দু'জন। রাজি হলে অল্প কয়েক মিনিটে ঝামেলা মিটে যাবে, রেহাই পাবে সে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো ওলগা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে করুণ গলায় বললো, 'বেশ। আমি রাজি। চলুন, আমার ওখানেই যাওয়া যাক।'

'তার কোনো দরকার নেই,' বললো সেগেই। 'ওর চেয়ে অনেক ভালো জায়গা চেনা আছে আমার।'

'আমি দুঃখিত,' চাপা গলায় বললো গ্রাচেভ। 'ও ইন-চার্জ। ওকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা নেই আমার।'

কোনও উত্তর দিলো না ওলগা। আসন্ন ব্যাপারটি নিয়ে মনে মনে উদ্বিগ্ন। এরই ফাঁকে লক্ষ্য করলো, শেভচেনকো অপেরা হাউস পেরিয়ে এসেছে চইকা। সামনের বড় গাছপালা ঘেরা পার্কটার দিকে ছুটছে এখন। রাস্তায় একটা কুকুরও নেই—একদম ফাঁকা। ওলগার আশঙ্কাই সত্যি হলো, পার্কের ভেতর সাঁ করে সেঁধিয়ে গেল গাড়ি। ঘন ঝোপঝাড় ঢাকা একটা জায়গায় পৌঁছে থামলো সেগেই এগ্রোনভ। আলো নিভিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে দিলো।

'নামা যাক,' মুখ না ফিরিয়ে বললো সেগেই।

তিনজনেই নামলো ওরা। প্রচণ্ড শীত বাইরে, এয়ারকণ্ডিশণ্ড গাড়িতে ছিলো বলে বুঝতে পারেনি এতোক্ষণ ওলগা। দু'হাতে নিজেকে আলিঙ্গন করে কাঁপতে লাগলো সে, অসহায়ের মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

'তোমার ভাগ্য ভালো,' বললো সার্জেন্ট সেগেই। 'অন্য কেউ হলে ছাড়তাম না কিছুতেই।'

মাথা দোলালো ওলগা। কথা বলতে পারছে না ভয়ে।

'কাপড় খোলো।'

মিনমিন করে বললো ওলগা, 'খুব শীত এখানে। আমার ফ্ল্যাটে...'

চড়াৎ করে প্রচণ্ড এক চড় কষালো সেগেই তার গালে। 'যা বলি করো,' দাঁতে দাঁত চেপে বললো। 'নইলে মত পাল্টে যেতে পারে আমার যে-কোনো মুহূর্তে।'

তবুও ইতস্তত করতে লাগলো ওলগা। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে আবার হাত তুলতে যাচ্ছিলো লোকটা, তাই দেখে ব্যস্ত হয়ে কোটের বোতাম খুলতে শুরু করলো সে।

'ফেলে দাও।'

নীরবে নির্দেশ পালন করলো মেয়েটি।

'নাইটগাউন।'

ওটাও খুললো সে। মাটিতে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো মুখ নিচু করে। পানিতে ঝাপসা হয়ে গেছে দৃষ্টি। কাঁপছে ঠাণ্ডায়।

তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত লোভাতুর দৃষ্টি বোলালো সার্জেন্ট সেগেই এগ্রোনভ। প্রশংসার সুরে বললো, 'দারুণ ফিগার!' পর মুহূর্তেই ল্যাং মারলো ওলগাকে, দড়াম করে শিশিরভেজা ঘাসে পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়লো সে।

'প্লী...জ...' কান্না জড়ানো গলায় আবেদন জানালো ওলগা।

'আর একটা কথা বলো, সোজা হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবো।' ব্যস্ত হাতে কাপড় খুলতে শুরু করলো সেগেই। ওদের চার হাত তফাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে

আছে ফিওদর গ্রাচেভ।

ওলগার মুখের ওপর ঝুঁকে এলো কামোন্মত্ত সের্গেই। কাঁপা কাঁপা গরম বাতাস ছাড়ছে মুখ দিয়ে। চোখ বুজলো ওলগা সভয়ে। এসব ভাববো না আমি, নিজেকে শোনালো সে বিড়বিড় করে। ভাববো, এখনও সুইটজারল্যাণ্ডে আছি আমি, সান শাইন কোম্পানির ট্যুর বাসে আলপস দেখতে যাচ্ছি।...বরফ মোড়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে একটা স্লেজ ছুটছে খুব জোরে। একজোড়া যুবক-যুবতী আছে ওটায়...জোর বাতাসে চুল উড়ছে মেয়েটির...হাসছে সে খিল্ খিল্ করে।

ঠাণ্ডা মাটিতে ওর দেহটা পিষে ফেলার যোগাড় করেছে সের্গেই এফ্রোমভ। মুখ দিয়ে জানোয়ারের মতো আওয়াজ করছে।

হাইওয়েতে কতো সুন্দর সুন্দর কার, নিজেকে বাধ্য করলো ওলগা মনোযোগ ঘোরাতে। কতো মডেলের, আর কতো বাহারী রঙের। এতো গাড়ি জীবনেও দেখিনি আমি। ওদেশে টাকা আছে মানুষের, সবারই গাড়ি আছে।...আলপসের কোনও পাহাড়ে ঘর বাঁধবো আমি। কি যেন বলে ওগুলোকে সুইসরা? শ্যালে...কাঠের ঘর...।

এই সময় মুক্তি দিলো ওকে সের্গেই। উঠে দাঁড়িয়ে গ্রাচেভের উদ্দেশে বললো, 'এবার তুমি।'

...ওদেশেই বিয়ে করবো আমি, বিচ্ছিন্ন মনোযোগ আবার কেন্দ্রীভূত করলো ওলগা। স্বামী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে দিন কাটাবো। শীতকালে বরফমোড়া আলপসে স্কি করবো সবাই মিলে...। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল ওলগা। অসহ্য!

...দিনগুলো স্বপ্নে ভরা থাকবে। কোনও দিনও আর রাশিয়ায় ফিরবো না আমি। কখখোনও না। কোনোদিন না। কোনোদিন না।

থেমে পড়েছে ফিওদর। সন্তুষ্ট। হাঁপাতে হাঁপাতে পাশে দাঁড়ানো সের্গেইর দিকে তাকালো হাসি মুখে। 'বাজি রেখে বলতে পারি,' হাসলো সে। 'কমরেড ওলগাও উপভোগ করেছে পুরোটা।'

সামনে ঝুঁকে ওলগা রেডজোভনায়ার মাথাটা দুই হাত থাবায় চেপে ধরলো সে, হ্যাঁচকা এক মোচড় দিয়ে ঘাড়টা ভেঙে ফেললো 'মড়াৎ' করে।

পরদিন সকালে ওখানেই পাওয়া গেল হতভাগ্য লাইব্রেরিয়ানের উলঙ্গ, ধর্ষিত মৃতদেহ। এবং ওইদিন স্থানীয় দুয়েকটি পত্রিকার দুপুর সংস্করণে এক সরকারী প্রেস রিলিজ ছাপা হলো। ওতে সন্ধের পর অল্পবয়েসী মেয়েদের একা একা কোনও পার্কে বেড়াতে না যাওয়ার জন্যে হুঁশিয়ার করে দেয়া হলো। সেই সাথে লাইব্রেরিয়ান ওলগা রেডজোভনায়ার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক এবং সমবেদনাও প্রকাশ করা হলো।

দশ

একটা সময় ছিলো, যখন দুই মালটি বিলিওনেয়ার ডোনাল্ড রীক এবং জুন এলিসন ছিলো একে অন্যের প্রাণের শত্রু। এক বনে দুই বাঘের মতো ওয়াল স্ট্রীটে বিচরণ ছিলো দু'জনের। কাগজে কলমে কোনও অস্তিত্ব না থাকলেও সবাই জানতো, ওয়াল স্ট্রীটের মাঝ বরাবর একটা অদৃশ্য লাইন টানা আছে। এই দুই বাঘ ছিলো একেক অংশের হর্তাকর্তা-বিধাতা।

প্রথম ঠাণ্ডা লড়াইটা বাধে সুইটজারল্যাণ্ডের বিশাল এক পাবলিক ইউটিলিটি কোম্পানির নিলাম ডাকের সময়। প্রথম দরটা ডোনাল্ড রীকের তরফ থেকেই হাঁকা হয়। কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেনি, তাঁর সঙ্গে টেক্কা দেয় এমন বাপের বেটা কেউ আছে। ডোনাল্ড রীকের অর্থ আর প্রভাব সম্পর্কে জানতো সবাই। এটা যখনকার কথা, তখন তিনি ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁরও স্থির বিশ্বাস ছিলো যে দুয়েকবার দর হাঁকার পর অন্যরা বাধ্য হবে পিছিয়ে যেতে। কারণ, তাঁর প্রথম বিডের অঙ্কটাই ছিলো অস্বাভাবিক মোটা।

এই সময় অজ্ঞাত এক আমেরিকান ব্যবসায়ী, জুন এলিসনের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় কর্ম এলো। রীককে টপকে দফায় দফায় দাম বাড়িয়েই চললো জুন এলিসন—বাধ্য হলেন রীক দাম চড়াতে। শেষ পর্যন্ত কোম্পানিটা অবশ্য তাঁর-ই হলো, তবে যে দামে কিনতে সক্ষম হবেন বলে আশা করেছিলেন রীক, তার দশ গুণ বেশি দামে। সেই প্রথম ডোনাল্ড রীকের নজর কাড়লো জুন এলিসন।

দ্বিতীয় লড়াইটা হলো বড় এক ইলেকট্রনিকস্ ফার্ম নিয়ে। জুন এলিসন কোণঠাসা করে ফেললো ডোনাল্ড রীককে। বাড়তে বাড়তে সীমা ছাড়িয়ে গেল দর। অবশেষে, জীবনে প্রথমবারের মতো পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হলেন রীক। কানে পানি গেল তাঁর।

পরাজয়ের বছর দুয়েক পরের ঘটনা। একটা কম্পিউটার নির্মাতা কোম্পানি বিক্রি হতে যাচ্ছে। জানা কথা, ডোনাল্ড রীক ডাকে অংশ নেবেন। গোপন সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, জুন এলিসনও আসছে। এখনই লোকটার সাথে বোঝাপড়াটা সেরে নেয়ার উপযুক্ত সময়, ভাবলেন রীক।

বাহামা দ্বীপপুঞ্জের প্যারাডাইস দ্বীপে মিলিত হলো দুই মহারথী। ডোনাল্ড রীক বয়স্ক, বিচক্ষণ। জুন এলিসন অল্পবয়সী, ড্যামকেয়ার। 'দিন দিন ভাবিয়ে তুলছেন আপনি আমাকে,' বললেন রীক।

হাসলো এলিসন। 'আপনার মতো একজনের মুখে একথা শুনতে হবে, ভাবিনি কোনোদিন।'

'কি চান আপনি?'

'আপনার সাথে আমার চাওয়ার পার্থক্য নেই। পুরো পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় চাই আমি।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন রীক। 'পৃথিবীটা অনেক বড়।'

'অর্থাৎ?'

'ইচ্ছে করলে গ্রহটাকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে নিতে পারি আমরা।'

সেইদিন থেকে ব্যবসায়িক অংশীদার বনে গেল দু'জন। যার যার ব্যবসা নিয়েই থাকলো তারা, কিন্তু যেই কোনও বড় প্রজেক্ট হাজির–টিম্বার, তেল বা রিয়েল এস্টেট, অমনি বৈঠকে বসে পড়লো। আপোষে রফা হতে লাগলো সমস্যা। এদের এই বেআইনী ডীল ঠেকানোর জন্যে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের অ্যান্টি-ট্রাস্ট ডিভিশন আদাজল খেয়ে মাঠে নামলো, কিন্তু করতে পারেনি কিছুই। একসময় হঠাৎ করেই হাত গুটিয়ে নিলো তারা। কেন, কেউ জানে না।

এই মুহূর্তে ব্রাজিলের আমাজন অববাহিকার প্রাচীন গাছপালা সমৃদ্ধ রেইন ফরেস্টের পঞ্চাশ মিলিয়ন একর জমি কেনার একটা প্রকল্প প্রায় চূড়ান্ত করে এনেছে রীক-এলিসন। প্রায় তিনটে বছর খাটতে হয়েছে তাদের এর পিছনে। খুবই গোপনে। কারণ, প্রথম থেকেই বাধা পেয়ে আসছে তারা এ কাজে। যদিও পাত্তা দেয়নি ব্যাপারটিকে দু'জনের একজনও। দেয়ার কোনও কারণও নেই। কেন না এ পর্যন্ত দু'জনে মিলে যতো ব্যবসা করেছে, তার পুরো লাভ জড়ো করলে যা দাঁড়াবে, তার বিশগুণ লাভ হবে এই একটিমাত্র ডীলে।

অতএব, কোনও বাধা যাতে তাদের রুখতে না পারে, সে ব্যাপারে দু'জনেই অত্যন্ত সতর্ক।

এগারো

ওয়াশিংটন ডি.সি। সেনেটের প্লিনারি সেশন চলছে। ইউটা-র জুনিয়র সেনেটরের দখলে আছে ফ্লোর। স্বভাবসুলভ তর্জনী নাচিয়ে বক্তব্য রাখছেন তিনি। প্রতিটি বাক্যে ওজনদার সব কথা, একটাও ফালতু কথা নেই। শব্দ হাতড়াতে হচ্ছে না তাঁকে থেমে থেমে। সাবলীল, তুখোড় বক্তা হিসেবে সবার কাছেই সমান পরিচিত ভদ্রলোক।

চেহারাটাও তেমনি। পাক্কা ছ'ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা। মেদহীন, হালকা-পাতলা গড়ন, চওড়া কাঁধ। খাড়া নাক, গাল দুটো সামান্য চাপা। সোনালী চুল, ব্যাক ব্রাশ করা। বড় বড় দু'চোখের চাউনি স্বচ্ছ। কারও দিকে তাকালে মনে হয় শুধু বাইরেরটুকুই নয়, ভেতরটাও দেখতে পান পরিষ্কার।

'...সুন্দর এই দেশটাকে, এই গ্রহটাকে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি আমরা,' বলছেন সেনেটর। 'কতোগুলো লাজ-লজ্জাহীন মুষ্টিমেয় কয়েকজন পয়সাওয়ালা, প্রভাবশালী ব্যক্তির সীমাহীন লোভের কাছে আমরা বার বার হার স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। কেন? আজই, এখনই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, এ গ্রহের কোনো

সম্পদই অফুরন্ত নয়। প্রকৃতির বুক ঝাঁঝরা করে ফেলেছি আমরা এরই মধ্যে, লোভীর মতো...'

ওদিকে ভিজিটরস গ্যালারিতে বসে আছে হ্যারি গিবসন। নবিয়িষ্ট অস্থির দেখাচ্ছে তাকে। গত পাঁচ মিনিটে তিনবার হাতঘড়ি দেখেছে। আর কতোক্ষণ লাগবে সেনেটরের ভাষণ শেষ হতে, ভাবছে। সেনেটরের সঙ্গে লাঞ্চ করার প্রোগ্রাম আছে আজ গিবসনের। বিশেষ একটা কাজে সেনেটরের সাহায্য প্রয়োজন তার, সে-জন্যে সে-ই নিমন্ত্রণ করেছে ভদ্রলোককে।

অরেগনের ইউজিনে জন্ম হ্যারি গিবসনের। খুব গরীব ছিলো ওর বাপ। তার ওপর ভীষণরকম মদকাসক্ত। ছোটখাটো কাঠ চেরাইয়ের ব্যবসা ছিলো, মদের খরচ জুগিয়ে যা থাকতো, তাতে সংসার বলতে গেলে চলতো না। গিবসনের আট বছর বয়সে লিভার পচে মরে গেল মানুষটা। তারপর থেকেই পেটের ধান্ধায় এটা-ওটা অনেক কিছু করতে হয়েছে তাকে। কারণ, বাপের মৃত্যুর মাস খানেকের মধ্যেই অন্য একজনকে বিয়ে করে গিবসনের মা।

ওই বয়সেও ছেলে যথেষ্ট আত্মসচেতন ছিলো। মায়ের নতুন সংসারের বোঝা না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সংগ্রামে নামে সে। এতে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে তাকে তার সুন্দর, মায়াভরা চেহারা। ইউজিনের অনেকেই টুকটাক কাজ দিয়ে, সাহস জুগিয়ে সাহায্য করে ওকে সে সময়। এদের মধ্যে ছিলেন ল্যারি এনডারসন ইউজিনের নামে এক ধনী ব্যক্তি। অবিবাহিত ছিলেন এনডারসন। খুবই অমায়িক।

গিবসনকে নিজের এক কারখানায় পার্ট টাইম চাকরি দেন তিনি প্রথমে। আস্তে আস্তে দু'জনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বসের বাসায় ডিনারের দাওয়াত থাকতো গিবসনের। এ নিয়ে তার সহকর্মীদের ঈর্ষার অন্ত ছিলো না।

'একটু সচেষ্ট হলেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে তুমি, গিবসন।' এক রাতে ডিনার সেরে মৃদু আলোকিত কুল বারান্দায় এসে বসলেন এনডারসন ওকে নিয়ে। পাশাপাশি। 'তবে এ জন্যে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আই মীন, বন্ধু প্রয়োজন,' বললেন তিনি।

'আমি জানি, স্যার,' হাতের রঙ্গীন পানীয়ের গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বললো গিবসন। 'আপনার মতো বন্ধু পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।'

'এ আর এমন কি।' ডান হাত তুলে দিলেন তিনি গিবসনের ওপাশের কাঁধে। 'আরো অনেক কিছু করতে পারি আমি, শুধু তোমার জন্যে।' ওর বাহুতে মৃদু চাপ দিলেন ভদ্রলোক। 'তুমি জানো, তুমি দেখতে কতো সুন্দর, তোমার ফিগার কি চমৎকার?'

'ধন্যবাদ, স্যার।' প্রথমে কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে থাকলো গিবসন। তারপর স্বাভাবিক হয়ে এলো।

'তোমার কখনও নিঃসঙ্গ লাগে না?'

'লাগে।'

'আমারও।' আবারও বাহুতে চাপ দিলেন এনডারসন। 'তোমার কোনো মেয়ে

বন্ধু নেই?'

'না, স্যার।' একটু লজ্জা পেলো গিবসন।

'কোনো মেয়ের কাছে গিয়েছো কখনও?'

'গিয়েছিলাম···স্যার, একবারই।'

'তার সঙ্গে শুয়েছো?'

কান গরম হয়ে উঠলো। দ্রুত মাথা ঝাঁকালো গিবসন। 'হ্যাঁ।'

'বয়স কতো হলো তোমার?'

'ষোলো।'

'এটাই হলো আসল সময়, বুঝলে?' বললেন এনডারসন। লম্বা এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করলেন। 'এখনই ভবিষ্যত ক্যারিয়ার গড়তে হবে তোমাকে। আমি শিওর, রাজনীতিই তোমার ভাগ্য খুলে দেবে।'

'রাজনীতি? কিন্তু আমি তো ওসব একদম বুঝি না, স্যার।'

'কোনো চিন্তা নেই, সে ব্যবস্থা আমি করবো।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'উঁহু! ধন্যবাদ জানাবার আরও অনেক উপায় আছে,' বললেন ল্যারি এনডারসন। হাতটা নেমে এসেছে গিবসনের ঊরুর ওপর। 'অনেক উপায় আছে,' তার চোখে চোখ রেখে বললেন তিনি। 'আমি কি বলতে চাই বুঝতে পারছো, গিব?'

'হ্যাঁ। বুঝেছি।'

সে রাতেই সাফল্যের সাথে হ্যারি গিবসনের ভেতর সমকামিতার বীজ ঢোকালেন ল্যারি এনডারসন। এরপর তাঁর পয়সায় চার্চিল হাই স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী নিয়ে বেরোলো গিবসন। ভর্তি হলো ইউনিভার্সিটি অভ অরেগন-এ। সাবজেক্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স। তার সুন্দর চেহারার সাথে যোগ হলো শিক্ষা।

সবাই যুবকের আচার-আচরণ, কথাবার্তায় মুগ্ধ,অভিভূত। লবিয়িস্টের পেশা বেছে নিলো সে। নিয়মিত সেনেটে আসা যাওয়ার ফলে যোগাযোগের পরিধি ক্রমেই বাড়তে লাগলো। এখন অনেকেই তেল মাখে ওকে—অমুক সেনেটরকে ধরে আমার এই কাজটা করিয়ে দিন। সেনেটে তুলতে হবে আমার প্রস্তাবটা···তারপর রোল কল ভোট···। খুশি মনেই কাজ করে হ্যারি গিবসন। এখন তার মাথার ওপর টাকার বৃষ্টি হয় সারাক্ষণ। কাজ করতে করতে একেকসময় হাঁপিয়ে ওঠে সে। তখন কয়েকদিনের জন্যে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় কাজ থেকে। বেড়িয়ে আসে বাইরে থেকে। এই যেমন সেদিন ঘুরে এলো সুইটজারল্যাণ্ড। শিক্ষাগুরুর শিক্ষা ভোলেনি সে। সপ্তাহে দু' তিনদিন অল্প বয়সী কিশোরদের নিয়ে রাত কাটে তার। যদিও বয়স এক্ষেত্রে কোনও বাধা নয়। সঙ্গী পছন্দ হলে বয়সে আটকায় না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে নড়েচড়ে বসলো হ্যারি গিবসন। বক্তব্য প্রায় শেষ করে এনেছেন সেনেটর। '···আশা করবো, আপনারা সবাই এই বিলটির স্বপক্ষে ভোট দেবেন। কারণ, পুরোপুরি ধ্বংসের হাত থেকে এই গ্রহটিকে বাঁচানোর এখনই উপযুক্ত সময়। প্রস্তাবটিকে আমি রোল কল ভোটে দেবার অনুরোধ করছি।'

বাপরে বাপ! বাঁচা গেল। লাঞ্চ শেষ করে সেনেটরের সাথে বসতে হবে তাকে

ঘণ্টাখানেকের জন্যে, ব্যবসায়িক আলাপ আছে। তারপর একটু গড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে কালকের সেই গে-বারে, ডামি'স 'পি' স্ট্রীট স্টেশনে। আজ রাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সেই তরুণের সাথে।

দ্রুত কাপড় পাল্টাচ্ছে হ্যারি গিবসন। গড়াতে গিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিলো। ওদিকে আবার দেরি হয়ে গেল কি না, কে জানে। তাড়াতাড়ি কাফ লিঙ্ক লাগাচ্ছে সে, হঠাৎ ডোরবেলের আওয়াজ। ড্যামিট! দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললো সে। স্মার্ট এক আগন্তুক দাঁড়িয়ে আছে সামনে। চেহারা অনেকটা হলিউডের নায়কদের মতো।

'হ্যারি গিবসন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কেভিন পারকার। কিছু জরুরী আলাপ আছে আপনার সঙ্গে।'

অধৈর্যের সাথে বললো গিবসন, 'আমার সেক্রেটারির সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে আপনাকে প্রথমে, তারপর। অফিস আওয়ারের পর কারও সাথে ব্যবসা নিয়ে···'

'আলাপটা ব্যবসা সংক্রান্ত নয়, মিস্টার গিবসন। আপনার রিসেন্ট সুইটজারল্যাণ্ড সফরের ব্যাপারে।'

'আমার বিদেশ সফর নিয়ে আপনার জানার কি থাকতে পারে?'

'ওখানে আপনার সফর সঙ্গী যারা ছিলেন সান শাইন কোম্পানির ট্যুর বাসে, তাদের ব্যাপারে জানতে চাই।' পকেট থেকে সিআইএ-র একটা পরিচয়পত্র বের করে তাকে দেখালো মাসুদ রানা।

দ্বিধায় পড়ে গেল লবিয়িস্ট। এদের একেবারেই সহ্য করতে পারে না সে। তুচ্ছ ঘটনা নিয়েও এমন হৈ-চৈ বাধায় এরা সবসময়, যা সহ্য করা সত্যিই কঠিন। সে যাই হোক, তাই বলে দোরগোড়া থেকে লোকটাকে ফিরিয়েও তো দেয়া যায় না। জোর করে হাসলো গিবসন। 'ভেতরে আসুন। কিন্তু আমি খুব ব্যস্ত, মিস্টার পারকার।'

'এক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না আমার।'

হ্যারি গিবসনের বিশাল এবং বিলাসবহুল লিভিং রুমে এসে বসলো ওরা মুখোমুখি। 'বলুন?' কাফ লিঙ্ক লাগানো শেষ করলো গিবসন। 'আপনি কি ক্লাইং সসার সম্পর্কে জানতে চান?'

'না,' বললো মাসুদ রানা।

'তা হলে?'

'বাসে আপনার সফর সঙ্গী যারা ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে।'

'ও হ্যাঁ, সরি। কিন্তু তারা সবাই আমার অপরিচিত। স্ট্রেঞ্জার। তাদের ব্যাপারে আপনাকে আমি বোধহয় কোনো সাহায্য করতে পারবো না।'

'আমি জানি, তারা সবাই স্ট্রেঞ্জার ছিলো। কিন্তু তাদের কারও না কারও ব্যাপারে কমবেশি কিছু তো মনে থাকার কথা।'

'ও,' কাঁধ ঝাঁকালো গিবসন। 'হ্যাঁ, তা অবশ্য আছে। একজনের কথা ভালোই

মনে আছে। ভদ্রলোক ব্রিটিশ, আমাদের ছবি তুলেছিলেন ইউএফওর সামনে দাঁড় করিয়ে।'

'আর কেউ?'

'আরেকজন…এক রাশান মেয়ে। বেশ নম্রভদ্র মেয়ে। কোথায় যেন লাইব্রেরিয়ানের চাকরি করে বলেছিলো।'

'আর?'

'না। আর কেউ,…ও হ্যাঁ, আরও দু'জন ছিলো। একজন আমেরিকান, টেক্সান।'

'অন্যজন?'

'সে ছিলো হাঙ্গেরিয়ান।'

উত্তেজিত হয়ে উঠলো মাসুদ রানা। এর কথা এ পর্যন্ত কেউই উল্লেখ করেনি। এই লোকই তাহলে দশম ব্যক্তি।

'ব্যবসায়ী,' আবার বললো গিবসন। 'কার্নিভালের মালিক।'

'আপনি শিওর, মিস্টার গিবসন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চই। কার্নিভাল ব্যবসা নিয়ে আমার সাথে আলোচনাও হয়েছে ভদ্রলোকের। ইউএফও ক্র্যাশ দেখে এতোই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তিনি, আমার মনে হয়েছে, সম্ভব হলে ওটার ধ্বংসাবশেষ তুলেই নিয়ে যেতেন হাঙ্গেরি, সাইডশো হিসেবে দেখাতেন দর্শকদের। উত্তেজিত প্রত্যেকেই হয়েছিলো অবশ্য, আমিও। সে দৃশ্য আসলে ভোলার নয়। দেশে ফিরে ভেবেছি প্রেসকে জানাই ঘটনার কথা, কিন্তু চেপে গেছি। কি হবে বলে, কেউ বিশ্বাস করবে আমার কথা?'

'তার নামটা বলতে পারবেন?'

'সরি, না। বিদেশী নাম, ভীষণ খটমটে। ভুলে গেছি।'

'আর কিছু মনে পড়ে তার ব্যাপারে?'

'একবার বলেছিলেন, খুব ব্যস্ততার ভেতর আছেন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে যেতে হবে। মানে, কার্নিভালে।' ঘড়ির ওপর চোখ বোলালো গিবসন। 'ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।'

'না,' উঠলো মাসুদ রানা। 'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার গিবসন। ইউ হ্যাভ বীন ভেরি হেলপফুল।'

মিষ্টি হাসি ফুটলো লবিয়িস্টের ঠোঁটে। 'মাই প্লেযার।'

জেনারেল হিলিংটনের নাম্বারে ফোন করলো রানা ডালাস এয়ারপোর্ট থেকে।

'লোকটা লবিয়িস্ট,' বললো ও। 'হ্যারি গিবসন। আর একজন বাকি। তাকে ট্রেস করতে যাচ্ছি।'

একটা গভীর নিঃশ্বাস ছাড়লেন জেনারেল। 'সত্যিই। ইউ হ্যাভ ডান অ্যান এক্সেলেন্ট জব, মেজর।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, জেনারেল।'

লবিয়িস্টের নাম ঢাকায় পাঠিয়ে দিলো মাসুদ রানা। রওনা হয়ে গেল শেষ প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধানে।

*

ডেনি'স 'পি' স্ট্রীট স্টেশনে পৌঁছে একটু অবাকই হলো হ্যারি গিবসন। এর আগে একসাথে এতো মানুষ দেখেনি সে এখানে কখনও। বয়স্করা পরে আছে কনজারভেটিভ স্যুট। অল্প বয়সীরা লেভিস, ব্লেজার এবং বুট। এছাড়া আরও একদল আছে, লম্বা-চওড়া, বিশাল বুকের ছাতি। কালো লেদার স্যুট পরেছে এরা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এরা সবাই সশস্ত্র। এদের কাজ, এই বারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। প্রাইভেট ক্যাডার।

ভেতরটা একবার চক্কর দিয়ে এলো হ্যারি গিবসন, সবগুলো টেবিলে নজর বোলালো। ছেলেটি এখনও আসেনি হয়তো, তাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো সে। বার কাউন্টারে এসে বসলো নিরিবিলিতে। ভেতরে বেশ গরম। বেশিক্ষণ ওখানে থাকলে নির্ঘাত ঘেমে যাবে গিবসন, চেহারা খারাপ হয়ে যাবে। হয়তো তাতে বাজে প্রতিক্রিয়া হবে ছেলেটির মনে। শত হলেও প্রথম রাত, সঙ্গীকে প্রভাবিত না করতে পারলে চলবে কেন?

হুইস্কির অর্ডার দিলো গিবসন। তার চারদিকে নিচু গলায় গুজ গুজ ফিস ফিস চলছে। পরিচিত আলোচনা, বিষয়বস্তু আদিম। ডেনি'স আসলে এস অ্যাণ্ড এম-স্ট্যাণ্ড অ্যাণ্ড মডেল বার, শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য। মেয়েদের এই বারে প্রবেশাধিকার নেই। সুন্দর সুন্দর ছেলে ছোকরারা যথাসম্ভব আকর্ষণীয় পোজ নিয়ে দাঁড়াবে। অপেক্ষাকৃত বয়স্করা, ক্রেতা, ওর মধ্যে যাকে পছন্দ হবে তাকে বেছে নেবে।

রাত ঠিক একটায় বারে ঢুকলো ছেলেটা। দাঁড়ালো এসে গিবসনের পাশে। আগেরদিনের চাইতে আজ আরও সুন্দর লাগছে তাকে।

'গুড মর্নিং,' হাসলো গিবসন।

'গুড মর্নিং। সরি, দেরি করে ফেলেছি।'

'আমি মাইণ্ড করিনি। বসে বসে ভাবছিলাম তোমার কথা।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এনি ড্রিঙ্ক?'

'যদি তুমি সন্তুষ্ট হও।'

'আমাকে সন্তুষ্ট করতে তুমি আগ্রহী?'

তার চোখে চোখ রাখলো তরুণ। নিচু গলায় বললো, 'মনে হয়।'

'আমার সঙ্গে যেতে রাজি হবে?'

'হোয়াই নট?'

রক্ত গরম হয়ে উঠতে শুরু করলো গিবসনের। 'চলো তাহলে।'

'ড্রিঙ্ক শেষ না করেই?'

'ওহ, সরি। শেষ করো ওটা।'

পাঁচ মিনিট পর উঠলো দু'জনে, পা বাড়ালো দরজার দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, হঠাৎ যেন পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো দুই যুবক। ওদের পথরোধ করে দাঁড়ালো। থাবা দিয়ে গিবসনের সঙ্গীর কলার চেপে ধরলো তাদের একজন।

arnsumon@yahoo.com www.murchona.com

'এই যে, কুত্তার বাচ্চা! আমার টাকা দিচ্ছিস না কেন?'

'কিসের টাকা?' থতমত খেয়ে গেল তরুণ। 'কে আপনি?'

'তাই নাকি? চিনতেই পারছো না?' দরজার দিকে ঠেলা দিলো তাকে যুবক। 'চল্! আজ তোর একদিন কি…।' ছেলেটিকে প্রায় ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে গেল সে।

হতবুদ্ধি গিবসন দাঁড়িয়েই থাকলো। রাগে ফুঁসছে। সঙ্গী অপহরণ-কারীদের একজন দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ইচ্ছে হলো আচ্ছাসে ধোলাই দেয় ব্যাটাকে। কিন্তু তার ফিগার দেখে সাহসে কুলালো না। বিস্মিত হয়ে এদিক ওদিক তাকালো গিবসন, কালো পোশাকধারীদের কেউ-ই নেই। কি এক যাদুমন্ত্রবলে উধাও হয়ে গেছে। অথচ হলপ করে বলতে পারে সে, ওরা আসন ছাড়ার সময়ও ছিলো লোকগুলো।

ওর মনের অবস্থা টের পেলো যুবক। সহানুভূতির হাসি ফুটলো তার মুখে। 'সঙ্গী নির্বাচনে আরও সতর্ক হওয়া উচিত আপনার, স্যার,' বললো সে।

এবার ভালো করে যুবকের দিকে তাকালো গিবসন। মন্দ নয়, এর চেহারার মধ্যেও বেশ একটা আকর্ষণ আছে। 'তোমাকে নির্বাচন করলে কি ভুল হবে?'

'আশা করি হবে না।'

এবার হাসি ফুটলো গিবসনের মুখেও। মুহূর্তে পানি হয়ে গেছে রাগ। রাতটা তাহলে একেবারে বৃথা যাবে না। হাত বাড়ালো সে করমর্দনের জন্যে। 'আমার নাম জেম। তুমি?'

'ডেভিড।'

'আজ রাতে কোনো বিশেষ প্ল্যান আছে তোমার?'

'দ্যাট'স আপ টু ইউ।'

'আমরা নিশ্চই একসাথে রাতটা কাটাতে পারি, কি বলো?'

'না পারার কোনো কারণ নেই,' আবার হাসলো যুবক।

'রেট কতো চাই?'

'তোমাকে পছন্দ হয়েছে আমার। শুধু তোমার জন্যে, দু'শো ডলার।'

'আমি রাজি।'

আধঘণ্টা পর ট্যাক্সি চেপে জেফারসন স্ট্রীটে পৌঁছুলো তারা দু'জনে। সিঁড়ি ভেঙে একটা পুরানো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের তিনতলায় উঠে এলো। পকেট থেকে চাবি বের করে ফ্ল্যাটের দরজা খুললো যুবক, হাসিমুখে গিবসনকে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত করলো।

লিভিংরুমটা খুবই ছোট, পছন্দ হলো না গিবসনের। 'এরচে' কোনো ভালো হোটেলে গেলে হতো না?'

'এ আমার এক বন্ধুর বাসা,' হাসলো ডেভিড। 'জায়গায় কি আসে যায়, আমাদের দরকার বিছানা। কি বলো?'

'ঠিক বলেছো।'

'তুমি তাহলে কাপড় ছাড়ো। আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি।'

পিছন থেকে যুবকের দিকে চেয়ে থাকলো লবিয়িস্ট। আদিম প্রবৃত্তি একটু একটু করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ভেতরে। তাড়াতাড়ি বেডরুমে চলে এলো সে। কাপড় ছাড়লো, সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উঠে পড়লো বিছানায়।

মিনিট দুয়েক পর বাথরুমের দরজা খোলার আওয়াজ এলো কানে। হাঁক ছাড়লো সে, 'কই, জলদি এসো।'

'আসছি।' বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো ডেভিড।

'কি হলো,' অস্থির হয়ে উঠেছে হ্যারি গিবসন। 'এখনও কাপড় ছাড়োনি?'

'এই তো,' বললো ডেভিড। পরমুহূর্তে গিবসনের বুকের বাঁ দিকে তীক্ষ্ণধার একটা ছোরা আমূল বসিয়ে দিলো।

চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো গিবসনের। বহু কষ্টে একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পারলো সে। 'হোয়াট…?' একসাথে সাতটা সূর্য ঝলসে উঠলো মাথার মধ্যে।

বারো

বুদাপেস্ট। হাঙ্গেরি। মালেভ এয়ারলাইনসের এয়ারবাস প্যারিস থেকে বুদাপেস্ট পৌঁছুতে সময় নিলো দু'ঘণ্টা পাঁচ মিনিট। শিডিউল টাইম একটুও এদিক ওদিক হয়নি, নির্ধারিত সময়েই অবতরণ করেছে বিমানটি।

ট্যাক্সি ডাকলো মাসুদ রানা। চললো বুদাপেস্ট কেন্দ্রের দিকে। পথের দু'পাশে দেখতে দেখতে এগোলো ও। ক্লাসিক আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের প্রাচীন সব ইমারত, সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার। অন্তত গঠন দেখে তাই মনে হয়। কুডলফ-কী পেরোবার সময় পার্লামেন্ট হাউসটা চোখে পড়লো ওর-নিও গথিক কাঠামো বিশাল ভবনটির। এরপরই দূর থেকে আকাশের পটভূমিতে ক্যাসল হিলের চূড়োয় দাঁড়িয়ে থাকা রাজকীয় প্রাসাদ চোখে পড়লো। মুগ্ধ হলো মাসুদ রানা। চেয়ে থাকার মতো একটা দৃশ্য।

নির্দেশমতো হোটেল ডুনা ইন্টারকন্টিনেন্টালের ভেতরে ঢুকে পড়লো ট্যাক্সি। ও এগোতেই 'সিয়িং আই' ফটো সেল চালিত কাঁচের বড় দুই পাল্লার গেটটা নিঃশব্দে সরে গেল দু'পাশে। সোজা কনশিয়ার্যের ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালো রানা।

'এক্সকিউজ মি,' বললো ও। 'ডু ইউ স্পীক ইংলিশ?'

মাথা দোলালো কনশিয়ার্য। 'ইয়েস। হাউ ক্যান আই হেলপ্ ইউ?'

প্রথমে ওয়াশিংটন থেকে টেলিফোনে বুক করা নিজের স্যুইটটা কনফার্ম করলো ও। তারপর কাজের কথা পাড়লো। 'আমার এক বন্ধু ক'দিন আগে বুদাপেস্ট ঘুরে গেছেন। তার মুখে শুনেছি এখানে কোথায় নাকি চমৎকার একটা কার্নিভাল শো করছে। আমিও ভাবছি দেখতে যাবো ওদের শো। কোথায় আছে ওটা বলতে পারেন?'

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

কপাল কোঁচকালো লোকটা। 'কার্নিভাল?' ড্রয়ার থেকে একটা চটি বই বের করে নজর বোলাতে লাগলো। 'এক মিনিট। দেখছি আমি।' এক এক করে প্রায় সবগুলো পাতাই উল্টে গেল সে। চিন্তিত স্বরে বললো, 'এখানে তো দেখছি কেবল একটা অপেরা, কয়েকটা থিয়েটার প্রোডাকশন, ব্যালে, নাইট অ্যাণ্ড ডে সিটি ট্যুর, এক্সকারশন...।' চোখ তুললো কনশিয়ার্য। 'আমি দুঃখিত। এখানে কোনো কার্নিভালের কথা লেখা নেই। আমার মনে হয় আর কোথাও দেখেছেন আপনার বন্ধু, বুদাপেস্টে নয়। হলে এই গাইডে তার নাম থাকতো। কারেন্ট গাইড এটা, গতকালকের।'

'আচ্ছা?' চিন্তিত হলো রানাও।

'এই তো,' গাইডটা এগিয়ে দিলো কনশিয়ার্য। 'আপনি নিজেই চেক্ করে দেখুন।'

আগ্রহভরে বইটা নিলো মাসুদ রানা। সাথে সাথে ভিরমি খাওয়ার দশা হলো, দুর্বোধ্য হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় ছাপা। গাইডটা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিলো ও। 'না, ঠিক আছে। আপনার কথাই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে কাদের সাহায্য নিলে কাজ হতে পারে?'

'মনে হয় মিনিস্ট্রি অভ কালচারে খোঁজ নেয়াই ভালো হবে। হাজার হোক, কালচারাল ব্যাপার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

ঘড়ি দেখলো মাসুদ রানা। এয়ারপোর্টে নেমেই এদের স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিলো ও কাঁটা। একটা বাজে। অর্থাৎ লাঞ্চ আওয়ার চলছে এখন। নিজের স্যুইটে চলে এলো রানা। শাওয়ার সেরে আধঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লো আবার।

ঠিক দুটোয় মিনিস্ট্রি অভ কালচারের অফিসে দেখা গেল ওকে, এক জুনিয়র এক্সিকিউটিভের টেবিলে। 'বুদাপেস্টে এ মুহূর্তে কোনো কার্নিভাল শো করছে না। আমার মনে হয় আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই ভুল করেছেন,' বললো অফিসার।

'না। ও ভুল করার লোক নয়।'

'তাহলে আমি দুঃখিত। আপনাকে বোধহয় সাহায্য করতে পারলাম না।'

কয়েক সেকেণ্ড ভাবলো মাসুদ রানা। 'আচ্ছা, ধরুন, হাঙ্গেরির ভেতরেই, এক শহর থেকে অন্য শহরে কার্নিভাল বা সার্কাস শো ট্রান্সফার করতে চাই আমি, সেক্ষেত্রে কোনো সরকারী অনুমতি নিতে হবে?'

'অবশ্যই।'

'কোন ডিপার্টমেন্ট ইস্যু করবে তা?'

'বুদাপেস্ট লাইসেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন,' বলতে বলতে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অফিসারের। 'ভালোই পয়েন্ট আউট করেছেন। আশা করি ওরাই আপনার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে।'

'অফিসটা কোথায়?'

'বুদা। মিডিয়াভেল সিটি ওয়ালের কাছে।'

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লো রানা। লাইসেন্স অফিসটা খুঁজে পেতে

কোনো অসুবিধে হলো না। প্রায় আধঘণ্টা বসে থাকার পর নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসে যাওয়ার অনুমতি মিললো ওর।

রানাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন বয়স্ক নির্বাহী। নাকের ডগায় ঝোলানো সরু সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছে, এমন একটা ভঙ্গি করলো মাসুদ রানা। 'আসলে ছেলেকে নিয়ে হাঙ্গেরি বেড়াতে এসেছি আমি। ছেলেটা অসুস্থ, একমাত্র ছেলে আমার। উঠেছি তুনা ইন্টারকনে। ওখানে কার কাছে ছেলেটা শুনেছে যে এখানে কোথায় নাকি একটা কার্নিভাল শো চলছে। আমার কাছ থেকে কথা আদায়...' নির্বাহীকে চোখ কোঁচকাতে দেখে ব্রেক কষলো রানা।

'খুব বেশি কথা বলেন আপনি। আসল কথা বলুন। কি জানতে এসেছেন?'

'ওয়েল, অনেককে জিজ্ঞেস করেছি আমি কার্নিভালটা এ মুহূর্তে কোথায় আছে। কিন্তু কেউ বলতে পারলো না। শেষে হোটেলের কনশিয়ার্য আপনার কাছে আসার পরামর্শ দিলো। বললো, ওটা কোথায় আছে তা একমাত্র আপনিই জানবেন।'

'সেটা প্রথমে বললেই হতো।' বাযার টিপলেন নির্বাহী। এক সেক্রেটারি এসে ঢুকলো ভেতরে। লোকটির সাথে দেশী ভাষায় দ্রুত কথা বললেন তিনি কয়েক মুহূর্ত। মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল সেক্রেটারি। দু মিনিট পর আবার এলো সে একটা ফাইল নিয়ে।

ফাইলে চোখ বুলিয়ে রানাকে বললেন অফিসার, 'গত তিনমাসে কার্নিভাল ট্রান্সফারের দুটো পারমিট ইস্যু করেছি আমরা। তার একটা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেছে দিন পনেরো চলার পরই।'

'অন্যটা কোথায় আছে?'

'সপরন। জার্মান ফ্রন্টিয়ারের কাছে, ছোট একটা টাউন।'

'ওটার মালিকের নামটা বলবেন দয়া করে?'

আবার ফাইলের দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। 'ভিলফোর্ট। লারস ভিলফোর্ট।'

নিয়তি হাতের মুঠোয় এসে ধরা দিয়েছে বলে আনন্দের অন্ত নেই লারস ভিলফোর্টের। ছোটকাল থেকেই অনেক, অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন ছিলো তার, সে স্বপ্ন এতোদিন পর সফল হতে চলেছে। সন্দেহ নেই, কিছুদিনের মধ্যেই দুনিয়ার সৌভাগ্যবান সব ধনীদের তালিকায় লারস ভিলফোর্ট নামটিও যোগ হতে যাচ্ছে।

খুব লম্বা চওড়া মানুষ সে। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, ওজন তিন শো পাউণ্ড। সৌখিন মানুষ। ডায়মণ্ড বসানো হাতঘড়ি, অনেকগুলো ডায়মণ্ড রিং এবং ভারি, চওড়া সোনার ব্রেসলেট পরে থাকে সবসময়। কার্নিভালের মালিক হয়েছে সে পৈত্রিক সূত্রে। পিতার মৃত্যুর পর ব্যবসার হাল ধরে ভিলফোর্ট। গড়ে-পিটে অনেক বড় করেছে সে তাকে গত ছয় বছরে। ইউরোপের সবচেয়ে বড় এবং সেরা কার্নিভালে পরিণত করার ইচ্ছে তার ওটাকে। তার দিন-রাতের স্বপ্ন পি.টি. বারনামের মতো

কার্নিভালের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে লারস ভিলফোর্ট যুগ যুগ ধরে।

এ মুহূর্তে তার প্রধান আকর্ষণগুলোর মধ্যে আছে মোটা মহিলা; প্রায় সাড়ে পাঁচ মণ ওজন তার, সারা দেহে উল্কি আঁকা এক চেক, একজোড়া থাই যমজ কিশোরী এবং একশো ত্রিশ বছর বয়স্ক থুত্থুরে এক চীনা বুড়ি। যার নাম হাজার বছরের পুরানো মমি। দর্শকদের কাছে বুড়িকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় বলা হয়, মিশরের প্রাচীন এক সমাধিক্ষেত্র থেকে তুলে আনা হয়েছে তাকে। এছাড়া আছে এক মালয়েশিয়ান জাদুকর। দর্শকদের সামনে তিন ফুট লম্বা, ধারালো তরবারি গলার মধ্যে প্রায় পুরোটা ঢুকিয়ে দেয়া যার কাজ। আর স্প্যানিশ সুন্দরী, মারিয়া। বিষধর সাপের যতোরকম শ্বাসরুদ্ধকর খেলা দেখায়। দুর্দান্ত সাহসী মেয়েটি, কোনো সাপের বিষদাঁত সে ভাঙতে রাজি নয়। বুনোগুলোকে পোষ মানাতে বদ্ধপরিকর। মারিয়ার বিশ্বাস, একদিন ঠিকই পোষ মানবে ওরা এই অবস্থাতেই।

এই জিনিসটাকে খুব ভয় লারস ভিলফোর্টের। সাপের খাঁচার ধারে কাছেও ঘেঁষে না সে। প্রথম প্রথম মারিয়াকে এর বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করার অনেক চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু কথা শোনে না মেয়েটি। হেসে উড়িয়ে দেয়। ভিলফোর্ট রেগে গেলে অভিমান করে, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়। তখন আবার তাকেই তেলাতে হয় গিয়ে। কখনও এক রাত, আবার কখনও বা পরপর দু'রাত ব্যয় করতে হয় মেয়েটির পিছনে।

মোটামুটি এই হচ্ছে লারস ভিলফোর্টের কার্নিভালের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এগুলোই দেখায় সে দর্শকদের।

ক'দিন আগে খবর পায় সে, সুইটজারল্যাণ্ডে এক এসকেপ আর্টিস্ট আছে, চমৎকার খেলা দেখায়। হাত-পা চোখ কষে বেঁধে তাকে লোহার সিন্দুকে পুরে পানিতে ফেলে দিতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে মুক্ত করে উঠে আসবে জলজ্যান্ত মানুষটি, সবার চোখের সামনে'। তার এক বন্ধু জুরিখ থেকে খবরটা দিয়েছিলো টেলিফোনে।

খুশিমনে সুইটজারল্যাণ্ড ছোটে ভিলফোর্ট আর্টিস্টটিকে কব্জা করার জন্যে। কিন্তু কাজ হয়নি। ওখানে গিয়ে জানা গেল, সিন্দুক থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পুরো আধঘণ্টা সময় লাগে আর্টিস্টের। হতাশ হয় লারস ভিলফোর্ট। এক খেলা দেখতে এতোক্ষণ পানির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে দর্শক? অসম্ভব! চলবে না।

দেশে ফেরার উদ্যোগ নেয় সে। ফ্লাইটের অনেক দেরি, সময়টা কি করে কাটানো যায়, ভাবছিলো। হোটেলের রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করতে আলপস দেখে আসার পরামর্শ দেয় সে।

অন্যান্য সফর সঙ্গীদের মতো প্রথমে সে-ও ব্যাপারটাকে বিমান দুর্ঘটনা মনে করে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়, যদি কেউ বেঁচে থেকে থাকে, তার সাহায্যার্থে। কিন্তু সামনের ধ্বংসস্তূপ দেখে চোখ কপালে ওঠে ভিলফোর্টের, দেখামাত্রই জিনিসটাকে সনাক্ত করতে পারে সে।

ওটা ছিলো ফ্লাইং সসার, বা ইউএফও। খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার

বিভিন্ন অংশ। ওর মধ্যে প্রায় মানুষেরই মতো দেখতে, খাটো, অদ্ভুত দুটো দেহ পড়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে। মৃত। তাদের একটির আবার এক হাত নেই, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দেহ থেকে।

সঙ্গীরা সব জমে গেছে যে যার জায়গায়, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে সেদিকে। চেহারায় পরিষ্কার ভীতি তাদের। লারস ভিলফোর্ট কিন্তু ভয় পায়নি একেবারেই। বরং পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ধ্বংসস্তূপের দিকে। আগে এগুলোর কথা পত্র-পত্রিকায় অনেক পড়েছে সে, ছায়াছবিতেও দেখেছে। আজ দেখছে চোখের সামনে। ওটার সবচে' বড় খণ্ডটার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে। হঠাৎ মাটির দিকে চোখ পড়তেই জমে গেল ভিলফোর্ট।

পায়ের সামনেই পড়ে আছে সেই বিচ্ছিন্ন কাটা হাতটা–ভিন গ্রহবাসীর। ভালো করে ওটার ওপর চোখ বোলালো সে। বড়জোর দেড় ফুট লম্বা হবে। ছ'টা আঙুল আর দুটো বুড়ো আঙুল। কাটা জায়গাটায় রক্তের কোনো চিহ্নই নেই। বরং গাঢ় সবুজ রঙের কি যেন একটু একটু করে গড়িয়ে নামছে ভেতর থেকে।

কি করছে, ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগেই চট করে বসে পড়লো সে হাতটার পাশে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুড়ে নিলো ওটা, তারপর কনুইয়ের কাছে ভাঁজ করে আকারটা ছোট করে নিয়ে চালান করে দিলো কোটের ভেতরের পকেটে। বুকের ভেতরটা ভীষণভাবে লাফাতে শুরু করলো ভিলফোর্টের। এ মুহূর্তে এমন এক জিনিসের মালিক সে, যা পৃথিবীর আর কারও কাছে নেই, ভাবনাটা ঘন ঘন ঢোক গেলাচ্ছে তাকে। গরম করে তুলছে মাথার ভেতরটা।

একমাত্র মারিয়া বাদে আর সব আইটেমের কথা ভুলে গেছে সে। কোনও দরকার নেই মোটা মহিলা, থাই যমজ, হাজার বছরের পুরনো মমি বা আর সবের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলো সে, মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছে সে: লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন, আসুন, দেখুন। এমন শিহরণমূলক দৃশ্য জীবনেও দেখেনি কেউ, দেখার কল্পনাও করেনি। মাত্র পাঁচশো ফরিন্ট-এর বিনিময়ে দেখে যান...।

'কি এটা?' প্রশ্ন করলো এক মুগ্ধ দর্শক।

'একটা কাটা হাত।' লারস ভিলফোর্টের উত্তর।

'কার? কিসের?'

'আ ক্রিয়েচার ফ্রম আননোন আউটার স্পেস।'

এক ফটোগ্রাফার হাত ধরে টান দিতেই স্বপ্নটা ভেঙে গেল তার। ইউএফও-টার সামনে দাঁড় করিয়ে ওদের কতো যে ছবি তুললো লোকটা, খেয়াল নেই। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কাটলো পুরোটা সময়। পরদিনই দেশে ফিরলো লারস ভিলফোর্ট। গভীর রাতে মারিয়াকে ঘুম পাড়িয়ে জিনিসটা বের করলো। একটা কাঁচের বাক্স বানাতে হবে, ভাবলো সে, তার মধ্যে রাখবে হাতটা।

এটা নিয়ে সারা ইউরোপ ঘুরবে সে। সারা পৃথিবী ঘুরবে। সবখানে শো করবে। বিজ্ঞানীদের দেখাবে এটা। যে-সব দেশে যাবে কার্নিভাল, সে-সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদেরকেও দেখাবে। তার সঙ্গে থাকবে কেবল মারিয়া। দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াবে ওরা, দু'হাতে টাকা রোজগার করবে

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

তাঁবুর সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতে উঠে এলো লারস ভিলফোর্ট। ফ্ল্যাপ সরিয়ে উঁকি দিলো। ঘুম পুরো হয়নি তার, যদিও দুপুর হয়ে এসেছে প্রায়। আসলে শুয়েছে সে ভোরের দিকে।

অপরিচিত এক লোক এসে দাঁড়ালো সামনে। 'মিস্টার ভিলফোর্ট?'

চোখ কচলালো সে। 'হ্যাঁ। কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'কিছুদিন আগে সুইটজারল্যাণ্ড গিয়েছিলেন আপনি, আই বিলীভ?'

ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলো সে। পলকে ছুটে গেল ঘুমের রেশ। আনটেনডর্ফে হাত সাফাইয়ের ব্যাপারটা কেউ দেখে ফেলেছিলো নাকি? 'কেন, কি হয়েছে?'

'গিয়েছিলেন, না?'

'হ্যাঁ,' সতর্কতার সাথে বললো সে।

মস্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো মাসুদ রানা। কাজটা শেষ করতে পেরেছে ও তাহলে। এই লোক শেষ সাক্ষী। অসম্ভবরকম কঠিন একটা দায়িত্ব সম্ভব নয় সম্ভব নয় করেও শেষ হলো শেষ পর্যন্ত। কাঁধ থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেল রানার। নিষ্কৃতি পেয়েছে ও।

'কি ব্যাপার, কিছু বলছেন না যে?' বললো ভিলফোর্ট।

একে আর প্রশ্ন করার কিছু নেই, ভাবলো রানা, পরিচয় বের করে নিশ্চিত হওয়ার কথা ছিলো, হওয়া গেছে। কিন্তু একেবারে কিছু না বলে এড়ানো সম্ভব নয়। তাই বললো, 'আমি রিপোর্টার। ওইদিন আপনারা যারা ইউএফও ক্র্যাশ দেখেছেন, তাদের প্রত্যেকের ইন্টারভিউ যোগাড় করছি।'

'ভেরি গুড। আসুন, ভেতরে আসুন।'

মুখোমুখি বসলো দু'জনে। বসেই মুখ ছোটালো ভিলফোর্ট। 'আমাদের ভেতর ইটালির অরভিয়েটোর এক প্রিস্ট ছিলেন, একজন জার্মান প্রফেসর ছিলেন, মিউনিখ থাকেন। কেমিস্ট্রির প্রফেসর। আরও ছিলো রাশান এক মেয়ে, কিয়েভে চাকরি করে, লাইব্রেরিয়ান। টেক্সাসের এক র‍্যাঞ্চার, এক কানাডিয়ান ব্যাঙ্কার, ফোর্ট স্মিথের। আর একজন লবিস্ট, ওয়াশিংটন থাকে। আমরা সবাই যখন আনটেনডর্ফ...'

হাঁ করে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা। ইয়াল্লা! ভাবছে ও, প্রথমেই কেন এই লোকটার খোঁজ পেলাম না? তাহলে অনেক আগেই কাজ সেরে ফিরে যেতে পারতো ও। 'আপনার স্মরণশক্তি তো দারুণ!' নিখাদ প্রশংসার সুরে বললো রানা।

'ধন্যবাদ,' হাসলো ভিলফোর্ট। 'ও, আরও একজন ছিলো, একটা মেয়ে। খুব সুন্দরী।'

'রাশান মেয়েটা।'

'না না, অন্য আরেকটা মেয়ে। বাঙ্গ। সাদা পোশাক ছিলো পরনে।'

সোজা হয়ে বসলো মাসুদ রানা। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ। এতোদিন জেনে এসেছে মোট দশজন ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেছে। অথচ এ লোক যা বলছে তাতে দশ নয়, হয় এগারোজন। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? বাসে সাতজন যাত্রী আর

ড্রাইভার মিলিয়ে আটজন, আর ওদিকে মার্টিন গুডউইল আর হ্যানস হুবার্ট, ট্রাক ড্রাইভার। দ্বিতীয় মেয়েটি কোত্থেকে এলো তাহলে? 'আপনার কো ভুল হচ্ছে না তো, মিস্টার ভিলফোর্ট? আমি জানি মেয়ে ছিলো ওখা একজনই।'

'না,' জোর দিয়ে বললো সে। 'দু'জন ছিলো।'

'তা কি করে হয়? আমি...'

ওকে বাধা দিয়ে বললো ভিলফোর্ট, 'হঠাৎ এক ফটোগ্রাফার এসে য আমাদের ছবি তুলতে আরম্ভ করলো সসারটার সামনে দাঁড় করিয়ে, দ্বিতীয় মেয়ে তখন ঠিক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো। মেয়েটি ছিলো, কি বলবো, অদ্ভুত সুন্দ তবে একটা মজার ব্যাপার হলো, তাকে আমি বাসে দেখিনি। খুব সম্ভব, আশপা কোথাও ছিলো সে, আমাদেরই মতো দুর্ঘটনা দেখতে এসেছিলো। তার চেহারা বেশ ফ্যাকাসে মনে হয়েছে আমার। অসুস্থ ছিলো হয়তো।'

'পরে যখন আবার বাসে উঠলেন, দেখেছিলেন মেয়েটিকে?'

'না, দেখিনি। আজ আ ম টার অভ ফ্যাক্ট, ওদিকে লক্ষ্যই ছিলো না আমা সসারের চিন্তায় মশগুল ছিলাম।'

কেমন হলো? এর কথা শুনে তো মনে হয় ব্যাপারটা সত্যিই। চিন্তিত ম উঠলো মাসুদ রানা। জানার চেষ্টা করতে হবে আসল ঘটনা। ক্লান্তি লাগলো ওর হ করেই। তার মানে আবার দৌড়াও? 'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার ভিলফোর্ট।'

'মাই প্লেজার।'

'গুড লাক।'

হাসলো ভিলফোর্ট। 'ধন্যবাদ।' লাক উইশ করার কোনো প্রয়োজন নেই, ম মনে বললো, ওটা এখন আমার হাতের মুঠোয়।

ঢাকা। বিসিআই। টেবিলের ওপর অসংখ্য মেসেজের স্তূপ নিয়ে হতভম্বের মত বসে আছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। টেবিলের ওপাশে অ্যাটেনশনে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সোহেল আহমেদ। দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে ফর্সা মুখটা কালো হ গেছে ওর।

'তারপর?' বলে উঠলেন রাহাত খান।

'এ নিয়ে গত ক'দিনে বোধহয় পঞ্চাশবার যোগাযোগ করেছি আমি এনএস হেডকোয়ার্টারে, স্যার। প্রত্যেকবারই জেনারেল হিলিংটন অফিসে নেই ব জানিয়েছে ওরা। তাঁর বাসা থেকেও একই উত্তর পেয়েছি।'

'ওদিকে প্রায় সব ক'টি লোক খুন হয়ে গেল,' বিড়বিড় করে বললেন বৃদ্ধ।

'জ্বি, স্যার। নয় জনই। আর মাত্র একজন বাকি।'

'ঠিক আছে। কম্যুনিকেশন সেকশনকে বলো, ওয়াশিংটন বিসিআইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে। দশ মিনিটের মধ্যে লাইন চাই আমি।'

'জ্বি।'

এক এক করে মূল্যবান চারটে ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, যোগাযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হলো কম্যুনিকেশন সেকশন। কেবল ওয়াশিংটনই নয়, আমেরিকা এব

anisumon@yahoo.com www.murchona.com

ইউরোপের যতোগুলো বিসিআই ও রানা এজেন্সির শাখা আছে, তার কোনটির সাথেই যোগাযোগ করা গেল না। সবগুলোর লাইন ডেড।

সোহেলকে কয়েকটি ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন রাহাত খান।

'নাম লারস ভিলফোর্ট। একটা কার্নিভালের মালিক। এ মুহূর্তে সপরনে আছে সে, জার্মান-হাঙ্গেরি ফ্রন্টিয়ারের কাছে।'

'এই লোকই তো শেষ সাক্ষী, তাই না, মেজর?' জানতে চাইলেন জেনারেল।

না, জেনারেল, বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো রানা। বললো, 'হ্যাঁ, জেনারেল।' একটু ইতস্তত করলো ও, না কি জানি ভয়েই সেরে আরও একজন সম্ভবত আছে? নাহ্, থাক আপাতত। আগে ভালো করে খোঁজ নিতে হবে, নিশ্চিত হতে হবে।

'থ্যাঙ্ক ইউ ভে-এ-রি মাচ, মেজর। ওয়েল ডান।'

গভীর রাতে এলো ওরা। দুজন। নিঃশব্দে। তাঁবুর ভেতর ঘুমে অচেতন লারস ভিলফোর্ট। স্বপ্ন দেখছে সে। সাদা রঙের বিরাট এক তাঁবুর নিচে নতুন জিনিস দেখার জন্যে জড়ো হয়েছে কয়েকশো নারী-পুরুষ। পাঁচশো ফরিন্ট দামের টিকেট কিনেছে সবাই। তাদের দিকে তাকিয়ে বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে ভিলফোর্টের। বাইরে আরও প্রচুর দর্শনার্থী রয়েছে। লম্বা লাইন পড়ে আছে বক্স অফিসের সামনে–রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে টিকেট কেনা নিয়ে।

পাল্টে গেল হঠাৎ স্বপ্নটা। নির্জন একটা দ্বীপে এসে পড়েছে সে আর মারিয়া। আর কেউ নেই সেখানে, শুধু ওরা দু'জন। মুখে এক টুকরো মোহনীয় হাসি ধরে ওর দিকে এগিয়ে আসছে মেয়েটি দু'হাত বাড়িয়ে। সে-ও এগোলো। কাছে আসতেই জড়িয়ে ধরলো মারিয়াকে। সরু, ঠাণ্ডা কিছু একটা জড়িয়ে ধরেছে সে–টের পেতেই ঘুমটা আচমকা ভেঙে গেল।

চোখ মেললো লারস ভিলফোর্ট। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠলো ভয়ে, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ছোবল হানলো বিষধর কেউটে। আগের মতোই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ওরা দু'জন। মিশে গেল অন্ধকারে। সকালে লারস ভিলফোর্টকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। সারা দেহ নীল হয়ে গেছে বিষে। ওদিকে মারিয়ার বিষধর সাপের খাঁচার দরজা খোলা–বেরিয়ে গেছে সব সাপ কিভাবে যেন।

লাল টেলিফোনটা হাতের কাছে টেনে নিলেন জেনারেল রিলিংটন। সময় নিয়ে ধীরে ধীরে ডিজিটগুলো টিপলেন। দু'বার রিং হলো ও প্রান্তে, তারপরই রিসিভার তোলার আওয়াজ।

'কোবরা।'

'রিলিংটন। ফাইন্যাল রিপোর্ট করেছে মেজর রানা।'

'এক্সেলেন্ট। তারপর?' বললো কোবরা।

'সবার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থাও কমপ্লিট।'

'গুড। এবার বাকিটাও সেরে ফেলুন।'

'শিওর।'

ফ্ল্যাশ মেসেজ
নোভা রেড আলট্রা
এনএসএ টু ডেপুটি ডিরেক্টরস:
সাইফার, এমআই-সিক্স, জিআরইউ, সিআইএ
এসপিওনাজ অ্যাবটেইলাঙ, কমসেক,
ডিসিআই, সিজিএইচ কিউ বিএফডি
সাবজেক্ট: অপারেশন ডুমসডে
ইলেভেন, মেজর মাসুদ রানা–বিসিআই
এণ্ড অভ মেসেজ

www.murchona.com

প্রলয়সঙ্কেত-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২

এক

যতোই ভাবছে মাসুদ রানা এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবো না, ততোই পেয়ে বসছে ভাবনাটা। সত্যিই কি এপ্রায়োজন ছিলো ওখানে? মেয়ে দু'জন ছিলো? কিন্তু কই, আর কেউ তো উল্লেখ করলো না দ্বিতীয় মেয়েটির কথা। কেন করলো না? বাস কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে জেনেছে রানা, সেদিন যাত্রী ছিলো সাতজন। তাদের একজন মেয়ে। অর্থাৎ ড্রাইভারসহ মোট আটজন। আর ওদিকে ফটোগ্রাফার মার্টিন গুডউইল এবং গ্যারেজ মালিক হ্যান্স হুবার্ট।

তাহলে? তাহলে নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে লারস ভিলফোর্টের। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এ না হয়েই যায় না। ধারণাটা মেনে নেয়া গেলে আশ্বস্ত হতে পারতো মাসুদ রানা। কিন্তু পারছে না। মনটা খচ খচ করছে। ওর দায়িত্ববোধ, সহজাত ইনট্যুইশন এতো সহজে রেহাই দিতে রাজি নয় ওকে। বরং মনে হলো, ভিলফোর্টের কথাটা উড়িয়ে দেয়া বোকামি হবে।

আচমকা একটা ঝাঁকি খেয়ে সিধে হয়ে বসলো মাসুদ রানা। এ সেই মেয়েটি নয়তো? গত ক'দিন ধরে যে মেয়েটি…। কিন্তু তা কি করে হয়? তার সাথে এ ঘটনার যোগসূত্র কোথায়? কয়েক মুহূর্ত গভীর চিন্তায় ডুবে থাকলো ও। ঠিক আছে, ঠিক করলো রানা, খোঁজ নিতে হবে এ ব্যাপারে। আবার কথা বলতে হবে কার্ল ম্যালডেনের সাথে। প্রয়োজনে অন্য সবার সাথেও আলাপ করবে। এমনিতেই ঠিক করে রেখেছিলো রানা, কিভাবে তাদের নিবৃত্ত করেছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি, জানতে হবে। কিন্তু পেরে ওঠেনি সময়ের অভাবে। এক কাজে দুই কাজ সারা যাবে এবার।

জুরিখ পৌঁছুলো রানা অনেক রাতে। নিস্তেজ হয়ে পড়েছে কর্মচঞ্চল মহানগরী, গাড়িঘোড়ার আনাগোনা অনেক কমে গেছে। এলোমেলো হিমেল বাতাস। আকাশে ঝকমক করছে চতুর্দশী চাঁদ। এয়ারপোর্টের 'সুইস ট্যুর' থেকে একটা টয়োটা সেডান ভাড়া নিলো মাসুদ রানা, তারপর রওনা হলো ক্যাপেল। অন্ধকারে ডুবে আছে আলবিস চুড়োর সব ক'টি বাড়ি। সোজা ম্যালডেনের দোরগোড়ায় এসে থামলো ও। সশব্দে বন্ধ করলো গাড়ির দরজা। নিস্তব্ধ রাতে আওয়াজটা খুব জোরালো শোনালো। দরজায় নক করে অপেক্ষা করতে লাগলো রানা। এলোমেলো দমকা বাতাস গোঁ গোঁ শব্দ তুলছে থেকে থেকে। শীতে কাঁপছে ও। শিরশির করছে গায়ের মধ্যে।

আচমকা কানের পাশ দিয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল প্রকাণ্ড এক বাদুড়। কেঁপে উঠলো রানা, কেমন যেন করে উঠলো বুকের মধ্যে। তাড়াতাড়ি আবার নক

করলো। ভারি একজোড়া পায়ের আওয়াজ উঠলো এবার কাঠের ফ্লোরে। খুলে গেল দরজা। মিসেস ম্যালডেন দাঁড়িয়ে সামনে। পরনে রঙচটা ফ্ল্যানেলের রোব। আশ্চর্যরকম শুকনো লাগছে আজ মহিলার বড়সড় মুখটা। চেহারায় ঘুমের রেশমাত্র নেই। 'বিট্টি?' গলার স্বর ভাঙা ভাঙা।

একটু হাসির ভঙ্গি করলো রানা। 'মিসেস ম্যালডেন, আমাকে চিনতে পারছেন? ক'দিন আগে আপনার স্বামীর ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলাম?'

চেহারা থমথমে হয়ে উঠলো তার। 'বিট্টি।'

'এতো রাতে বিরক্ত করতে হলো বলে দুঃখিত। কিন্তু আপনার স্বামীর সাথে খুব জরুরী একটা বিষয়ে কথা বলতে হবে।'

একদৃষ্টে রানার মুখের দিকে চেয়ে আছে মহিলা। কথা বলছে না। অন্যমনা মনে হচ্ছে।

'মিসেস ম্যালডেন?' এক পা এগোলো রানা। কপালে সরু কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে।

'ও বেঁচে নেই।'

ভুল শুনেছে ভেবে আরও এক পা এগোলো ও। 'কি বললেন?'

'আমার স্বামী বেঁচে নেই। মারা গেছে।'

'আমি…আমি দুঃখিত, মিসেস ম্যালডেন।' বেকুব হয়ে গেল মাসুদ রানা। 'কবে মারা গেলেন? কিভাবে?'

'রোড অ্যাকসিডেন্ট। গাড়ি খাদে পড়ে গিয়েছিলো।' পরিষ্কার বোঝা যায় বহু কষ্টে কান্না ঠেকিয়ে রাখছে মহিলা। 'আপনি আসার পরদিন।'

'পরদিনই?'

'বিট্টি।'

'কিভাবে? কি করে ঘটলো অ্যাকসিডেন্ট?'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো মিসেস। 'জানি না। ডামবক্স পুলিস বলছে ও মাতাল ছিলো। ড্রাগস নিয়েছিলো।'

'ড্রাগস!' বিস্মিত হলো ও। ম্যালডেনের সেদিনের কথাগুলো রানার পরিষ্কার মনে আছে। আলসারের ভীষণ ব্যথা পেটে। ব্যথা কমানোর জন্যে ওষুধ পর্যন্ত দিচ্ছে না ডাক্তার–বলেছিলো লোকটা।

'জা।'

'মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে?'

'হয়েছে। দেহে ড্রাগসও পাওয়া গেছে সত্যি সত্যি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। আমার ম্যালডেন এ কাজ করতে পারে না। আপনি এলেন, আমারও সংসার ভাঙলো,' বলতে বলতে কেঁদে ফেললো মহিলা।

কি বলবে, কথা হাতড়াতে লাগলো রানা। কি উত্তর আছে এ অভিযোগের? 'আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, মিসেস ম্যালডেন। আসলে আমি…।' থেমে গেল ও। মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেছে দরজাটা। দাঁড়িয়ে আছে রানা। শীত লাগছে। কাঁপছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন নেই, ভাবছে ও। না…দু'জন। মার্টিন গুডউইলও নেই। আগুনে পুড়ে মারা গেছে। শর্ট সার্কিট? দ্রুত চিন্তা চলছে মাথার ভেতর।

সত্যিই শর্ট সার্কিটের ফলে আগুন লেগেছিলো, না অন্য কিছু? বহুদিন আগে, ও আর সোহেল যখন বিসিআইয়ের ট্রেইনি অফিসার, ক্লাস চলার সময় ইনস্ট্রাকটর প্রায়ই একটা ব্যাপারে সতর্ক করতেন ওদের। এখনও পরিষ্কার মনে আছে রানার কথাগুলো। একটা অক্ষরও ভোলেনি।

"এসপিওনাজের অভিধানে দৈব-সংযোগ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই," বলতেন ইনস্ট্রাকটর। "তেমন কিছুর আভাস পেলেই বুঝবে, সামনে বিপদ। কাজে নেমে যদি একই ব্যক্তির সাথে দু'বার দেখা হয়, অথবা যদি একই গাড়ি ঘুরে ফিরে দু'বার সামনে পড়ে, সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যাও, গা ঢাকা দাও।"

ঘুমে বিভোর ক্যাপেলে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকের কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে রানা এই মুহূর্তে—'সতর্ক হও, সামনে বিপদ! গা ঢাকা দাও!' হঠাৎ করেই সচকিত হলো ও। একছুটে গাড়িতে এসে উঠলো। তীক্ষ্ণ স্কিডের শব্দে ঘুমে গ্রামটা কাঁপিয়ে দিয়ে গাড়ি ঘোরালো, উড়ে চললো জুরিখের পথে।

শহরে ঢোকার মুখে প্রথম ফোন বুদের সামনে থামলো রানা আধ ঘণ্টা পর। প্রথম কলটা করলো গ্যারেজ মালিক, হ্যানস হুবার্টের বাসায়। তিনবার রিঙ হতে এক নারীকণ্ঠ উত্তর দিলো ও প্রান্তে।

'বিট্টি?'

'হের হ্যানস, প্লীজ।'

'ওহ্, সরি। ও একটা দুর্ঘটনায়...'

শক্ত হয়ে গেছে মাসুদ রানা। চেঁচিয়ে প্রশ্ন করলো, 'কি বলছেন?'

'হ্যানস বেঁচে নেই। গ্যারেজে এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে।'

'প্রফেসর অটো শিঙ্লার, প্লীজ।'

'আহ্! ল্যাবরেটরিতে এক বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে বেচারীর।'

'মাইকেল কেনের সাথে কথা বলতে চাই আমি।' বিরতিহীন বেজে চলেছে বিপদঘণ্টী। টিপ্ টিপ্ করছে বুক। মুখ, গলা সব শুকিয়ে গেছে।

'...শখের স্ট্যালিয়নটাই দায়ী ওর মৃত্যুর জন্যে। আহা! বড্ডো আদরের ঘোড়া ছিলো...'

'মিস্টার জন রীড, প্লীজ।'

'কে বলছেন?' জানতে চাইলো বাষ্পরুদ্ধ এক মেয়েকণ্ঠ।

'আমি একজন রিপোর্টার। ওয়াল স্ট্রীট...'

'আমার স্বামী...আমার স্বামী বেঁচে নেই। আত্মহত্যা করেছে সে।'

'ওলগা রেতজোতভনায়া।'

'হতভাগী মেয়ে। এই কাঁচা বয়সেই...'

দু'বার রিঙ হতে রিসিভার তুললো অরভিয়েটো হাসপাতালের ডিউটি নার্স। ভুরু

কুঁচকে ও প্রান্তের বক্তব্য শুনলো সে। পলকে করুণ হয়ে উঠলো চেহারা।

'দুঃখিত,' বললো নার্স। 'আপনি সাক্ষাৎ করে যাওয়ার পরদিন সকালে মৃত পাওয়া গেছে ফাদারকে। ঘুমের মধ্যেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন তিনি।'

'লারস ভিলফোর্ট।'

'মারা গেছেন ভদ্রলোক সাপের কামড়ে। বন্ধ হয়ে গেছে কার্নিভাল।'

'হ্যারি গিবসনকে চাইছি।' দম বন্ধ হয়ে আসছে মাসুদ রানার। ইস্পাতের তৈরি একটা হাত যেন শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে ও হৃৎপিণ্ডটা।

'সরি, স্যার। গিবসন বেঁচে নেই। ওর...'

দড়াম করে রিসিভার নামিয়ে রাখলো মাসুদ রানা। এতো শীতেও চিকন ঘামে ভরে উঠেছে কপাল, সারামুখ। মৃত! দশজন প্রত্যক্ষদর্শীর সবাই মৃত? যাদের ও নিজে সনাক্ত করেছে, সবাই খুন হয়ে গেছে তারা? তাহলে কি পরোক্ষে হলেও ওর-ই ঘাড়ে চাপানো হয়েছে এতগুলো মৃত্যুর দায়?

কাঁচের ছোট্ট বুদটার মধ্যে ঘুরে দাঁড়ালো মাসুদ রানা। চকিতে নজর বুলিয়ে নিলো হাইওয়ের এ-মাথা ও-মাথা। গাড়িঘোড়ার কোনও চিহ্ন নেই। মরা সাপের মতো গা বিছিয়ে নির্জীব পড়ে আছে চওড়া অ্যাসফল্টের সড়ক। কপালের দু'পাশের রগ দপ দপ করে লাফাতে লাগলো রানার। হঠাৎ করেই ব্যথা করতে শুরু করেছে মাথা।

পর পর দশটা মৃত্যু ঘটে গেল, অথচ ও টের পেলো না কেন? উত্তর পেতে দেরি হলো না। রানা স্থানত্যাগ করার পরই ঘটেছে হত্যাকাণ্ডগুলো, আগে নয়। এই জন্যেই জানতে পারেনি ও কিছু। না, ভুল হলো, অন্তত একজন ও স্থানত্যাগ করার আগেই নিহত হয়েছে একজন—মার্টিন গুডউইল। কিন্তু বুঝতে পারেনি রানা। ইশ্‌শ্!

হ্যানস হুবার্ট, কার্ল ম্যালডেন নিহত হয়েছে এ দেশেই। প্রফেসর অটো শিঙ্লার জার্মানিতে, ওলগা রেতজোতভনায়া রাশিয়ায়, হ্যারি গিবসন এবং মাইকেল কেন আমেরিকায়, জন রীড কানাডায়, মার্টিন গুডউইল ইংল্যাণ্ডে, ফাদার পিয়েত্রো বোঘিনি ইটালিতে এবং লারস ভিলফোর্ট হাঙ্গেরিতে খুন হয়েছে। কারা ঘটিয়েছে হত্যাকাণ্ডগুলো? এনএসএ? উঁহু, সম্ভব নয়। খুবই দ্রুত সারা হয়েছে এ কাজ, রানা টেলিফোনে নাম-ঠিকানা জানানোর প্রায় সাথে সাথেই।

জেনারেল হিলিংটনের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। লোকটা...এমন এক অন্যায় কাজে ওকে ব্যবহার করেছে লোকটা? একটা ইউএফও দুর্ঘটনা চাপা দেয়ার জন্যে এতগুলো খুন? এছাড়া আর কোনও পথ ছিলো না? দু'হাতে মাথার চুল মুঠো করে ধরলো মাসুদ রানা—ব্যথাটা ক্রমেই বাড়ছে। কেন খোঁজ নিলাম না? ভাবছে ও, কেন একবার খোঁজ নিলাম না কিভাবে নিরস্ত করা হচ্ছে লোকগুলোকে?

নিঃশ্বাস করতে এখনও কষ্ট হচ্ছে, এতগুলো মূল্যবান জীবন অকালে ঝরে গেল জেনারেল হিলিংটনের নির্দেশে। এবং নিঃসন্দেহে এ নোংরা কাজে আরও অনেকগুলো সিকিউরিটি এজেন্সিকে জড়িয়েছেন তিনি। আমেরিকার হত্যাকাণ্ড দুটো

ঘটিয়েছে খুব সম্ভব এনএসএ অথবা সি আইএ। এবং ইউরোপেরগুলো সংশ্লিষ্ট দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। তার মানে এটা একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। অজান্তেই তার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা। মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের কথা মনে পড়লো ওর। সবার নামই তো তাঁকে জানিয়েছে ও, তিনি কি নজর রেখেছিলেন মানুষগুলোর ওপর? রেখে থাকলে, তারা একের পর এক খুন হচ্ছে জেনেও কেন ওকে সতর্ক করেননি? নাকি…।

প্রচণ্ড রাগে আপাদমস্তক কাঁপছে ওর। কিন্তু এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, নিজেকে শোনালো রানা। মাথা গরম করে লাভ হবে না, বরং জটিল হয়ে উঠবে পরিস্থিতি। এ ষড়যন্ত্রের শেষ কোথায় জানতেই হবে ওকে।

হঠাৎ অন্য এক ভাবনা ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল মাসুদ রানাকে। গলাটা পরিষ্কার কানে বাজছে। '…সামনে বিপদ! গা ঢাকা দাও…গা ঢাকা দাও!' বুদ থেকে বেরিয়ে এলো ও। ঠিক, আত্মগোপন করতে হবে। হিলিংটনের নোংরা ষড়যন্ত্র শেষ হয়েছে কি না, জানে না রানা। এরকম পরিস্থিতিতে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। কোথায় যাওয়া যায়? নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবতে লাগলো ও, কোথায়?

এক মিনিটের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো মাসুদ রানা। ছুটলো এয়ারপোর্টের দিকে। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সুইটজারল্যাণ্ড ত্যাগ করলো। অন্ধকার রাতের আকাশ চিরে রোমের উদ্দেশে উড়ে চললো ওর বিমান।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে পা রেখেই আরেক ধাক্কা খেলো মাসুদ রানা। থেমে দাঁড়ালো দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে। বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ের দিকে চেয়ে থাকলো। মুহূর্তের জন্যে ভাবলো, হয়তো ভুল হচ্ছে ওর। কিন্তু পরক্ষণেই কথা বলে উঠলো মেয়েটি। এবং নিশ্চিত হলো রানা—এ মেয়ে সুজান। ওর আমেরিকান বান্ধবী। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রানা।

'সুজান!'

চরকির মতো ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটি। রানার মতো ঠিক একই প্রতিক্রিয়া হলো তারও। ওকে চেনামাত্র মহাবিস্ময়ে কপালে উঠলো চোখ। 'রানা, তুমি এখানে?'

'আমারও তো একই প্রশ্ন। তোমার না এখন জিব্রাল্টারে থাকার কথা, হানিমুনে?'

আড়ষ্ট এক চিলতে হাসি ফুটলো সুজানের সুন্দর মুখে। বললো, 'হ্যাঁ, এদিকেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ জরুরী এক কল পেয়ে এখানে আসতে হলো এলিসনের সাথে। ব্যবসায়িক কাজ আর কি! আজই আবার ইয়টে ফিরে যাবো। কিন্তু তুমি এখানে কি করছো? সেদিন সী-অফ করতে এলে না কেন?'

জীবন নিয়ে পালাচ্ছি, মনে মনে বললো মাসুদ রানা। মুখে বললো, 'জরুরী একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম। সরি।'

কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকলো সুজান। 'তোমাকে খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে, রানা।'

'ঝামেলার কাজ…'

রানার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলো সুজান। নরম গলায় বললো,

'জীবনটা কি এভাবেই শেষ করে দেবে, রানা?'

ও উত্তর দেয়ার আগেই শোফারের ইউনিফরম পরা মোটা এক লোক সুজানের সামনে এসে দাঁড়ালো। ফ্যাসফেঁসে গলায় বললো, 'গাড়ি তৈরি, মিসেস এলিসন।'

'ধন্যবাদ। আসছি আমি।' রানার দিকে ফিরলো মেয়েটি। 'রানা, এবার যেতে হয়। কাজ সেরে চলে এসো না আমাদের ইয়টে?'

'চেষ্টা করবো, সুজান। তবে কথা দিতে পারছি না।'

'ও-কে।' হাতটা ছেড়ে দিলো সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'মাঝেমধ্যে টেলিফোন কোরো। খুব খুশি হবো। ইয়টের নাম, মারস। ফোন নাম্বার, ব্ল্যাক ডগ ৭৩৭। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'ফোন করবে তো?'

'করবো।'

'কোরো। এলিসনও খুশি হবে।' শোফারের পিছন পিছন পা বাড়ালো সুজান। 'নিজের দিকে খেয়াল রেখো। বাই।'

'বাই।'

একভাবে মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকলো মাসুদ রানা। কি এক চিন্তায় কুঁচকে আছে কপাল। দু'জনের এমন অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে ওর খুশি-ই হওয়ার কথা, অথচ হতে পারছে না। বরং ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। দৈব-সংযোগ, ভাবছে রানা, আরেকটা দৈব-সংযোগ। চিন্তিত মনে টার্মিন্যাল ভবনের একটা পাবলিক কল বুদে গিয়ে ঢুকলো।

স্লটে কয়েন ফেলে রোমের রানা এজেন্সির নাম্বার টিপতে শুরু করলো ও। যা আশঙ্কা করেছিলো, ঠিক তাই। রিঙ হচ্ছে না ও প্রান্তে, কেটে দেয়া হয়েছে লাইন। বুঝতে পারছে কাজ হবে না, তবু আশায় আশায় অন্য নাম্বারগুলোয় চেষ্টা করলো রানা এক এক করে। বাজলো না একটাও। নিশ্চিত হলো রানা, ওর ধারণাই সত্যি তাহলে। হিলিংটনের একাদশ শিকার ও নিজে। কিন্তু কেন? কি অপরাধ করেছে ও?

'কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত ঘষলো মাসুদ রানা।

তাহলে? কোথায় যাওয়া যায় এখন? রানা এজেন্সি যে মোটেই নিরাপদ নয় এ মুহূর্তে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক আছে, আপাতত হোটেলেই ওঠা যাক। অন্তত ওঠার ভান করে দেখা যাক, কী দাঁড়ায়। ট্যাক্সি নিয়ে হ্যাসলার হোটেলের দিকে চললো মাসুদ রানা। সারাপথ ডুবে থাকলো গভীর চিন্তায়।

ছয় তলার ছয়শো বারো নম্বর স্যুইটটা নিলো ও। বিশেষ কোনও কারণে নয়, ওই একটা স্যুইটই খালি ছিলো। পাসপোর্ট জমা দেয়ার সময় উদ্বিগ্ন ছিলো কিছুটা। কে জানে, এরই মধ্যে ওর ব্যাপারে কোনও গোপন নির্দেশ পেয়ে গেছে কি না এরা। বেলম্যানের সাথে লিফটে করে উঠে এলো রানা।

ওদিকে, লাউঞ্জের প্রকাণ্ড এক সোফায় খবরের কাগজে মুখ ঢেকে বসে আছে এক লোক। কানে হিয়ারিং এইড। গালে চাপ দাড়ি। ঠোঁটের কোণে পাইপ। তার হাতঘড়িটা অনবরত মৃদু 'পিক' 'পিক' আওয়াজ করছে। অবশ্য আশপাশের আর

amirulnoor@yahoo.com
www.murchona.com

কারও কানে পৌঁছুচ্ছে না তা। কেবল চাপ দাড়িই শুনছে, এইডের সাহায্যে। মাসুদ রানাকে নিয়ে লিফট রওনা হয়ে যেতে হাতের কাগজ ভাঁজ করে আসন ছাড়লো সে। কাছের একটা বুদে ঢুকে লিফটের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। চাপা গলায় কথা বলতে শুরু করলো কারও সাথে। আলাপ শেষ করে রিসিভার রাখতে যাবে, এই সময় রানাকে বেরিয়ে আসতে দেখলো সে লিফট থেকে।

খানিকটা বিস্মিত হলো চাপ দাড়ি, এতো তাড়াতাড়ি নেমে আসবে ও আশা করেনি। লাইনটা কেটে গেছে, কাজেই আবার ঘোরালো সে একই নম্বর। কিছু বললো, কিছু শুনলো। তারপর বেরিয়ে এলো বুদ থেকে। ডেস্ক ক্লার্কের সামনে বেশ ভিড়, তাকে দেখতে পাচ্ছে না সে। দ্রুত পা চালিয়ে লিফটের কাছে এসে দাঁড়ালো চাপ দাড়ি। এক মিনিট পর, ছয় তলায় দেখা গেল তাকে, রানার স্যুইটের দরজা খুলতে ব্যস্ত।

ডেস্কে চাবি জমা দিয়ে কারপার্কে বেরিয়ে এলো মাসুদ রানা। অপেক্ষমাণ একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠতে যাবে, এই সময় ধীরগতিতে একটা ধূসর রঙের ওপেল এসে দাঁড়ালো রাস্তার ওপাশে। সরাসরি একটা 'নো পার্কিং' সাইনের নিচে। কয়েক জায়গায় ট্যাপ খেয়ে আছে ওটার বনেট। কেউ নামলো না ভেতর থেকে। প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়েছে রানার, চারজন আরোহী রয়েছে ওপেলে।

এ ধরনের কিছু একটা মনে মনে আশা করছিলো ও, কাজেই খুব একটা অবাক হলো না। যেন খেয়াল করেনি, এমন ভঙ্গিতে ট্যাক্সিতে চড়ে বসলো। 'ভায়া মনটি গ্রাপপা,' ড্রাইভারকে বললো ও। হাতের চাপে শোল্ডার হোলস্টারটার উপস্থিতি অনুভব করলো। বড় রাস্তায় উঠে চলতে শুরু করে দিয়েছে ততোক্ষণে ট্যাক্সি।

রিয়ার ভিউ মিররে সতর্ক নজর রাখলো মাসুদ রানা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হতাশ হতে হলো। অনুসরণ করছে না ওপেল। হাসলো রানা। ভাবলো, খুব বেশি সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েছি। সবাইকে···আবার মৃদু হাসি ফুটলো ঠোঁটে। এরকম মুহূর্তে সন্দেহপ্রবণ হওয়াটা দোষের নয় হে, নিজেকে শোনালো মনে মনে।

ভায়া মনটি গ্রাপ্পার মাঝামাঝি পৌঁছে গাড়ি থামাতে বললো রানা। নেমে ভাড়া মেটাতে যাবে, এমন সময় ওপেলটা ধরা পড়লো চোখের কোণে। বেশ অনেকটা পিছনে রয়েছে, অন্য অসংখ্য গাড়ির ভিড়ে গা লুকিয়ে এগিয়ে আসছে ধীরগতিতে।

অবাক কাণ্ড! কি করে এলো ব্যাটারা ওকে অনুসরণ না করে? তাড়াতাড়ি হাঁটা ধরলো রানা, মিশে গেল মনটি গ্রাপপার ভিড়ে। হন হন করে একশো গজ মতো এগিয়ে একটা স্টেশনারি দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লো সুড়ুৎ করে। ওখান থেকে একটা টোব্যাকো পাইপ আর এক প্যাকেট ক্লাইং ডাচম্যান কিনলো ও। নজর দোকানের বিশাল কাঁচের জানালার ওপাশে। লক্ষ্য রাখছে দাঁড়ায় কি না ওপেল।

কিন্তু দাঁড়ালো না। একই গতিতে দোকানের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। সামনে-পিছনে দু'জন দু'জন চারজন আরোহী রয়েছে গাড়িতে। সবার মাথায় চওড়া কিনারার হ্যাট, ভুরু পর্যন্ত নামানো। কেউ-ই এদিক-ওদিক তাকাবার গরজ দেখালো না, সোজা সামনের দিকে চেয়ে আছে। গাড়িটা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতেই দোকান থেকে বেরিয়ে এলো রানা, দ্রুত পা চালালো উল্টোদিকে।

চট করে আরেকটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লো। 'ভায়া মনটিসেল্লি।' ঘাড় ঘুরিয়ে একভাবে পিছনে চেয়ে থাকলো রানা। কোথাও নেই ওপেল। পনেরো মিনিট পর পঁয়ত্রিশ বাই তিন, ভায়া মনটিসেল্লির সামনে ট্যাক্সি ছাড়লো রানা। অনেক পুরানো একটা একতলা বাড়ি, পড়ো পড়ো অবস্থা। বিশেষ প্রয়োজনে আগেও কয়েকবার পদধূলি দিয়েছে রানা এ বাড়িতে। এর বেজমেন্টের অধিবাসী, লাজারিনি, নামকরা পাসপোর্ট জালিয়াত। দেশের পুলিস এবং দুই বা তিন নম্বরী কারবারীদের অতি পরিচিত।

সততা বা বিশ্বস্ততা বলে কিছু নেই লাজারিনির মধ্যে। টাকার জন্যে পরম বন্ধুর পিঠে ছুরি বসাতেও বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না। তবে মক্কেলের অভাব হয় না তার কখনও। মানুষ বুঝে চার্জ করে লাজারিনি। কনসেশন বলে তার অভিধানে কোনও শব্দ নেই, হয় তার হাঁকা দরে রাজি হয়ে যাও, নয়তো কেটে পড়ো।

তিনটে সিঁড়ির ধাপ টপকে বেজমেন্ট রুমটার বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছুলো মাসুদ রানা। নক করলো। প্রায় সাথে সাথেই একটা চোখ দেখা গেল দরজার গায়ে বসানো পীপহোলের ওপাশে। এক মুহূর্ত মাত্র, সশব্দে খুলে গেল দরজা পুরোপুরি।

'সেনর রানা!' টাক মাথা, গোলগাল চেহারার এক লোক চেঁচিয়ে উঠলো। দু'হাতে জাপটে ধরলো ওকে। 'কেমন আছেন, মিও এমিকো?'

কোনমতে লোকটির বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলো রানা। শ্বাস বন্ধ করে রেখেছে আগে থেকেই। দাঁত মাজে না লাজারিনি, হলুদ ময়লার একটা স্তর পড়ে আছে দাঁতের ওপর, দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো দায়। আগের চেয়ে আরও মোটা হয়েছে ব্যাটা, ভাবলো রানা। আগে দুটো ভাঁজ ছিলো থুতনির নিচে, এখন তিনটে।

'ভালো। আপনি কেমন?'

'চমৎকার! তারপর, কি সাহায্যে আসতে পারি, বলুন?'

'একটা পাসপোর্ট চাই। খুব জরুরী, তাড়াতাড়ি দিতে হবে। পারবেন না?'

'হ্যাহ! এটা আবার কোনো কাজ হলো নাকি?' রুমের এক কোণের একটা কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো লাজারিনি। পকেট থেকে চাবি বের করে খুললো ওটা। ভেতর থেকে রাবার ব্যাণ্ডে মোড়া গোটা দশেক বিভিন্ন রঙের কাভারওয়ালা পাসপোর্ট বের করলো। 'কোন্ দেশী পাসপোর্ট চান, সেনর? গ্রীক, টার্কিশ, ইয়োগোস্লাভিয়ান, ব্রিটিশ···'

'আমেরিকান,' বললো রানা।

ব্যাণ্ড খুলে পাসপোর্টগুলোর ওপর নজর বোলালো লাজারিনি। একটা বাদে বাকিগুলো জায়গামতো রেখে ফিরে এলো ওর সামনে। 'পেয়েছি, বললো সে। 'কেভিন পারকার নামটা কেমন মনে হয়, চলবে, সেনর রানা?'

'চলবে।'

'তাহলে আর সমস্যা থাকলো না কোনো। নাম নিয়ে···'

'কতো।'

'কি?'

'কতো লিরা?'

'আপনার জন্যে আমার রেট সব সময়ই কম, সেনর। আগে যা নিয়েছি, এবারও তাই, দশ হাজার লিরা। শুধু আপনার জন্যেই। অন্য কেউ হলে বিশ হাজারের নিচে ছাড়তাম না।'

'ঠিক আছে।'

পাসপোর্ট রেখে পোলারয়েড ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো লাজারিনি। 'দেয়ালের সামনে দাঁড়ান, সেনর,' বললো সে। 'ছবি তুলতে হবে।'

তার নির্দেশিত জায়গায় দাঁড়ালো মাসুদ রানা। এক মিনিট পর ছবিটা ওর দিকে এগিয়ে দিলো লোকটা। 'দেখুন। চলবে এতে?'

ওটার ওপর এক পলক চোখ বুলিয়েই মাথা নাড়লো রানা। 'না। হয়নি। খুব গম্ভীর গম্ভীর লাগছে।'

ক্যামেরা তুলে রাখতে যাচ্ছিলো লাজারিনি, ঘুরে দাঁড়ালো। 'সি?'

'বলছি, আবার তুলুন। একটু হাসি হাসি হতে হবে ছবিটা।'

'শিওর,' কাঁধ ঝাঁকালো সে। আরেকটা স্ন্যাপ নেয়া হলো। এটা পছন্দ হলো রানার।

'চলবে,' সন্তুষ্টমনে বললো রানা। কথার ফাঁকে, যেন অনেকটা বেখেয়ালেই, প্রথম ছবিটা পকেটে পুরলো। 'তাড়াতাড়ি করুন। বেশি দেরি করা যাবে না।'

চেহারা যথাসম্ভব গম্ভীর করে তুললো লাজারিনি, কাজটার গুরুত্ব বোঝাতে চায় রানাকে। পাসপোর্ট আর ছবিটা নিয়ে একটা ওয়ার্কিং বেঞ্চের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো নীরবে। ছোট একটা ল্যামিনেটিং মেশিন রয়েছে ওটার ওপর। ছবিটা পাসপোর্টের ভেতর জায়গামতো বসিয়ে নিয়ে ওটা মেশিনে ঢোকালো। 'সেনর, রানা। দাঁড়িয়ে কেন,' মাংসল কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন ফিরে বললো সে, বসুন।',

'থ্যাঙ্ক ইউ।' পা বাড়ালো মাসুদ রানা। একপাশে দেয়ালের সাথে দাঁড়িয়ে আছে একটি মাঝারি রীডিং টেবিল। ছোটবড় নানা রঙের কালির দোয়াত, ছুঁচোলো পেন্সিল আর অন্যান্য হাবিজাবি দিয়ে ভরা। সব ছড়ানো, এলোমেলো। উঁচু একটা টুল রয়েছে পাশেই। ওটায় বসলো ও।

টেবিলের দিকে নজর দিলো। এবং মুহূর্তের মধ্যে এক শিশি গ্লু আর একটা রেজর ব্লেড গায়েব করে দিলো। তিন মিনিটেই হাতের কাজ শেষ হয়ে গেল লাজারিনির। পাসপোর্টটা চোখের সামনে তুলে নেড়েচেড়ে দেখলো সে। খুশিমনে মাথা দুলিয়ে বললো, 'মন্দ নয়।'

পাঁচ হাজার লিরার কড়কড়ে দুটো নোট বাড়িয়ে দিলো রানা তার দিকে। পাসপোর্টের ওপর নজর বোলাবার কোনও দরকার মনে করলো না। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসলো লোকটা, চট করে পকেটে পুরলো নোট দুটো।

'আপনার মতো মানুষের কাজ করে আমি খুব আনন্দ পাই, সেনর। সব সময়-ই। ইউ নো।'

রানাও মুচকে হাসলো। পাসপোর্টটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'এ ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখবেন আশা করি?' বললো ও। বাস্তবে যদিও তা মোটেই আশা করে না।

'অফকোর্স, সেনর।'

'গুড।' ঘড়ি দেখলো ও। প্রায় আটটা। রাত নামতে আর দেরি নেই।

ডান হাত বাড়ালো লাজারিনি। 'গুড লাক, মিস্টার কেভিন পারকার।'

'থ্যাঙ্কস।'

রানা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করলো লোকটা। এক মুহূর্তও দেরি না করে হাত বাড়ালো টেলিফোনের দিকে। ওদিকে, রাস্তায় উঠে বিশ গজমতো এগিয়ে একটা ডাস্টবিন দেখে দাঁড়ালো রানা। পাসপোর্টটা বের করে ফেলে দিলো ওর মধ্যে। মনে মনে বললো, খুঁজে মর শালারা কেভিন পারকারকে।

ঘুরে দাঁড়ালো রানা। এবং পরক্ষণেই ওপেলটার ওপর চোখ পড়লো। শখানেক গজ দূরে প্রায় নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে এদিকে মুখ করে। অপেক্ষা করছে। অসম্ভব! ভাবলো ও, এ কি করে হয়? রানা নিশ্চিত, ওর ট্যাক্সি অনুসরণ করে এখানে আসার প্রশ্নই আসে না ওটার। সারা পথ পিছনে তাকিয়ে ছিলো ও। তাহলে? ভাবতে ভাবতে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করলো রানা। খিচে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা দমন করে রেখেছে বহু কষ্টে। অবশ্য কান খাড়া রেখেছে, পিছনে এনজিনের আওয়াজ বেশি জোরালো হয়ে উঠলে বাধ্য হয়েই কাজটা করতে হবে। দূর! পানিতে গেল দশ হাজার লিরা। কোনও কাজেই লাগলো না পাসপোর্টটা।

গাড়িটা পর পর দু'বার খুঁজে বের করেছে ওকে। এর একটাই কারণ থাকতে পারে–হোমিং ডিভাইস প্ল্যান্ট করেছে ওরা। এবং রানা তা বয়ে বেড়াচ্ছে। কোথায়? দ্রুত ভাবছে রানা, শার্টের বোতামে? হতে পারে। এর সবই জেনারেল হিলিংটনের খেলা। না কি…আর কি কি আছে রানার সঙ্গে?

ক্যাশ, চাবি, ওয়ালেট, রুমাল আর ক্রেডিট কার্ড। ক্রেডিট কার্ড! জেনারেলের দেয়া ক্রেডিট কার্ড! ঠিক। কোনও সন্দেহ নেই, ওটাই ওদের পথ দেখাচ্ছে। হারামজাদা, দাঁতে দাঁত চাপলো মাসুদ রানা এনএসএ ডেপুটির উদ্দেশে। বাঁক নিয়ে পাশাপাশি দুটো বাড়ির মাঝের সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়লো চট করে।

আশা করেছিলো এখনই বেড়ে যাবে গাড়ির আওয়াজ, ছুটে আসবে ওকে বাধা দিতে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না। কয়েক মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পরও যখন এলো না ওপেল, সন্দেহ জাগলো মনে। এক পা এক পা করে বড় রাস্তায় উঠে এলো রানা আবার। আঁধার হয়ে এলেও এখনও বেশ অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। নেই ওপেলটা।

পকেট থেকে ক্রেডিট কার্ডটা বের করলো এবার মাসুদ রানা। এই প্রথম মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো ওটাকে। উল্টেপাল্টে দেখলো। ওজনটা একটু যেন বেশি-ই মনে হচ্ছে। মুঠোয় পুরে কার্ডটা চাপ দিলো রানা। টের পেলো, ভেতরে খুব পাতলা হলেও কোনও ধাতব স্তর রয়েছে, সাধারণ ক্রেডিট কার্ডের মতো পুরোপুরি ভাঁজ হচ্ছে না। রাখো, হাসলো রানা মনে মনে। দৌড় কতো প্রকার ও কি কি, উদাহরণ সহ টের পাবে।

চারদিকে সতর্ক নজর বোলাতে বোলাতে দ্রুত হেঁটে চললো ও সামনের পিয়াযযা ডেল প্যাসেজরির উদ্দেশে। জায়গামতো পৌঁছুতে মিনিট পাঁচেক লাগলো। ব্যস্ত বিপণী এলাকা এটা, বেজায় ভিড়। ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে দিলো রানা নিজেকে। ফুটপাথ ঘেঁষে অসংখ্য দোকান। ওরই মাঝে একটা বার দেখে ঢুকে পড়লো।

কিন্তু বসলো না। সোজা পিছন দিককার ল্যাভেটরিতে চলে এলো। সামনেই এক সার 'মেনস রুম'। কেউ নেই এ মুহূর্তে, ফাঁকা। ওর একটায় ঢুকে পড়লো মাসুদ রানা। লাগিয়ে দিলো দরজার ছিটকিনি। কার্ডটা বের করলো রানা, চোখের সামনে তুলে ধরে ওটার চার ধার খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো।

একটু পরই মুখে হাসি ফুটলো ওর। কার্ডটার এক কিনারে অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটা দাগ দেখা যাচ্ছে। কিসের হতে পারে দাগটা? অন্য কোনওদিকে নেই, অথচ এদিকে···ভাবতে ভাবতে রেজর ব্লেডটা বের করলো রানা। ওটার ধারালো প্রান্ত দিয়ে খুব সতর্কতার সাথে, আলতো করে একটা পোঁচ দিলো দাগটার এ-মাথা ও-মাথা। এবার বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ওটার দু'প্রান্তে মৃদু চাপ দিলো, সাথে সাথে হাঁ হয়ে গেল জায়গাটা—বেরিয়ে পড়লো খুদে একটা পকেট। ভেতরটা ফাঁকা।

ঢাকাই ছবির ভিলেনের মতো বাঁকা হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটের কোণে। কার্ডটা উপুড় করে জোরে জোরে কয়েকবার ঝাঁকি দিতেই ভেতর থেকে এক খণ্ড চকচকে স্টীলের পাত বেরিয়ে এলো। কাগজের মতো পাতলা এবং হালকা জিনিসটা, প্রায় কার্ডটার সমান-ই লম্বা-চওড়া। পাতটা উল্টে পাল্টে দেখলো মাসুদ রানা। স্রেফ একটা ধাতব প্লেট, গোবেচারা ধরনের। দেখে কিচ্ছুটি বোঝার উপায় নেই।

ওটা পকেটে পুরে কার্ডটা নিয়ে পড়লো এবার ও। জিনিসটা এতো তাড়াতাড়ি হাতছাড়া করতে রাজি নয়। যতো বড় অঙ্ক সম্ভব, খসাতে চায় এনএসএ-র। ব্লেডটা পকেটে চালান করে গ্লু-র শিশিটা বের করলো রানা। মাত্র এক মিনিট শ্রম ব্যয় করতেই চমৎকার জোড়া লেগে গেল কাটা জায়গাটা। নিখুঁত অটোপসি, দেখে বোঝার কোনও উপায়-ই নেই ভেতর থেকে নাড়িভুঁড়ি বের করে নেয়া হয়েছে। বেরিয়ে পড়লো ও বার ছেড়ে।

একটা ট্যাক্সি ডেকে রেল স্টেশনের দিকে ছুটলো। তার একটু আগেই রয়েছে আন্তর্জাতিক ট্রাক টার্মিনি (টার্মিন্যাল), জানা আছে ওর। টার্মিন্যাল গেটে ট্যাক্সি ছেড়ে ভেতরে ঢুকলো ও। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ট্রাক, বিভিন্ন দেশের। খুঁজে খুঁজে লাল রঙের একটা ফরাসী ট্রাক বের করলো রানা।

মাল বোঝাই করে অপেক্ষা করছে ওটা। যে কোনও সময় ছেড়ে যাবে। এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে নিলো রানা। কেউ লক্ষ্য করছে না। এবার চট করে পাতটা ছেড়ে দিলো ও পিছনের টেইলবোর্ড আর মালপত্রের মাঝখানে। হোটেলে ফেরার পথে একটা হার্ডওয়্যারের দোকানে ঢুঁ মারলো রানা। এক কয়েল ম্যানিলা রোপ আর একটা হুক কিনলো ওখান থেকে। এগুলো কাজে লাগার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

হোটেল লবিতে বেশ ভিড়। নানা বয়সী মেয়েদের কল কাকলিতে মুখরিত। দড়ি আর হুকের ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে কনশিয়ার্জের ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালো রানা।

'আজ রাতে রোম-প্যারিস কোনও ফ্লাইট আছে কিনা, চেক করে দেখুন, প্লীজ,' বললো ও। 'থাকলে একটা ফার্স্ট ক্লাস সীট রিজার্ভ করে ফেলুন আমার জন্যে।'

'শিওরলী, সেনর। একটায় হলেই চলবে, না পার্টিকুলার কোনো এয়ারলাইন, সেনর?'

'যে কোনোটায় হলেই চলবে।'

'আই উইল বি হ্যাপি টু অ্যারেঞ্জ ইট।' টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালো কনশিয়ার্জ।

'ধন্যবাদ। ঘুরে হোটেল ক্লার্কের উদ্দেশে বললো ও, 'আমার স্যুইটের চাবিটা, প্লীজ। স্যুইট নাম্বার ছয়শো বারো। আর আমার বিলটা রেডি করুন। এক ঘণ্টার মধ্যেই চেক আউট করবো আমি।'

'ভেরি গুড, সেনর।' পিছনের বিশাল কী-বোর্ডের নির্দিষ্ট পিজিয়নহোল থেকে চাবিটা বের করলো লোকটা। সেই সাথে একটা খামও বেরোলো। 'ওহ্, আপনার একটা চিঠিও আছে, সেনর,' বললো সে।

'চিঠি! আমার?' বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। ব্যাগটা পায়ের কাছে রেখে খামটা নিলো। মুখ বন্ধ। ওপরে বড় করে লেখা: মাসুদ রানা। ব্যাস, আর কিছু নয়। আঙুল দিয়ে খামটা টিপে টিপে দেখলো ও। মনে হলো কার্ড জাতীয় কিছু হবে ভেতরে।

খাম খুললো রানা। একটা পিকচার কার্ড বেরোলো, রোমের এক বিখ্যাত রেস্টুরেন্টের নাম ছাপানো। জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো রানা। 'কে দিয়ে গেছে এটা বলতে পারেন?'

'না, সরি,' ইতস্তত করতে লাগলো ক্লার্ক। 'আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, সেনর। কে যে কখন দিয়ে গেল···'

'দ্যাটস অল রাইট।'

আর কিছু না বলে এলিভেটরের দিকে পা বাড়ালো রানা ব্যাগটা ঝোলাতে ঝোলাতে। কে দিয়ে গেল কার্ডটা, কেন দিয়ে গেল, কিছুই মাথায় আসছে না। কি অর্থ হতে পারে এর? ঠিক আছে, ক্রূর এক টুকরো হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটের কোণে।

সঙ্গের শেষ মেয়ে যাত্রীটি নেমে গেল ছয় তলায়। রানা নামলো না। নতুন আর কেউ উঠলোও না। দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই টপ ফ্লোরের বোতামটা টিপে দিলো ও। রওনা হয়ে গেল এলিভেটর। বারো তলায় উঠে থামলো। নেমে পড়লো মাসুদ রানা। স্টেয়ার কেস কোনদিকে, জানাই আছে। কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা সেদিকে চললো ও।

এক মিনিটের মধ্যে উঠে এলো খোলা ছাতে। চারদিকে আলোয় আলোয় ঝলমল রূপসী রোম। চওড়া হাইওয়ে ধরে দিশেহারার মতো এদিক ওদিক ছুটছে অন্তহীন গাড়ির মিছিল। জোর বাতাসে চুল, কোটের প্রান্ত পত পত করে উড়ছে রানার। হ্যাসলারের দৈত্যাকার সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশনিং মেশিনের গোঁ গোঁ আওয়াজ বাতাসের সাথে মিতালি করে চমৎকার এক আবহসঙ্গীত সৃষ্টি করেছে যেন।

পিছনদিকের কোমর সমান রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ালো মাসুদ রানা। উঁকি দিলো নিচে। আবছা আলোয় চোখ সয়ে যেতে আরও একটু ঝুঁকলো। সাথে সাথেই ব্যালকনির রেলিঙে বেঁধে রেখে আসা রুমালটা দেখা গেল। বাতাসে দোল খাচ্ছে এক প্রান্ত। স্যুইটে মাত্র এক মিনিটের মতো অবস্থান করেছিলো রানা তখন, বিশেষ দুটো কাজ সারার জন্যে। তার একটা ওই রুমাল বাঁধা।

কয়েক পা ডানে সরে সরাসরি রুমালটার ওপর এসে দাঁড়ালো মাসুদ রানা।

বসে পড়লো। ব্যাগটা উপুড় করে ভেতরের জিনিসগুলো বের করলো, তারপর লেগে গেল কাজে। হুকটার গোড়ায় গোল ফুটো আছে একটা, ওর মধ্যে দড়ির এক প্রান্ত ঢুকিয়ে বিশেষ কায়দায় পেঁচিয়ে গিট দিলো রানা। টেনেটুনে বাঁধনটা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো।

এবার দড়ির কুণ্ডলিটা খুলে ফেললো। দশ ফুট পর পর পাঁচটা মোটা মোটা গিট দিলো। রেলিঙ ঘেঁষে আড়াআড়িভাবে চলে গেছে কয়েকটা মোটা পানির পাইপ, ওর একটার সাথে হুকটা আটকে দিলো রানা। তারপর বাইরের দিকে ছেড়ে দিলো দড়িটা আস্তে করে। একভাবে নিচের দিকে চেয়ে বসে থাকলো রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর দোল খেতে শুরু করলো ম্যানিলা রোপ, শেষ হয়েছে দীর্ঘ পতন।

দোল থেমে এলো এক সময়। কিন্তু তখনই নড়লো না মাসুদ রানা। বসে থাকলো নিচের দিকে চেয়ে। ব্যাপারটা কারও চোখে পড়লো কিনা, নিশ্চিত হতে চায়। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তেমন কোনও আলামত চোখে পড়লো না। এবার উঠলো ও।

এক পা দেয়াল টপকে বের করে দিলো। ঝুলে পড়লো সাবধানে। খবরদার, নিজেকে চোখ রাঙালো রানা, নিচে তাকাবে না। একটু একটু করে নেমে যাও। কাজটা শেষ হলে বুঝবে, এর চেয়ে সহজ কাজ দুনিয়াতে দ্বিতীয়টি আর নেই।

প্রথম গিটটা ধরে একটু থামো, বিশ্রাম নাও, তারপর আবার নামতে শুরু করো। দেখলে, কতো সহজ কাজ? তাছাড়া, এ জন্যে তো আগে থেকেই তৈরি ছিলে তুমি। ছিলে না? হাতের তালু জ্বালা করতে শুরু করেছে ভীষণ। বাইসেপের পেশী কাঁপছে থর থর করে। পরিশ্রমে ঘেমে উঠেছে মাসুদ রানা, ঘন ঘন দম নিচ্ছে।

চতুর্থ গিটে পা ঠেকতে থামলো রানা। জুতোর সামনের ভেতর দিককার দুই প্রান্ত দিয়ে দুদিক থেকে গিটটা আঁকড়ে ধরে দাঁড়ালো। ফোঁস ফোঁস করে দম ছাড়লো কিছুক্ষণ। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। আর মাত্র বিশ ফুট নিচে ওর ব্যালকনি। উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলো ও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে যাবে ধারণাটা সত্যি কি না।

ব্যালকনির রেলিঙে ডান পা রাখলো রানা প্রথমে। দড়ি ধরে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে কয়েক মুহূর্ত লাগলো, তারপর নিঃশব্দে নেমে পড়লো ভেতরে। পলকে হাতে বেরিয়ে এসেছে প্রিয় ওয়ালথার পি. পি. কে। দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো রানা। কান খাড়া করে শুনতে লাগলো ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ পাওয়া যায় কি না। না, কোনও শব্দ নেই।

দরজাটা বাঁ হাতে আস্তে করে টান দিলো রানা। খুলে এলো ওটা। দরজা খুলে রাখা ছিলো ওর দ্বিতীয় কাজ। চট করে ঢুকে পড়লো ও ভেতরে। এতো সাবধানতার আসলে কোনও প্রয়োজন আছে কি না ভেবে একটু দ্বিধা জাগলো মনে। পরক্ষণেই চোখ রাঙালো নিজেকে, আছে কি নেই, প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সাবধান থাকতেই হবে। আবার ভিড়িয়ে দিলো দরজা।

পর্দা সিকি ইঞ্চি সরিয়ে উঁকি দিলো রানা। এটা বেডরুম। অন্ধকারে ডুবে

আছে। বেশ সময় লাগলো ভেতরের সব কিছুর অবস্থান টের পেতে। প্রকাণ্ড ডবল খাট, বেড সাইড টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, রাইটিং টেবিল, সব দেখতে পাচ্ছে এখন রানা। সব ঠিকই আছে, মনে হলো ওর। অন্তত এ ঘরে ও কারও উপস্থিতি আশা করছে না। করার কথাও নয়। যদি কেউ থেকেই থাকে, সামনের রুমে থাকবে সে ওর প্রবেশের অপেক্ষায়।

পা টিপে টিপে এগোলো রানা দেয়াল ঘেঁষে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখেছে। যে-কোনও পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। ছোট করিডর পেরিয়ে লিভিং রুমের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো ও। পরমুহূর্তে নিঃশব্দ হাসিতে বেরিয়ে পড়লো বত্রিশ পাটি দাঁত।

ওর দিকে পিছন ফিরে সোফায় বসে আছে লোকটা। চাপ দাড়ি। লবিতে এ ব্যাটাকেই খবরের কাগজে মুখ ঢেকে বসে থাকতে দেখেছিলো ও চেক্ ইন করার সময়। বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখেছে ফোন বুদে বসার ভঙ্গিটা ঢিলেঢালা। প্রতীক্ষা করতে করতে হয়রান হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। লোকটা বোকা, সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো রানা, এবং অসতর্ক। একটা পেডেস্টাল ল্যাম্প জ্বেলে পত্রিকা বা ম্যাগাজিন পড়ছে বসে বসে। যদিও বেশি জায়গা ছড়াতে পারেনি আলো শেডের কারণে। তবুও, রানা হলে অমন কাজ করতো না ভুলেও। আলো যতো অল্পই হোক, দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে বাইরে থেকে দেখা যাওয়ার চান্স রয়েছে ষোলো আনা।

তাছাড়া ব্যাটা ব্যালকনির দরজাটাও চেক করেনি হয়তো। সে ক্ষেত্রে দরজা বন্ধ করে রাখাটাই স্বাভাবিক ছিলো। লোকটার ঘাড়ের ওপর এসে দাঁড়ালো ও। ম্যাগাজিনের ছবি দেখছে সে। কোলের ওপর শুয়ে আছে সাইলেন্সার লাগানো প্রকাণ্ড এক মাউজার। সাঁৎ করে অস্ত্রটা তুলে নিলো রানা।

'সরি, মিঃ এমিকো। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি বোধহয়?' বললো ও গম্ভীর গলায়।

কানের পাশে পারমাণবিক বোমা ফাটলেও লোকটা এতো চমকাতো কি না সন্দেহ। সশব্দে আঁতকে উঠলো সে। চোখ উল্টে ঢলে পড়ার মতো অবস্থা।

'আ...আ...আপনি...'

'হ্যাঁ,' মিষ্টি করে হাসলো রানা। 'আমি। আমাকেই তো আশা করছিলে, না কি?' মাউজারটা কোটের পকেটে পুরে ধীর পায়ে সোফা ঘুরে লোকটার সামনে এসে দাঁড়ালো। সাইলেন্সার লাগানো অস্ত্রটাই প্রমাণ করে কেন পাঠানো হয়েছে একে। 'মাথার ওপর হাত তুলে উঠে দাঁড়াও। খুব সাবধানে।' ওয়ালথার নাচালো ও।

দাঁড়ালো লোকটা। চোখেমুখে পরিষ্কার হতাশা আর পরাজয়ের অভিব্যক্তি। লম্বায় রানার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বাই হবে। মাথার সামনের দিকে টাক লোকটার। পলকহীন চোখে চেয়ে আছে রানার কঠিন মুখের দিকে।

হাত তুলে স্যুইটে ঢোকার মূল দরজাটা দেখালো রানা। 'ওটার ছিটকিনিটা লাগাও।' আগেই দেখে নিয়েছে ও, ইয়েল লকটা বন্ধ। তবু আরও একটু সতর্ক থাকা ভালো। 'প্রয়োজনের বেশি এক চুল নড়েছো কি গুলি করবো আমি। মনে রেখো।'

ওর তিন হাত সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল লোকটা। দু'হাত ঘাড়ের পিছনে। ডান

হাতে ছিটকিনিটা তুলে দিলো সে, তারপর ঘুরে দাঁড়ালো।

'সিট,' চোখ ইশারায় আগের জায়গা দেখিয়ে বললো রানা। এবারও নীরবে নির্দেশ পালন করলো সে।

রানাও বসলো মুখোমুখি। 'তারপর? আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো।'

কথা বললো না চাপ দাড়ি। রানাকে দেখছে। পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খানিকটা খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে সে মনে হলো।

'উত্তর দাও। আমার রুমে তুমি কেন? কে পাঠিয়েছে?'

'বলবো না।'

যেন হতাশ হয়েছে, এমনভাবে মাথা দোলালো মাসুদ রানা। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ওয়ালথারটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে তাক করলো লোকটার হৃৎপিণ্ড বরাবর। 'কে পাঠিয়েছে?' সেফটি ক্যাচ অফ করলো ও।

সামান্য একটু কেঁপে উঠলো লোকটা আওয়াজটা কানে যেতে। এছাড়া আর কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছে ওয়ালথারের মাজলের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর রানার চোখের দিকে তাকালো। হিস্ হিস্ করে বললো, 'আমাকে খুন করলেও বাঁচতে পারবে না। মরতে তোমাকে হবেই।' পরিষ্কার আমেরিকান উচ্চারণ লোকটার।

'সে যখনকারটা তখন দেখা যাবে। তুমি এখনকার কথা ভাবো।' অস্ত্রটা আরও একটু ওপরে তুললো রানা, লোকটার দুই চোখের মাঝখানটায় তাক করে ধরলো। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জান বাঁচাবার এই শেষ সুযোগ। এরপর আর বলবো না।'

রানার ভাব-চক্কর সুবিধের মনে হলো না তার। চোখের পাতা কেঁপে উঠলো বার দুয়েক–আত্মবিশ্বাস টলে গেছে। 'ওয়েট!' চেঁচিয়ে বললো লোকটা। 'কি জানতে চান?' পরাজয় মেনে নিতে পারছে না সে একেবারেই, মরমে মরে যাচ্ছে। চেহারায় সে ছাপ পরিষ্কার।

'কে পাঠিয়েছে তোমাকে।'

'ওটা বলা যাবে না।'

'কেন পাঠিয়েছে।'

'আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে।'

'বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করো না। আরও কয়েকজন গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করছিলো আমাকে সন্ধে থেকে। সে রকম নির্দেশ থাকলে কাজটা ওরাই করতে পারতো। তাছাড়া ধরে নিয়ে যেতে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দরকার হয় না।'

উত্তর দিলো না লোকটা। বসে থাকলো গোঁজ হয়ে।

'কেন এসেছিলে, আমাকে খুন করতে?'

এবারও চুপ করে থাকলো সে।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে আবার মুখ খুললো রানা। 'বুঝলাম। কিন্তু কি অপরাধে...'

'আপনি ট্রেইটর। বিশ্বাসঘাতক!' ফুঁসে উঠলো চাপ দাড়ি।

'হোয়াট?'

'বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আপনি ওদের সাথে।'

'কাদের সাথে?' কপাল কুঁচকে উঠলো ওর।

উত্তর নেই।

বুঝলো মাসুদ রানা, এর পিছনে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। ও বিশ্বাসঘাতক, সম্ভবত এটুকুই জানানো হয়েছে এদের। এর বেশি নয়। তবু লোকটাকে ব্যস্ত রাখার জন্যে আবার বললো, 'কই, বললে না? কাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি আমি?' সোফা ছাড়লো রানা। পা বাড়ালো ঘুরে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে। নড়ে উঠলো লোকটা। সাথে সাথে কড়া গলায় ধমকে উঠলো ও। 'ডোণ্ট মুভ!'

দুই কাঁধের পেশী আড়ষ্ট হয়ে গেছে লোকটার। শক্ত হয়ে বসে আছে। রানার উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরেছে হয়তো। পিছনে এসে দাঁড়ালো রানা। পলকে ওয়ালথারটা উল্টো করে নিয়ে বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলো চাপ দাড়ির খুলির ওপর। 'ঘোৎ' করে একটা আওয়াজ করেই সটান শুয়ে পড়লো সে সোফায়।

তার কোটের ভেতরের পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করলো রানা। ওর মধ্যে থেকে বেরোলো ঈগলের মনোগ্রাম আঁকা এক আই ডি কার্ড। লোকটার ছবি সাঁটা আছে কার্ডে, ওএনআই-এর কার্ড। অফিস অভ ন্যাভাল ইণ্টেলিজেন্স! ভাবলো রানা সবিস্ময়ে, কেন, ওএনআই কেন? লোকটার নাম ডেভিড স্যালডেন, লেফটেন্যান্ট-ফিল্ড অপারেটর। ওএনআই কেন এর মধ্যে? আবার ভাবলো রানা। সাথে সাথে মনে পড়লো জিমি স্টুয়ার্টের কথা।

তিক্ত এক টুকরো হাসি ফুটলো ঠোঁটের কোণে। অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে? সে-ও তাহলে জড়িত এই ষড়যন্ত্রের সাথে? কখন থেকে, প্রথম থেকেই? না কি...। ব্যস্ত পায়ে ব্যালকনিতে এলো রানা। পকেট থেকে রেজর ব্লেডটা বের করে কয়েক পোঁচে কেটে ফেললো ঝোলানো ম্যানিলা রোপ।

ফিরে এসে ওটা দিয়ে কষে বেঁধে ফেললো ডেভিড স্যালডেনকে। মুখের মধ্যে তারই একটা রুমাল গুঁজে দিলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে লবিতে নেমে এলো মাসুদ রানা।

'সেনর মাসুদ রানা,' বললো কনশিয়ার্জ। 'আপনার রিজার্ভেশন করে ফেলেছি এয়ার ফ্রান্সে। ফ্লাইট নাম্বার ৩১২। রোম-প্যারিস। রাত একটায় লীভ করবে, সেনর।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, ভেরি মাচ।'

'এই যে,' একটা খাম এগিয়ে দিলো লোকটা। 'আপনার টিকেট।'

হোটেলের বিল, টিকেটের দাম পরিশোধ করলো মাসুদ রানা। বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠলো। 'ভায়া সনটি এ্যাপপা,' ড্রাইভারকে বললো ও। 'রোমা টার্মিনি।' যতোগুলো সম্ভব ডাইভার্শন তৈরি করতে হবে ভাবলো রানা।

পনেরো মিনিট পর ভায়া গিওভান্নি গিওলিট্টি, থারটি সিক্স পৌঁছুলো ট্যাক্সি। ড্রাইভার ঘোষণা করলো, 'স্টেযিওনি টার্মিনি, সেনর।'

'লেট'স ওয়েট ফর আ মিনিট,' চিন্তিত গলায় বললো রানা। সামনের আলোকিত রেল স্টেশনের প্রবেশ পথের দিকে চেয়ে আছে। দিনে-রাতে সব সময়

অস্বাভাবিক ভিড় লেগে থাকে এখানে। এখনও তাই। ব্যস্ত-সমস্ত যাত্রীরা গাট্টি-বোঁচকা নিয়ে ছুটছে এ প্ল্যাটফর্ম থেকে ও প্ল্যাটফর্মে। লাউড স্পীকারে ঘন ঘন নারীকণ্ঠের ঘ্যানঘেনে অ্যানাউন্সমেন্ট শোনা যাচ্ছে, অমুক জায়গার মেইল বা এক্সপ্রেস অমুক প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সামনের চত্বরে একের পর এক ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, লিমুজিন এসে থামছে। যাত্রী উগরে দিয়ে তক্ষুণি স্থান ত্যাগ করতে হচ্ছে তাদের এক ট্রাফিক সার্জেন্টের হাত ইশারায়–অন্য গাড়ির জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

ছবিটা একদম স্বাভাবিক। নিখুঁত। কিন্তু তারপরও অস্বস্তি বোধ করছে রানা। মন বলছে ঘাপলা একটা আছে কোথাও। ও ধরতে পারছে না। নিজের ওপরেই চটে উঠলো রানা। দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়াতে যাচ্ছিলো, ঠিক তখনই চোখে পড়লো খুঁতটা। স্টেশনের প্রবেশ পথের ঠিক সামনেই, 'নো পার্কিং' জোনে পাশাপাশি তিনটে সেডান দাঁড়িয়ে। একটাতেও কোনও আরোহী নেই। ওগুলোর দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না সার্জেন্ট।

হাতটা ফিরিয়ে নিলো রানা। ড্রাইভারের কাঁধে টোকা দিলো। 'ভুল হয়ে গেছে,' বললো ও। 'জরুরী একটা কাজ এখনও সারাই হয়নি। ভায়া ভেনিটো চলো, ওয়ান টেন, এ।'

'সি।' মৃদু গর্জন করে স্টার্ট নিলো ট্যাক্সি।

মাঠে মারা গেল রানার ডাইভার্শন তৈরির প্রথম প্রচেষ্টা।

দুই

ভায়া ভেনিটোর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে হালকা লাল রঙের বিশাল দুর্গের মতো পাঁচতলা এক বিল্ডিং, ওয়ান টেন এ। রোমের আমেরিকান এমব্যাসি এবং কনসুলেট। এমব্যাসি বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। তবে কনসুলেটের পাসপোর্ট বিভাগ খোলা। মার্কিন নাগরিকদের বিশেষ প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে।

বিশেষ প্রয়োজনেই এখানে এসেছে মাসুদ রানা। দোতলায় উঠে এলো ও চওড়া মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে। রিসেপশন ডেস্কের পিছনে বসা এক মেরিন মৃদু হাসলো ওকে দেখে। 'মে আই হেলপ্ ইউ, স্যার?'

'হ্যাঁ,' পাল্টা হাসি দিলো রানা। দু'হাত প্রসারিত করে বিশেষ একটা ভঙ্গি করে বললো, 'পাসপোর্ট চুরি হয়ে গেছে আমার। নতুন একটা পাসপোর্ট দরকার।'

'আপনি আমেরিকান নাগরিক?'

'হ্যাঁ।'

হাত তুলে বড় একটা বন্ধ দরজা দেখালো লোকটা। 'ওটার ভেতরে, স্যার। ওটা পাসপোর্ট ডিভিশন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

এক যুবতীসহ আট-দশজন লোক রয়েছে ভেতরে। দু'তিনজন নতুন পাসপোর্টের মৌখিক আবেদন জানাচ্ছে উপস্থিত দুই মেরিন অফিসারের একজনের কাছে। অন্যদের কেউ কেউ নিজের পাসপোর্ট হারানোর বয়ান দিচ্ছে বা ভিসা রিনিউয়্যাল করিয়ে নিচ্ছে অন্য কাউন্টারে।

'আলবেনিয়া যেতে ভিসা প্রয়োজন?' প্রশ্ন করলো এক প্রার্থী। 'ও দেশে আমার আত্মীয়...'

'আজ রাতেই পাসপোর্ট রিনিউ করানো দরকার। ভোরে আমার প্লেন ছেড়ে যাবে।'

'কোথায় যে হারালাম, কিছুই বুঝতে পারছি না। খুব সম্ভব মিলানেই হবে। ওখানকার...'

'তিন চারজন মিলে চেপে ধরলো আমাকে। এই ফাঁকে আরেকজন পার্স খুলে পাসপোর্টটা নিয়ে দে ছুট। কি করলো...'

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। সবার কথা শুনছে। পাসপোর্ট চুরি বা ছিনতাই ইটালিতে প্রায় কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে আজকাল। এদের কেউ না কেউ নতুন পাসপোর্ট পেতে যাচ্ছে, রানা নিশ্চিত, তার একটা ওর চাই। মিনিট দশেক পর দ্বিতীয় মেরিনের কণ্ঠ শোনা গেল।

'মিস্টার ওয়েবস্টার, এই আপনার নতুন পাসপোর্ট। আপনার তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্যে আমরা দুঃখিত। আশা করি এবার আরেকটু সতর্ক থাকার চেষ্টা করবেন।'

এই লোকটিই একটু আগে পাসপোর্ট ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে বলে দুঃখ করছিলো। নতুন পাসপোর্ট হাতে নিয়ে মেরিনটিকে ধন্যবাদ জানালো সে। পিছিয়ে এলো কাউন্টার থেকে, ওটা পকেটে পুরে ঘুরে পা বাড়াতে যাবে, এই সময় ধাক্কা খেলো সে রানার সাথে।

'আমি দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনা করলো ও ওয়েবস্টারের কাছে। কাঁধ ধরে সিধে হতে সাহায্য করলো তাকে।

'নো প্রবলেম,' বললো লোকটি। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল রুম থেকে।

রানাও পা বাড়ালো পাবলিক মেন'স রুমের দিকে। ভেতরে ঢুকে চার দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হলো, ও ছাড়া আর কেউ নেই এখানে। তারপর একটা বুদে ঢুকে পড়লো। ভেতর থেকে দরজার চেইন লাগিয়ে দিয়ে ইটালিয়ান কুটির শিল্পী বনে গেল। এক পকেট থেকে বেরুলো ওয়েবস্টারের নতুন পাসপোর্ট, অন্য পকেট থেকে রেজর ব্লেড।

পাসপোর্ট কাভারের পর পৃষ্ঠায় প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া আছে ওয়েবস্টারের হাসিমুখের ছবি। ব্লেড দিয়ে খুব সাবধানে প্লাস্টিক শীটটা এক পোঁচে কেটে ফেললো রানা ছবিটার কিনারা ঘেঁষে। তারপর আস্তে করে বের করে আনলো ছবিটা। এদের পাসপোর্টে কোনও আঠা ব্যবহার করা হয় না ছবি সাঁটার কাজে, প্লাস্টিক শীট দিয়েই ঢাকা থাকে কেবল। অতএব কাজটা সারতে কোনও অসুবিধে হলো না।

এবার পকেট থেকে নিজের ছবিটা বের করলো মাসুদ রানা। লাজারিনির প্রথমবারে তোলা ছবি এটা। কাটা জায়গা দিয়ে ওটা একটু একটু করে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলো শূন্য ছবির স্থানে, বসিয়ে দিলো ঠিক করে। গ্লু-র শিশিটা বের করলো এরপর।

annisuman@yahoo.com
www.murchona.com

কাটার ওপর খানিকটা থু লেপে দিয়ে বিচ্ছিন্ন দু'প্রান্ত এক করে বুড়ো আঙুল দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চেপে ধরে রাখলো।

নিজের হাতের কাজ দেখে নিজেই খুশি হয়ে উঠলো রানা। ক্রেডিট কার্ডের মতো এটার ফিনিশিংও চমৎকার হয়েছে। বুদ ছেড়ে বেরিয়ে এলো ও। নিচে এসে অপেক্ষমাণ ট্যাক্সিতে উঠলো। 'লিওনার্দো দা ভিঞ্চি,' ড্রাইভারকে বললো ও।

ঠিক সাড়ে বারোটায় এয়ারপোর্ট পৌছলো ট্যাক্সি। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে এলো রানা। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার একটা জায়গা খুঁজে বের করে দাঁড়ালো সেখানে। চেয়ে থাকলো সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে কি না দেখার জন্যে। অনেকক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পরও তেমন কোনও আলামত দেখা গেল না।

সব স্বাভাবিক। সন্দেহ জাগানোর মতো কোনও গাড়ি বা মানুষ, কিছু নেই। এবার ধীরপায়ে টার্মিনালের দিকে এগোলো মাসুদ রানা। ভেতরে ঢুকেই থেমে দাঁড়ালো বিশাল এন্ট্রান্সের পাশে। ভবনটা প্রকাণ্ড। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকগুলো বিমান সংস্থার কাউন্টার। এয়ার ফ্রান্সের কাউন্টারের ওপর নজর বোলালো ও প্রথম। সংস্থার হোস্টেসের পোশাক পরা এক তরুণী ছাড়া আর কেউ নেই ওখানে।

অন্যগুলোর অবস্থাও প্রায় এক। একজন দু'জনের বেশি মানুষ নেই কোনটাতেই। কিন্তু তারপরও অস্বস্তি কাটছে না রানার। কেবলই মনে হচ্ছে, এ বাইরের রূপ। ভেতরে আরও একটা রূপ আছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না ও। অসতর্ক অবস্থায় কিছু করতে গেলেই ফাঁদে পড়তে হবে। তবে ফাঁদ সত্যিই আছে কি নেই, সেটা আগে বুঝতে হবে। এতোদূর এসেও নিশ্চিত না হয়ে ফিরে যেতে রাজি নয় রানা।

আবার এগোলো ও। চোখেমুখে সদা সতর্ক একটা ভাব। এয়ার ফ্রান্সের পাশ কাটিয়ে আলইটালিয়ার কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওপাশে দাঁড়ানো সুন্দরী টিকেটিং অফিসারের উদ্দেশে বললো, 'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং। ক্যান আই হেল্প ইউ, সেনর?'

'হ্যাঁ, ইফ ইউ প্লীজ।'

'শিওর, বলুন?'

'আমার এক বন্ধুর এ সময়ে থাকার কথা টার্মিনালে। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না তাকে। লাউড স্পীকারে ওর নামটা অ্যানাউন্স করুন, কার্টসি টেলিফোনে আমার সাথে কথা বলতে বলুন, প্লীজ।'

'শিওর। কি নাম আপনার বন্ধুর?'

'মেজর মাসুদ রানা।'

'ও. কে।' কাউন্টার থেকে একটা কর্ডলেস মাউথপীস তুলে নিলো মেয়েটি। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত সরে পড়লো রানা ওখান থেকে। হাঁটতে হাঁটতে কানে এলো, টার্মিনাল ভবনের এখানে-ওখানে ফিট করা সবগুলো লাউড স্পীকারে টিকেটিং অফিসারের গলা শোনা যাচ্ছে: "মেজর মাসুদ রানা...মেজর মাসুদ রানা, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু কাম টু দ্য কার্টসি টেলিফোন।...অ্যাটেনশন, ইওর অ্যাটেনশন, প্লীজ...।

কার্গো সেকশনের সামনে এসে দাঁড়ালো মাসুদ রানা। দূরে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো সাদা কার্টসি টেলিফোন সেটটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রানার পাশেই ঘর্মাক্ত কলেবরে আলইটালিয়ার এক অ্যাটেনডেন্টের সাথে ঝগড়া করছে মাঝ বয়সী মোটা এক মার্কিন মহিলা। সামনে তার নানান সাইজের কম করেও ডজনখানেক স্যুটকেস।

অ্যাটেনডেন্টের মৃদু গলার কি এক কথার উত্তরে ঝাঁঝিয়ে উঠলো মহিলা। 'আমেরিকা হলে এই সামান্য কয়েকটা স্যুটকেসের জন্যে কখনোই এক্সট্রা চার্জ করা হতো না।'

'আমি দুঃখিত, ম্যাডাম,' বললো অ্যাটেনডেন্ট। 'কিন্তু এতগুলো ব্যাগেজ নিতে হলে এক্সট্রা চার্জ দিতেই হবে। আমি হেলপ্‌লেস।'

এদিক ওদিক তাকালো রানা। এখনও লাউড স্পীকারে ঘোষণা করে চলেছে মেয়েটি। পাশ দিয়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের এক পোর্টারকে যেতে দেখে বললো ও, 'এক্সকিউজ মি...'

ঘুরে দাঁড়ালো পোর্টার। 'ইয়েস?'

'আমার ওয়াইফ কার্টসি টেলিফোনে কথা বলতে বলছেন আমাকে। কিন্তু,' মোটা মহিলার স্যুটকেসগুলো দেখালো রানা ইশারায়। '...মালপত্র ফেলে যেতে পারছি না।' চট করে বিশ ডলারের একটা নোট বের করলো ও, গুঁজে দিলো পোর্টারের হাতে। 'আপনি যদি টেলিফোনে ওকে বলেন হোটেলে চলে যেতে, তো বড্ডো উপকৃত হবো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নোটটা পকেটে পুরলো সে। 'ঠিক আছে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। আমার স্ত্রীকে বলবেন, মালপত্র নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে হোটেলে পৌঁছে যাবো আমি।'

'শিওর।' পা বাড়ালো লোকটা কার্টসি টেলিফোনের দিকে। একভাবে তার দিকে চেয়ে আছে রানা।

কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুললো সে। 'হ্যালো?...হ্যালো?'

পরক্ষণেই যেন পাতাল ফুঁড়ে উদয় হলো কালো স্যুট পরা বিশালদেহী চারটে লোক। দেয়ালের সাথে গেঁথে ফেলার যোগাড় করলো তারা পোর্টারকে।

'হেই! হোয়াট ইজ দিস?' চেঁচিয়ে উঠলো ব্রিটিশ।

'চোপ!' চাপা গলায় ধমকে উঠলো একজন।

'আরে, কি মুশকিল!' নিজেকে ছাড়াবার জন্যে লাফ ঝাঁপ শুরু করে দিলো পোর্টার। 'কি করেছি আমি?'

'চেঁচিয়ে লাভ হবে না, মেজর। অনর্থক...'

'মেজর! কে মেজর, কিসের মেজর? আমি পিয়ারসন। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে চাকরি করি।'

'সে দেখবো পরে।'

'দাঁড়ান!' হঠাৎ কি মনে পড়তে চেঁচিয়ে বললো পিয়ারসন। 'কায়দা করে ফাঁদে ফেলা হয়েছে আমাকে। আপনারা যাকে খুঁজছেন, সে ওই যে, ও...'

রানা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো, সেদিকে হাত তুলে দেখাতে গিয়েও থেমে গেছে

পিয়ারসন মাঝপথে।

কেউ নেই সেখানে। হাওয়া হয়ে গেছে মাসুদ রানা।

তুমুল গতিতে শহরের দিকে ছুটছে রানার ট্যাক্সি। পিছনের আসনে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে ও। এই ঘটনায় অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এদের সবার হাতে এখনও রানার ছবি পৌঁছে দিতে পারেনি এনএসএ। তাহলে বারবার বলার পরও পিয়ারসনকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গাড়িতে তুলতো না লোকগুলো।

মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের সাথে কথা বলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে রানা। কেন কি ঘটছে জানার চেষ্টা করতে হবে। সেই সাথে তাঁকেও জানাতে হবে বর্তমান পরিস্থিতি। দশজন নিরীহ নারী-পুরুষ হত্যার জন্যে দায়ী কে, জেনারেল হিলিংটন? জিমি স্টুয়ার্ট? না কি তার শ্বশুর, রহস্যময় ডোনাল্ড খ্রীকও আছে এর মধ্যে? অথবা, এনএসএ ডিরেক্টর জেনারেল সরেনসেন? না কি আরও ওপরের কারও নির্দেশে হচ্ছে এসব? কে হতে পারে সেই ব্যক্তি? মার্কিন প্রেসিডেন্ট?

কিন্তু টেলিফোনে আলাপ করা নিরাপদ হবে কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে রানার। এ মুহূর্তে ও রোমে আছে, জানা হয়ে গেছে সবার। কাজেই এখান থেকে ঢাকাগামী প্রতিটি কল নিঃসন্দেহে ট্যাপ করা হবে। সে ক্ষেত্রে ওর ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে আরও।

কার সঙ্গে আলাপ করলে প্রয়োজনীয় খবর জানা যায়, ভাবতে লাগলো মাসুদ রানা। হঠাৎ করেই মনে পড়লো কর্নেল জিয়ানলুকা ফোর্যথির কথা। সাইফার, ইটালিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের ডেপুটি ডিরেক্টর, কর্নেল ফোর্যথি ওর বন্ধু মানুষ। এ রকম জটিল মুহূর্তে একমাত্র তাকেই বিশ্বাস করা যায়।

বিশ্রাম নেই কর্নেল জিয়ানলুকা ফোর্যথির। প্রচণ্ড ব্যস্ত সে। আধ ডজনেরও বেশি সিকিউরিটি এজেন্সির মধ্যে ঘন ঘন 'নোভা রেড' মেসেজ আনাগোনা চলছে। ওগুলোর একটা করে কপি জমা হচ্ছে তার টেবিলে। সবগুলোই মাসুদ রানা সম্পর্কিত, বক্তব্যও এক—টারমিনেট। কর্নেলের ব্যস্ততার কারণ, এ মুহূর্তে তারই এলাকায় রয়েছে রানা।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো কর্নেল। অতীতে বেশ কয়েকবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাসুদ রানার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে তার। রানার সততা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তার মনে। অথচ, তারপরও চারদিক থেকে এই মেসেজ—হত্যা করতে হবে মাসুদ রানাকে।

টেলিফোন বেজে উঠলো। 'ইয়েস?' হাঁক ছাড়লো জিয়ানলুকা ফোর্যথি।

'মেজর মাসুদ রানা এক নম্বর লাইনে আপনার অপেক্ষায় আছেন, কর্নেল।' বললো তার সেক্রেটারি।

লাফিয়ে উঠলো কর্নেল। 'হোয়াট? মেজর রানা? তাই নাকি? জলদি লাইন দাও, সুবিতো!' চাপা গলায় বললো সে।

'ক্লিক' 'ক্লিক,' 'খুট' শব্দ উঠলো কয়েকবার।

'রানা?'

'চিয়াও, ফোর্যথি। এসব কি হচ্ছে, জানতে পারি?' ভীষণ রকম গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো রানা।

'সে তো আমারও প্রশ্ন, এমিকো। তোমার নামে টার্মিনেশন অর্ডার ইস্যু করা হলো কেন? রানা, করেছো কি তুমি? পৃথিবীর অর্ধেক দেশের সরকার তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। কেন?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী,' বললো রানা। 'সংক্ষেপে বলা সম্ভব নয়। তুমি কি শুনেছো তাই বলো।'

'শুনলাম, তুমি নাকি চীনাদের সাথে হাত মিলিয়ে আমেরিকান সিকিউরিটি এজেন্সির অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছো?'

'তাই নাকি?' তিক্ত কণ্ঠে হেসে উঠলো মাসুদ রানা।

'ফর গড'স সেক, রানা,' ধমকে উঠলো কর্নেল। 'মোটেই হাসির কিছু বলিনি আমি। তুমি বুঝতে পারছো না...'

'বুঝতে আমি ঠিকই পারছি, ভায়া! বোটলে ভুডু খাওয়ার বয়স অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি। দশজন নিরীহ মানুষকে খুন করেছে এনএসএ। এবং আমি তাদের একাদশ শিকার হতে যাচ্ছি।'

'কোথায় তুমি?'

'তোমার আশেপাশেই।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলো কর্নেল ফোর্যথি। 'বলো, কী সাহায্য করতে পারি তোমাকে এ মুহূর্তে।'

'তোমার সাথে কথা বলতে চাই। নিরাপদ একটা জায়গার ব্যবস্থা করো। পারবে না?'

'পারবো। কিন্তু তুমি সাবধান থেকো। খুব সাবধান। আমি নিজে আসবো তোমাকে তুলে নিতে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো মাসুদ রানা। 'থ্যাঙ্কস, মিও এমিকো। খুব চিন্তায় ছিলাম।'

'কোথায় আছো তুমি?'

'লিডো বার, ট্রাসটিভেয়ারে।'

'অপেক্ষা করো। ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি আমি।'

'থ্যাঙ্কস এগেইন, এমিকো।'

ঠিক আধ ঘণ্টা পর, নাম্বার প্লেটবিহীন দুটো সেডান ধীরগতিতে লিডো বারের দশ গজ তফাতে অন্ধকারমতো একটা জায়গায় দাঁড়ালো এসে, নিঃশব্দে। মোট আটজন লোক বের হলো গাড়ি দুটো থেকে। সবার হাতে উদ্যত সাব-মেশিনগান।

সবার সামনে কর্নেল জিয়ানলুকা ফোর্যথি। অন্যদের উদ্দেশে চাপা গলায় বললো সে, 'তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। খবরদার, কেউ যেন আহত না হয়।...আল দিয়েত্রো, সুবিতো!'

চারজন অস্ত্রধারী পা টিপে টিপে বিল্ডিংটার পিছনদিকে চলে গেল। একটু পর কর্নেল ফোর্যথির নেতৃত্বে অন্যরা অস্ত্র উঁচিয়ে চার্জ করলো বারের ভেতর।

রাস্তার উল্টোদিকের একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ছাতে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো মাসুদ রানা। কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না ওর মধ্যে–অন্তত চেহারা দেখে বোঝা গেল না কিছুই।

তিন

গাছ একটা আছেই কোথাও না কোথাও, ভাবছে মাসুদ রানা। কিন্তু কোথায়? প্রাণ বাঁচাতে হলে গাছটা ওকে খুঁজে পেতেই হবে।

কেনিয়ার দুর্ভেদ্য গহীন অরণ্যে ক্ষুধার্ত সিংহের কবল থেকে উপস্থিত বুদ্ধিবলে উদ্ধার পেয়ে ফিরে এসেছেন, এমন এক প্রবীণ শিকারীর বাস্তব অভিজ্ঞতার গল্প এটা। শিকারীদের কাছে খুবই জনপ্রিয়।

গল্পটা হচ্ছে: শিকার থেকে ফিরে ভক্ত শিক্ষানবীশ শিকারীদের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে বলেছিলেন তিনি, 'সিংহটা প্রকাণ্ড। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে আসছে আমার দিকে। তাই দেখে আমার বন্দুক-বাহকরা দে ছুট। মুহূর্তে পালিয়ে গেল সবাই। আমি এখন কি করি? বন্দুক নেই, আশেপাশে তেমন কোনো বড় ঝোপ নেই যে তার আড়ালে গা ঢাকা দেবো। গাছও নেই যাতে উঠে প্রাণ বাঁচাবো। ওদিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে ক্ষুধার্ত সিংহ।'

'কি করে রক্ষা করলেন নিজেকে?' প্রশ্ন করলো এক শিক্ষানবীশ।

'কি ভাবে আর! দৌড়ে সবচে' কাছের গাছটায় গিয়ে উঠে পড়লাম।'

বিস্মিত হলো প্রশ্নকারী। 'কিন্তু এইমাত্র যে বললেন সেখানে কোনো গাছ ছিলো না?'

হাসলেন প্রবীণ শিকারী। 'তুমি বুঝতে পারছো না, গাছ একটা থাকতেই হবে কোথাও না কোথাও।'

সেই গায়েবী গাছটা খুঁজে বের করতে হবে আমাকে, আনমনে ভাবলো মাসুদ রানা। আধ ঘণ্টার বেশি হবে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে কর্নেল ফোর্ষি। এখনই এ দুঃস্বপ্নের স্রষ্টার সাথে কথা বলার উপযুক্ত সময়, সিদ্ধান্ত নিলো ও। তবে যা করার সাবধানে করতে হবে। আধুনিক টেলিফোন ট্রেসিং সিস্টেম বিপদ ডেকে আনতে পারে। খুবই দ্রুত কাজ করে এ সিস্টেম। অতএব বেশি সময় নেয়া চলবে না।

হাঁটতে হাঁটতে কাছের পিয়াথা ভেল তুওমোয় এলো রানা। এলাকাটা প্রায় জনশূন্য। চত্বরের ঠিক মাঝখানে পাশাপাশি চারটে টেলিফোন বুদ। ওর একটা নষ্ট। দরজার হাতলে ঝোলানো একটা বোর্ডে ইটালিয়ানে লেখা: আউট অভ অর্ডার। তিনটেই যথেষ্ট, ভাবলো রানা।

প্রথম বুদে ঢুকলো ও। জেনারেল হিলিংটনের বিশেষ নাম্বারটা বাদ দিয়ে এনএসএ-র সুইচবোর্ড নাম্বারগুলোর একটা ঘোরালো। ও প্রান্ত থেকে অপারেটরের উত্তর শোনা যেতে বললো, 'জেনারেল হিলিংটনের অফিসে দিন, প্লীজ।'

এক মুহূর্ত পরই জেনারেলের এক সেক্রেটারির কণ্ঠ শোনা গেল। 'জেনারেল

হিলিংটনের অফিস।'

রানা বললো, 'একটু অপেক্ষা করুন, প্লীজ। ওভারসীজ কল।' তারের ওপর রিসিভারটা ঝুলিয়ে রেখে দুই লাফে পাশের বুদে এসে ঢুকলো রানা। দ্রুত আরেকটা নাম্বার ঘোরালো সুইচবোর্ডের।

'জেনারেল হিলিংটনের অফিস,' অন্য এক সেক্রেটারির গলা।

'একটু অপেক্ষা করুন, প্লীজ। ওভারসীজ কল।' আবারও একই কাজ করলো ও। আস্তে করে রিসিভার ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেল তৃতীয় বুদে। ডায়াল করলো আরেক নাম্বারে।

'জেনারেল হিলিংটনের অফিস,' অপারেটরের হাত ঘুরে আরেক সেক্রেটারির টেবিলে লাইনটা পৌঁছুবার সাথে সাথে জবাব এলো।

'দিস ইজ মেজর মাসুদ রানা। জেনারেলের সাথে কথা বলতে চাই।'

'একটু ধরুন, মেজর।' ইন্টারকমের সুইচ টিপলো সেক্রেটারি। 'জেনারেল, তিন নম্বর লাইনে মেজর মাসুদ রানা আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

প্রায় চমকেই উঠলেন এনএসএ ডেপুটি। ঝট করে সিধে হয়ে বসলেন। সামনে বসা ডেভিড ম্যাক্সওয়েলকে বললেন, 'শুনলে? মাসুদ রানা, তিন নম্বর লাইনে। ট্রেস করো কলটা, কুইক!'

সাঁৎ করে সামনের একটা ফোনের রিসিভার তুললো ম্যাক্সওয়েল। নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টারের আটটা নাম্বার টিপলো টপাটপ। চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে ওটা। একবার রিঙ হওয়ার সাথে সাথেই ডিউটি অফিসারের গলা শোনা গেল।

'এনওসি। টেড।'

'একটা ইনকামিং কল ট্রেস করতে কতো সময় লাগবে?' জানতে চাইলো ম্যাক্সওয়েল ফিসফিস করে। 'এমার্জেন্সি।'

'এক থেকে দু'মিনিট।'

'গুড! শুরু করে দিন। জেনারেল হিলিংটনের অফিস, এনএসএ, তিন নম্বর লাইন। আমি আছি লাইনে।' জেনারেলের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালো ম্যাক্সওয়েল।

রিসিভার কানে লাগালেন জেনারেল। 'মেজর?'

অপারেশন সেন্টারে, টেড একটা নাম্বার পাঞ্চ করলো কম্পিউটারে। মৃদু গলায় বললো, 'হিয়ার উই গো।'

'হ্যাঁ,' বললো মাসুদ রানা। 'ভাবলাম আপনার সাথে আলোচনার এটাই উপযুক্ত সময়, জেনারেল।'

'আপনি ফোন করায় খুব খুশি হয়েছি আমি, মেজর।'

'রিয়েলি?' নাকে হাসলো রানা।

'শিওর। ইয়ে—আপনি চলে আসুন, মেজর। সামনাসামনি কথা বলা যাবে, কি বলেন। কোথায় আছেন আপনি? যদি বলেন প্লেন পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি আমি। দু'জনে মিলে—'

'অনেক ধন্যবাদ, জেনারেল। প্লেন আজকাল মোটেই নিরাপদ নয়, প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।'

ওদিকে, ইএসএস, ইলেকট্রোনিক সুইচিং সিস্টেম তার কাজ শুরু করে দিয়েছে

এনওসি-র কমিউনিকেশনস্ রুমে। কম্পিউটার স্ক্রীনে একের পর এক ভেসে উঠছে কিছু অক্ষর আর সংখ্যার মিলিত সাঙ্কেতিক বার্তা। AX 121-B···AX 122-C····AX 123-C····

'কি অবস্থা, টেড?' চাপা গলায় প্রশ্ন করলো ম্যাক্সওয়েল।

'নিউ জার্সির এনও সেন্টার এ মুহূর্তে ওয়াশিংটন ডি. সি-র ট্রাঙ্ক লাইন সার্চ করছে, স্যার। হোল্ড অন।'

বার্তাগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল, সাদা হয়ে গেল পর্দা। পরক্ষণেই কয়েকটা শব্দ উদয় হলো সেখানে: 'ওভারসীজ ট্রাঙ্ক লাইন ওয়ান।

'ইউরোপের কোথাও থেকে আসছে কলটা, স্যার,' বললো ডিউটি অফিসার টেড। 'দেশটা ট্রেস করার চেষ্টা করছি আমরা।'

'ও. কে, ও. কে। বাট হারি আপ, প্লীজ।'

জেনারেল হিলিংটন তখন বলছেন, 'মেজর রানা, আমাদের ভেতরে অনিচ্ছাকৃত একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমার একটা পরামর্শ...' থেমে গেলেন তিনি। লাইন কেটে দিয়েছে ওদিকে রানা।

ম্যাক্সওয়েলের দিকে ফিরলেন হিলিংটন। অবাক হয়েছেন। 'ধরা গেল?'

টেলিফোনে টেডকে জিজ্ঞেস করলো সে, 'কি হলো? লাইনটা...'

'সরি, স্যার,' হতাশ গলায় বললো ডিউটি অফিসার। 'ডেড হয়ে গেল লাইন। ট্রেস করা গেল না।'

ওদিকে লাইন কেটে দিয়ে রিসিভারটা ক্র্যাডলে রেখে দিলো মাসুদ রানা। বেরিয়ে এসে দ্বিতীয় বুদের রিসিভার কানে লাগালো।

'মেজর মাসুদ রানা দু'নম্বর লাইনে আছেন, জেনারেল,' ইন্টারকমের মাধ্যমে বললো অন্য এক সেক্রেটারি। 'আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন।'

নীরবে একে অন্যের মুখের দিকে তাকালেন জেনারেল আর ম্যাক্সওয়েল। খেঁকিয়ে উঠলেন হিলিংটন। 'আবার! এবার যেন মিস হয় না, বলে দাও ওদের।'

এনওসি-র নাম্বার ঘোরালো আবার ম্যাক্সওয়েল। 'টেড, আরেকবার চেষ্টা করুন। এবার ধরা চাই। লাইন নম্বর দুই, ফাস্ট!'

'রাইট, স্যার।'

ম্যাক্সওয়েলের ইশারা পেয়ে নির্দিষ্ট লাইনের বোতাম টিপলেন জেনারেল। কানে তুললেন রিসিভার। 'মেজর?'

'বরং আমার পরামর্শটা শুনুন, জেনারেল,' বললো মাসুদ রানা। 'আমার পিছনে একপাল কুকুর লেলিয়ে দিয়েছেন আপনি। এই মুহূর্তে তাদের ফিরিয়ে নিন, জেনারেল। নইলে পরিণতির জন্যে আপনিই দায়ী থাকবেন।'

'আপনি ভুল বুঝছেন, মেজর রানা। আসলে...'

ওদিকে, এনওসি-র কম্পিউটার স্ক্রীন সাদা হয়ে গেল দ্বিতীয়বারের মতো। পরক্ষণেই ভেসে উঠলো নতুন একটি বার্তা: ইস ১৫৫-ও সাবট্রেঙ্ক ৩২১ ভেরিফাইড। সার্কিট ৩০১টু রোম। আটলান্টিক ট্রাঙ্ক ১।

'পেয়েছি!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো টেড টেলিফোনে। 'রোম থেকে আসছে কলটা।'

'নাম্বার আর লোকেশন বের করুন,' বললো ম্যাক্সওয়েল।

ওদিকে রোমে, হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে কথা বলছে রানা। 'একটা কাজ করে দেয়ার অনুরোধ করেছিলেন, করেছি। সফলও হয়েছি।'

'নিশ্চই, মেজর। সে জন্যে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন...'

লাইনে কোঁ কোঁ আওয়াজ উঠতে থেমে গেলেন জেনারেল। রিসিভার রেখে দিয়েছে মাসুদ রানা। 'বাস্-স্-টা-র্ড!' বেকুবের মতো ম্যাক্সওয়েলের দিকে ফিরলেন। 'ফের কেটে দিয়েছে।' দড়াম করে আছড়ে ফেললেন তিনি রিসিভার।

'টেড, নাম্বার আর লোকেশন...' ম্যাক্সওয়েলকেও থেমে যেতে হলো কথা শেষ না করেই।

'এতো দ্রুত সম্ভব নয়, স্যার। সরি।'

সাথে সাথেই আরেক সেক্রেটারির গলা শোনা গেল ইন্টারকমে। 'মেজর মাসুদ রানা, জেনারেল। লাইন নাম্বার ওয়ান।'

হুঙ্কার ছাড়লেন ডেপুটি। 'ফাইণ্ড দ্য বাস্টার্ড!'

ম্যাক্সওয়েলের নির্দেশে আবার নতুন করে কাজ শুরু করলো নিউ জার্সির এনওসি কম্পিউটার।

'মেজর?'

'আমার কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনুন, জেনারেল,' বললো মাসুদ রানা। 'এখনই যদি কুকুরের পাল ফিরিয়ে না নিয়েছেন, সব কথা প্রেসকে জানিয়ে দেবো আমি।'

'আপনি তা করতে পারেন না, মেজর,' ধীর, স্থির গলায় বললেন এনএসএ ডেপুটি। 'তাহলে সারা পৃথিবী আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। আপনি কল্পনা করতে পারেন কি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এ সব প্রেসে গেলে?'

'আপনিও কল্পনা করতে পারবেন না কি করতে যাচ্ছি আমি,' ধমকের সুরে বললো রানা। 'আপনাকে দ্বিতীয় কোনো সুযোগ আমি দেবো না, জেনারেল। ওদের ফিরিয়ে নিন। আর যদি আমার ওপর একটা অ্যাটেম্পটও নেয়া হয়, সোজা প্রেসে যাবে সব।'

'অল রাইট,' বললেন হিলিংটন। 'হার স্বীকার করছি আমি। আপনারই জয় হলো, ওদের ফিরিয়ে নিচ্ছি আমি। এক কাজ করুন, মেজর, চলে আসুন। একসঙ্গে বসে...'

'এনওসি-র যন্ত্রপাতি আরও একটু আধুনিক করার চেষ্টা করুন। সামান্য একটা কল ট্রেস করতে এতো সময় লাগলে চলবে কেন? হ্যাভ আ গুড ডে, জেনারেল।'

দড়াম করে রিসিভার রেখে দিলো রানা।

'এবারও পারলেন না?' খেঁউ খেঁউ করে উঠলো ম্যাক্সওয়েল টেডের উদ্দেশে।

'অল্পের জন্যে পারলাম না, স্যার,' বললো ডিউটি অফিসার। 'তবে শিওর হওয়া গেছে, সেন্ট্রাল রোমের কোথাও থেকে আসছিলো কলগুলো।'

জেনারেল তাকিয়ে ছিলেন। ম্যাক্সওয়েল কান থেকে রিসিভার সরাতে বলে উঠলেন, 'ওয়েল?'

'আমি দুঃখিত, জেনারেল। কেবল জানা গেছে, সেন্ট্রাল রোমের কোথাও

থেকে ফোন করছিলো লোকটা। জেনারেল, ওর হুমকি বিশ্বাস করেন আপনি? তুলে নিতে যাচ্ছেন ওর টারমিনেশন অর্ডার?'

'প্রশ্নই আসে না।' হঠাৎ করেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন ডেপুটি।

চার

ওরা সম্ভবত এয়ারপোর্ট রেলস্টেশন বাস টার্মিন্যাল আর কার রেন্টাল সার্ভিসগুলোর ওপরই বেশি বেশি নজর রাখছে, ভাবলো মাসুদ রানা। যাতে রোম ছেড়ে পালাতে না পারে ও। কাজেই জায়গাগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। এখন আর হোটেলেও ওঠা চলবে না। এতোক্ষণে তাদের কাছেও নিশ্চয়ই ওর চেহারার বর্ণনাসহ রেড নোটিশ চলে গেছে।

চাইলে একটা গাড়ি যোগাড় করে নিতে পারে রানা সহজেই। কিন্তু ঝুঁকি নিতে সায় দিচ্ছে না মন। ছয়-সাতটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির অপারেটররা দল বেঁধে খুঁজছে ওকে। নিশ্চয়ই পথে পথে ব্লকেড বসানো হয়েছে। ছবি না থাকুক, চেহারার বর্ণনা থেকেই ধরা পড়ে যাবে রানা। প্রতিপক্ষ কোনও একক সন্ত্রাসী সংগঠন নয় বা ক্রিমিন্যাল গ্যাঙ নয়, ইউরোপ-আমেরিকার হাইলি স্কিলড্ এসপিওনাজ এজেন্ট-সংখ্যায় কতো, আল্লা মালুম। কর্নেল কোয়ম্বির কথা মনে হতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো মাসুদ রানা, আশ্চর্য!

তার মতো বন্ধু মানুষ-ই যখন···। জেনারেল হিলিংটনকে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। মুখে যা-ই বলুন, এতো সহজে নিষ্পত্তি হবে না সমস্যার। এ ষড়যন্ত্রের হোতা কে, গোড়া কোথায়, ওকে জানতে হবে আগে। কিন্তু আজ রাতে ঢাকায় ফোন করার ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। তাতে ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে যেতে পারে। কাল কথা বলবে রানা মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের সাথে।

আগের কাজ আগে। রোম ছাড়তে হবে ওকে। গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে আপাতত। একজন সঙ্গী দরকার, ভাবলো রানা, মেয়ে সঙ্গী হলে সবচেয়ে ভালো হয়। একা মাসুদ রানাকে খুঁজছে ওরা, কোনও যুগলকে নয়। একটু চিন্তা করে পরিপাটি ব্যাকব্রাশ করা চুলগুলো এলোমেলো করে দিলো রানা হাত দিয়ে।

পিয়াযযার ও প্রান্তে বড় রাস্তায় একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। মাতালের মতো হেলেদুলে সেদিকে এগোলো ও। 'অ্যাই,' জড়ানো কণ্ঠে চেঁচিয়ে ডাকলো, 'ট্যাক্সি!'

ঝিমুচ্ছিলো ড্রাইভার। চোখ মেলে ঘুরে তাকালো। লোকটা হদ্দ মাতাল বুঝতে পেরে আবার নিজের কাজে মন দিলো। দশ ডলারের একটা নোট বের করে ওটা দিয়ে তার নাকে বাতাস দিলো রানা।

'একজন সঙ্গী চাই আমার। যোগাড় করে দিতে পারবে?'

রেশ কেটে গেছে ড্রাইভারের। নোটটার দিকে তাকালো সে। 'মেয়ে?'

খ্যাক খ্যাক করে বিশ্রিভাবে হেসে উঠলো রানা। নোটটা গুঁজে দিলো তার পকেটে। 'সি, সি। মেয়ে!'

সিধে হলো লোকটা। পিছনে হাত নিয়ে খুলে দিলো ক্যাবের দরজা। মাথা দুলিয়ে বললো, 'আনদিয়ামো।'

উঠে বসলো রানা। রওনা হলো ট্যাক্সি। ড্রাইভারের নজর বাঁচিয়ে পিছন দিকে তাকালো ও। না, কোনও গাড়ি নেই পিছনে। তবুও তলপেটে সামান্য শিরশিরে অনুভূতি জাগলো ওর। কর্নেল জিয়ানলুকা কোয়ম্বির সতর্কবাণীটা এখনও কানে ভাসছে। "পৃথিবীর অর্ধেক দেশের সরকার তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, রানা"।

বিশ মিনিট পর রোমের রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট, ট্রু ডি ভউনট পৌঁছুলো ট্যাক্সি। বারবণিতা পল্লী। প্যাসেঞ্জিটা আর্কিওলজিকা ছাড়িয়ে এসে গাড়ি দাঁড় করালো ড্রাইভার।

'নামুন, সেনর,' বললো লোকটা। 'এদের মধ্যে থেকে খুঁজে নিন।' ইশারায় খদ্দের ধরার আশায় অপেক্ষমাণ ডজনখানেক কিশোরী-তরুণীর দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

'থ্যাঙ্কস, বাডি।' টেনে-হিঁচড়ে নিজেকে বের করলো রানা। মিটার দেখে ভাড়া মেটালো। দেরি না করে স্থান ত্যাগ করলো ট্যাক্সি। এদিক ওদিক তাকিয়ে আশ্বস্ত হলো মাসুদ রানা, কোনও পুলিশ নেই আশপাশে। কয়েকটা প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিরাট জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে এ পল্লী। পরিচ্ছন্ন-ছিমছাম। সুন্দর দামী পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আকর্ষণীয় চেহারার অল্পবয়সী মেয়েরা। ওদের মধ্যে একটি অপূর্ব-সুন্দরী নজর কাড়লো রানার। প্রায় ওর কাঁধ সমান লম্বা হবে মেয়েটি। কালো স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ এবং তার ওপর উটের পশমে তৈরি একটা কোট পরে আছে। প্রায় কোমর পর্যন্ত লম্বা ঘন কালো চুল। টানা টানা চোখ। কাঁধে একটা বড় ব্যাগ ঝুলছে। রানার মনে হলো এ মেয়ে নিশ্চয়ই পার্ট টাইম অভিনেত্রী বা মডেল হবে। ওর দিকেই চেয়ে আছে মেয়েটি।

'হাই, বিউটিফুল।' আছড়ে পড়তে পড়তেও শেষ মুহূর্তে সামলে নিলো রানা, টলোমলো পায়ে এগিয়ে গেল তার দিকে। 'ইংরেজি বলতে পারো?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। চলো।' খপ্ করে মেয়েটির হাত ধরলো রানা।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে একটু হাসলো সুন্দরী। মাতাল খদ্দের বিপজ্জনক, ভাবলো সে। নরম কণ্ঠে বললো, 'যাচ্ছি। আগে নিজেকে সামাল দাও।'

'আমি ঠিক আছি।' মেয়েটির কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ালো ও। 'ঠিক আছি আমি।'

নাক টানলো মেয়েটি। ভাবলো, ব্যাপার কি? কোনও মদের গন্ধ তো নেই গায়ে! অভিনয় করছে না তো? 'একশো ডলার খরচ করতে রাজি আছো?'

'নিশ্চই।'

'চলো তাহলে। কাছেই একটা হোটেল আছে, ওখানে যাওয়া যাক।'

'চলো। কি নাম তোমার?'

'লুইসা।'

'আমি অ্যাডামস।' এই সময় হঠাৎ করেই একটা পুলিশ কার দেখা গেল দূরে, এদিকেই আসছে ধীরগতিতে। লুইসার হাত ধরে টান দিলো রানা। 'জলদি চলো।'

'তুমি আমেরিকান, অ্যাডামস?'

জোরে পা চাপা, ছুঁড়ি! 'হ্যাঁ।'

হোটেলটা তৃতীয় শ্রেণীর। সুবিধেই হলো তাতে রানার। ডেস্কে বসা ছোকরা বয়সী কেরানী এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলো। দিন-রাত সারাক্ষণ এসব দেখে অভ্যস্ত সে। একটা চাবি তুলে দিলো মেয়েটির হাতে। 'রুম নাম্বার টোয়েন্টি এইট। ফিফটি থাউজ্যাণ্ড লিরা,' বললো সে।

রানার দিকে ফিরলো লুইসা। কিছু বলার আগেই পকেট থেকে টাকা বের করে কেরানীর হাতে দিলো ও। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিজেদের বরাদ্দ রুমে চলে এলো দু'জনে। রুমটা বেশ বড়। এক কোণে একটা ডবল খাট, একটা ছোট টেবিল, দুটো কাঠের চেয়ার, এই হলো ফার্নিচার। সংলগ্ন বাথরুমে একটা বেসিনও আছে। দরজা লাগিয়ে দিলো রানা রুমের।

'টাকা কিন্তু অগ্রীম দিতে হবে, অ্যাডামস,' বললো লুইসা।

'শিওর।' পাঁচটা বিশ ডলারের নোট ধরিয়ে দিলো ও তার হাতে।

'গ্র্যাৎসি।'

ঘরের আলো নিভিয়ে দিলো রানা। রাস্তার দিকের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, পর্দা সামান্য সরিয়ে উঁকি দিলো। ওদিকে লুইসা কাপড় খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পলকহীন চোখে বাইরের দিকে চেয়ে থাকলো রানা ঝাড়া পাঁচ মিনিট। তেমন কোনও অস্বাভাবিক তৎপরতা চোখে পড়লো না কোথাও। হয়তো ফরাসী ট্রাক ধাওয়া করছে ওরা সবাই ঝাঁক বেঁধে। পর্দা ছেড়ে সরে এলো মাসুদ রানা।

আলো জ্বেলেই বেকুব হয়ে গেল। শুধু ব্রা আর জাঙ্গিয়া পরে দাঁড়িয়ে আছে লুইসা। হাসছে। 'কাপড় খুলছো না যে, অ্যাডামস?'

আমতা আমতা করতে লাগলো রানা। 'ইয়ে, মানে মাথাটা ধরেছে খুব। বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছি আজ। ভাবছি ঘুম দেবো…'

'তাহলে কেন নিয়ে এলে আমাকে?'

'তখন আসলে অতোটা খারাপ লাগেনি। আজকে না হয় থাক ওসব, হানি। কাল হবে।'

কাঁধ শ্রাগ করলো মেয়েটি। 'তোমার খুশি। কিন্তু আমাকে তো বসে থাকলে চলবে না, অ্যাডামস। দুটো পয়সার জন্যেই এসব করি আমি।'

'তা নিয়ে ভেবো না।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা। গুনে গুনে আরও দশটা একশো ডলারের কড়কড়ে নোট ধরিয়ে দিলো ওর হাতে। 'নাও। চলবে?'

আবারও নিজেকে প্রশ্ন করলো লুইসা, ব্যাপার কি? বিমূঢ়ের মতো নোটগুলোর দিকে চেয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। লোকটার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো সে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। রাতভর চেষ্টা করলেও দু'জনের বেশি খদ্দের যোগাড় হবে না। তাতে কতোই বা আর হবে? তারচেয়ে সুযোগ যখন এসেই গেল, বিনা শ্রমে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়া যাক রাতটা। তাছাড়া এই আজব লোকটার আকর্ষণও এর একটা বড় কারণ। হলপ করে বলতে পারে লুইসা, অভিনয় করছে অ্যাডামস্। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লোকটা মদ ছুঁয়েও দেখেছে কি না, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ

আছে। পর্দা সরিয়ে কি দেখছিলো ও এতোক্ষণ রাস্তার দিকে?

'বেশ,' বললো মেয়েটি। 'কিন্তু বিছানা তো একটা।'

'ওতে অসুবিধে নেই। তুমি শুয়ে পড়ো।'

আবার আলো নিভিয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো রানা। অন্ধকারে কয়েক মুহূর্ত ওর চওড়া কাঁধের দিকে চেয়ে থাকলো লুইসা। 'কাউকে খুঁজছো মনে হয়?'

প্রশ্নটা শুনতে পায়নি রানা। পাল্টা প্রশ্ন করলো ওকে। 'পিছন দিক দিয়ে বেরোনোর পথ আছে না হোটেলের?'

থতমত খেয়ে গেল লুইসা। এ প্রশ্ন কেন? ভাবলো ও, দেখে তো ক্রিমিন্যাল বলে মনে হয় না। তাহলে? পিছন দরজা কেন? 'হ্যাঁ, আছে,' বললো ও।

বাইরে থেকে আচমকা এক চিৎকার উঠলো নারীকণ্ঠের, আওয়াজটা কানে ঢোকামাত্র চরকির মতো ঘুরে দাঁড়ালো মাসুদ রানা। হাতে চলে এসেছে ওয়ালথার পি. পি. কে। অন্ধকারের জন্যে অস্ত্রটা চোখে পড়লো না লুইসার।

আবার শোনা গেল কণ্ঠটা। 'দিও! দিও! সোনো ভেনুতা ত্রি ভোল্‌টি!'

হেসে ফেললো রানা। যদিও বুকটা ধড়ফড় করছে এখনও। ওটি আরেক বারবণিতা। কারও উদ্দেশে বলছে, 'এই নিয়ে আজ তিনবার এলাম এখানে।' ওদিকে লুইসাও হাসছে, দেখতে পেলো না রানা। অস্ত্রটা হোলস্টারে রেখে দিলো।

'ঘুমাবে না?' প্রশ্ন করলো লুইসা।

'হ্যাঁ।' খাটের কিনারায় এসে বসলো রানা। 'তুমি শুয়ে পড়ো।'

'ঘুমাতে পারবো তো?'

'মানে?' বিস্মিত হলো রানা।

'নাক ডাকলে ঘুমাতে পারি না আমি।'

'ও। না, নাক ডাকে না আমার। নিশ্চিন্তে ঘুমাও।'

উঠে এলো রানা। একটা সিগারেট ধরালো। বিছানার স্প্রিঙের মৃদু আওয়াজে টের পাচ্ছে, এপাশ ওপাশ করছে মেয়েটি। কয়েক মিনিটের মধ্যে থেমে গেল ওর নড়াচড়া, ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরও খুব লোভ হলো শুয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে নেয় প্রাণ ভরে।

কিন্তু তার উপায় নেই। ঘুম এখন হারাম ওর জন্যে। একটা চেয়ার জানালার পাশে নিয়ে এসে বসলো মাসুদ রানা। সাথে সাথে শরীরের সবগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাড়ের সংযোগ একটু বিশ্রামের জন্যে নীরবে চিৎকার করতে শুরু করে দিলো। পাত্তা দিলো না রানা। স্থির চোখে চেয়ে থাকলো রাস্তার দিকে।

চোখে মুখে কড়া সূর্যের আলো পড়তে ধড়মড় করে উঠে বসলো রানা। অপ্রস্তুতের মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, বুঝতে পারছে না কোথায় আছে। চারদিকে তাকাতে ধীরে ধীরে সব মনে পড়লো। বসে থাকতে থাকতে জানালার কিনারায় হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলো ও ভোরের দিকে। পেশীতে টান পড়লো রানার। ঘড়ি দেখলো, আটটা বেজে পাঁচ।

ইশ্! চট করে চেয়ার ছাড়লো ও। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। বাথরুম থেকে লুইসার গুনগুন গান শোনা যাচ্ছে। দরজা খোলা রেখে আয়নার সামনে চুল ব্রাশ করছে মেয়েটি। কাপড় পরেনি এখনও।

'বুওন গিওরনো,' হাসলো লুইসা।

'বুওন গিওরনো।'

'এবার কি করতে হবে আমাকে, অ্যাডামস?'

উত্তর দিলো না রানা। প্রশ্নটা শুনতে পায়নি। রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে টর ডি অউনট অনেক আগেই। রাস্তায় পিল্ পিল্ করছে পথচারী আর গাড়ি-ঘোড়া। ওর মধ্যে কোথাও বিপদ ওঁৎ পেতে আছে কি না বোঝার উপায় নেই।

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়া উচিত, ভাবলো রানা। এই সময় লুইসার আচমকা এক প্রশ্নে বেসামাল হয়ে পড়লো ও।

'জেনারেল হিলিংটন কে, অ্যাডামস?'

চমকে গেল রানা। 'জেনারেল হিলিংটন?' বেকুবের মতো চেয়ে থাকলো মেয়েটির দিকে। 'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'না, এমনিই। ঘুমের মধ্যে খুব ঝগড়া করেছো তুমি লোকটার সাথে।'

আশ্বস্ত হলো মাসুদ রানা। 'তাই বলো। ভদ্রলোক আমার বন্ধু মানুষ।'

চোখ কপালে উঠলো লুইসার। 'তোমার বন্ধু! একজন জেনারেল?' ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাতে লাগলো।

'হ্যাঁ। যাকগে, শোনো। দু'তিনদিনের জন্যে রোমের বাইরে যাবো আমি বিজনেস ট্যুরে। তুমিও চলো না বেড়িয়ে আসবে?'

'আমি?' হাত থেমে গেল তার। 'কোথায়?'

'ভেনিস। একা একা কোথাও যেতে একদম ভাল্লাগে না। কখনও গিয়েছো ভেনিস?'

'না। কিন্তু...'

'টাকার জন্যে ভেবো না। ওখানে দামী ফাইভ স্টার হোটেলে থাকবো। ভালো ভালো গিফট পাবে। কি বলো, যাবে?' আবার রাস্তার দিকে নজর দিলো ও।

কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো লুইসা। 'যাবো।'

'গুড। দৈনিক এক হাজার ডলার পাবে আমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে। চলবে?'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাথা দোলালো মেয়েটি। ও ভেবেছিলো রোজকার জন্যে পাঁচশো ডলার চাইবে।

ওর হাতে দু'হাজার ডলার তুলে দিলো রানা। 'রাখো,' বললো ও। 'অগ্রিম।'

টাকাটা নিয়ে হাতব্যাগে ঢোকালো মেয়েটি। আবার সন্দেহটা নাড়া দিলো ওকে। কে এই লোক? নিচে নেমেও লোকটার একইরকম আচরণ লক্ষ্য করলো সে। বাইরে পা রাখার আগে কম করেও পাঁচটি মিনিট ব্যয় করলো অ্যাডামস দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

এ কোন যন্ত্রণায় পড়লাম? ভাবলো লুইসা. কেউ হয়তো খুন-টুন করতে চাইছে একে। নিশ্চয়ই খারাপ একটা কিছু ঘটিয়ে এসেছে ব্যাটা। আমি যাচ্ছি না এর সাথে, সিদ্ধান্ত নিলো সে। মাত্র ক'দিন আগেই তার প্রিয় বান্ধবী মারা পড়েছে এমনি এক পয়সাওয়ালা বিদেশী খদ্দেরের হাতে। অতএব, ও যাচ্ছে না কোথাও।

'অ্যাডামস,' এগিয়ে এসে পিছন থেকে রাস্তা পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত মাসুদ রানার কাঁধে হাত রাখলো সে। 'হঠাৎ একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল।

তোমার সাথে যাওয়া সম্ভব...'

ওর হাত ধরে টান দিলো রানা। 'এসো। ওখানে কি কি পাওয়া যায় দেখা যাক।'

'কোথায়?'

রাস্তার ওপাশের বড় একটা জুয়েলারি দোকান দেখালো রানা। 'তোমার মতো সুন্দরীকে এমারেল্ড ব্রেসলেট ছাড়া একেবারেই মানায় না।'

'হোয়াট?'

'এসো তো। কথা বাড়িও না।'

রাস্তা পেরিয়ে দোকানটায় এসে ঢুকলো ওরা। শো কেসে সাজানো হাজারো দামী দামী চোখ ধাঁধানো ডিজাইনের গহনার দিকে চেয়ে থাকলো লুইসা হাঁ করে।

'বুওন গিওরনো,' হাসিমুখে রানার দিকে এগিয়ে এলো এক সেলসম্যান। 'সেনরিনার জন্যে বিশেষ কিছু খুঁজছেন, সেনর?'

'ঠিক ধরেছেন। একটা এমারেল্ড ব্রেসলেট খুঁজছি।'

'আছে আছে। চমৎকার ব্রেসলেট আছে, সেনর।' তাড়াতাড়ি কেস থেকে একটা বাক্স বের করলো লোকটা। ডালা খুলে এগিয়ে দিলো। 'দেখুন, সেনর, এরকম ব্রেসলেট আর কোথাও পাবেন না।'

'কি, পছন্দ হয়?' লুইসার কাঁধে হাত বোলালো রানা।

ভাষা হারিয়ে জিনিসটার দিকে চেয়ে আছে সে বিস্ফারিত চোখে। এ অলঙ্কার পরার সৌভাগ্য তার কোনদিন হবে, কল্পনাই করেনি। বহুকষ্টে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালো লুইসা।

সেলসম্যানের দিকে ফিরলো রানা। 'কতো দাম?'

'পঞ্চাশ হাজার ডলার, সেনর।'

'অল রাইট।' ক্রেডিট কার্ডটা বের করে বাড়িয়ে দিলো রানা। ওটা নিয়ে লোকটাকে কাউন্টারের পিছনের একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে আল্লা আল্লা করতে লাগলো–ফ্যাসাদ না বাধলেই বাঁচি। দু'মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো লোকটা। কার্ডটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, 'ব্রেসলেটটা প্যাক করে দেবো, সেনর?'

'না, ধন্যবাদ।' ব্রেসলেটটা লুইসার কব্জিতে পরিয়ে দিলো মাসুদ রানা। তারপর হাতটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো মুগ্ধ হওয়ার ভঙ্গিতে। 'ওহ্, দারুণ!'

'হ্যাঁ,' কোনমতে বললো মেয়েটি। এখনও বিশ্বাস করতে বাধছে জিনিসটা সত্যিই ওর জন্যে কেনা হয়েছে। 'কি বলে...কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো তোমাকে।'

'কোনো প্রয়োজন নেই।' বেরিয়ে এলো ওরা। যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমন ভঙ্গিতে বললো রানা, 'ভালো কথা, তোমার গাড়ি আছে?'

'না। ছিলো অবশ্য ঝরঝরে একটা, চুরি হয়ে গেছে।'

'ড্রাইভিং লাইসেন্স?'

'হ্যাঁ, তা আছে। কিন্তু শুধু লাইসেন্স দিয়ে কি হবে?'

'সঙ্গে আছে?'

'হ্যাঁ।' হাতব্যাগটায় দুটো চাপড় দিলো লুইসা। 'পুরো সংসার এর মধ্যে নিয়ে

ঘুরি আমি।'

'গুড।' ইশারায় একটা ট্যাক্সি ডাকলো রানা। উঠে পড়লো মেয়েটিকে নিয়ে। 'ভায়া পো, প্লীজ,' বললো ও ড্রাইভারকে।

পাশ ফিরে রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকলো লুইসা। ওর সঙ্গ পাওয়ার আশায় লোকটা এতো ব্যগ্র কেন? কেন এতো খরচ করছে ওর জন্যে? অথচ এ পর্যন্ত একটিবারের জন্যেও স্পর্শ করেনি ওকে। কেন? লোকটা কি অক্ষম?

ম্যাগিওর'স কার রেন্টাল এজেন্সির একশো গজ দূরে গাড়ি থামাতে বললো রানা। লুইসার দিকে ফিরে বললো, 'চলো, নামো।'

ট্যাক্সিটা স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ও। তারপর পকেট থেকে এক থোক লিরা বের করে লুইসাকে দিয়ে বললো, 'ম্যাগিওর'স থেকে নিজের নামে একটা গাড়ি ভাড়া করো। ফিয়াট অথবা আলফা রোমিও নেবে, ওকে? বলবে, সপ্তাখানেকের জন্যে গাড়িটা চাই তোমার।'

ফ্লোরেন্সগামী প্রশস্ত অটোস্ট্রাডায় দাঁড়িয়ে আছে লাল রঙের একটি ফরাসী ট্রাক। ওটার সামনে পিছনে চারটে সেডান। মোটা ফরাসী ড্রাইভারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আট দশজন সাইফার অপারেটর। তাদের প্রশ্নের উত্তরে মাথার ওপরে হাত তুলে শূন্যে ছুঁড়ছে ড্রাইভার রেগেমেগে।

'বিশ্বাস করুন, মঁশিয়ে। এর কিছুই জানি না আমি। নিশ্চই কাজটা কোনো চুতিয়া ইটালিয়ান করেছে।'

হাতে নিয়ে অপারেটররা সবাই-ই একবার করে চোখ বোলালো কাগজের মতো পাতলা ডিভাইসটার ওপর। এতোদূর ছুটে এসে এরকম ফলাফল আশা করেনি তারা।

নিজের অফিসে চিন্তিত মুখে বসে আছে কর্নেল জিয়ানলুকা ফোয়ঘি। ফরাসী ট্রাক ধাওয়াকারী দলের প্রধানের সাথে এইমাত্র কথা হয়েছে টেলিফোনে। মাসুদ রানার টারমিনেশন অর্ডার পাঠাবার আগে তাকে ফোন করেছিলেন এনএসএ ডেপুটি চীফ। বলেছিলেন: কোনো সমস্যা হবে না। সময়মতো হোমিং ডিভাইসটা অ্যাকটিভেট করে দেয়া হবে। খুব সহজেই ধরা পড়বে ও।

তখনই বুঝেছিলো ফোয়ঘি, মোটেই সহজ হবে না। যদিও এ নিয়ে জেনারেলকে কিছু বলেনি সে। এখন বোঝা যাচ্ছে, তার ধারণাই সঠিক ছিলো। সত্যিই কাঁচকলা দেখিয়েছে রানা।

ওয়াশিংটন ডি. সি। জেনারেল হিলিংটনের মুখোমুখি বসে আছে 'কিলিং মেশিন', কর্নেল হ্যারিসন কেলার।

'সাইফার এজেন্টরা ছাড়াও আমাদের প্রায় অর্ধেকসংখ্যক অপারেটিভ খুঁজে বেড়াচ্ছে মাসুদ রানাকে,' বললেন জেনারেল। 'কিন্তু কপাল মন্দ। এখনও ধরা সম্ভব হয়নি ওকে।'

'শুধু কপালে কাজ হবে না।' নড়েচড়ে বসলো কর্নেল। 'এ লাইনে মাসুদ রানা

অভিজ্ঞ ঘুঘু।'

'একটু আগে পঞ্চাশ হাজার ডলার চার্জ করেছে হারামজাদা। অথচ ওই কার্ডের ভেতর যে ডিভাইসটা ছিলো, ওটা পাওয়া গেছে এক ফ্রেঞ্চ ট্রাকে। তার মানে বিপদ টের পেয়ে ওটা বের করে ফেলেছে ও কায়দা করে। এরকম যে ঘটতে পারে, ডিভাইসটা প্ল্যান্ট করার সময় আমার মাথাতেই আসেনি। সে যা-ই হোক, রোম থেকে বেরোতে হবে না বাছাধনকে। আমরা এখন জানি, কেভিন পারকার নামের নকল পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও। আরও আছে, কাল রোমে আমাদের এমব্যাসির পাসপোর্ট ডিভিশন থেকে ওয়েবস্টার নামে ইস্যু করা একটা পাসপোর্ট চুরি গেছে। ওটার মালিককে রানার ছবি দেখানো হয়েছে। লোকটা হলপ করে বলেছে, রানার সাথেই ধাক্কা লেগেছিলো তার পাসপোর্ট নিয়ে লাইন থেকে বেরিয়ে আসার সময়। অর্থাৎ, সত্যি হোক আর না হোক, আমরা ধরে নিয়েছি, এই দুই পাসপোর্টই ব্যবহার করবে রানা। সবচেয়ে...' কর্নেলকে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেলেন ডেপুটি। ভুরু নাচালেন। 'কি?'

'মেজর মাসুদ রানাকে যদি ঠিক ঠিক চিনে থাকি, তাহলে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, ওই দুই নামে খুঁজলে অন্তত এ জনমে ওর সন্ধান পাবেন না। যে পথে মাসুদ রানা চলবে বলে আপনি ভাববেন, সে পথ মাড়াবেই না লোকটা। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, যাকে আমরা ধাওয়া করছি, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পাইদের একজন সে। সম্ভবত তাদের ভেতরেও সেরা। লোকটা নিজে থেকে মুখ না দেখালে কিছুতেই ধরতে পারবেন না আপনি। আমার ধারণা, ওকে গর্ত থেকে বের করতে হলে ধোঁয়া দিয়ে বের করতে হবে। এ মুহূর্তে মাসুদ রানাই নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদেরকে। ঠিক জায়গামতো ধোঁয়া দেয়া সম্ভব হলে নিয়ন্ত্রণটা আমাদের হাতে চলে আসবে।'

'কি ভাবে?'

'রেডিও-টিভিতে ঘোষণা করে দিন...'

'উঁহু, উঁহু,' প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগলেন জেনারেল। 'তাতে আমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'তা কেন হবে? বিজ্ঞপ্তিটা পুলিশের তরফ থেকে যাবে। মাসুদ রানাকে ড্রাগ স্মাগলিঙের জন্যে খোঁজা হচ্ছে বললেই দেখবেন, পানির মতো সহজ হয়ে যাবে কাজটা। সেক্ষেত্রে আমরা সব দেশের পুলিশের সাহায্য পাবো। ড্রাগ স্মাগলিঙের অভিযোগ আনলে খুশিমনেই সহায়তা দেবে তারা। আর ওদের সাথে ইন্টারপোল তো রয়েইছে। বিপদ বুঝে তখন মাসুদ রানা নিজেই ধরা দেবে।'

মুখটাকে বাংলা '৫' বানিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন জেনারেল। 'ঠিক। এ সম্ভাবনার কথা ভাবিনি। চমৎকার আইডিয়া বের করেছেন।'

আসন ছাড়লো কর্নেল হ্যারিসন কেলার। 'ওই কথাই রইলো তাহলে। আপনি সব পাকা করে ফেলুন। আমি রোম চললাম। অপারেশনের দায়িত্ব নিজের হাতে নিতে না পারলে শান্তি হবে না। মাসুদ রানাকে মুঠোয় না পুরতে পারলে ঘুমও হবে না।'

দোরগোড়া পর্যন্ত এসে কর্নেলকে বিদেয় জানালেন জেনারেল হিলিংটন। হাজার

হোক মানুষটা কোবরার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র।

পাঁচ মিনিট পর, একটি কালো লিমুজিন এগ্রুজ এয়ার ফোর্স বেসের দিকে ছুটলো কর্নেল কেলারকে নিয়ে। পিছনে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে সে, গালে হাত দিয়ে চেয়ে আছে রাস্তার দিকে। জীবনের ভয়ঙ্করতম খেলায় মেতেছে সে, কোনও সন্দেহ নেই তাতে। যে করে হোক খুঁজে বের করতেই হবে মেজর মাসুদ রানাকে। অনেক কিছু নির্ভর করছে এর ওপর।

সময়ের একটু হেরফের হলেই সর্বনাশ ঘটে যাবে।

পাঁচ

পনেরো মিনিটের মধ্যে একটা নীল ফিয়াট নিয়ে ফিরে এলো লুইসা। 'ওপাশে যাও,' বললো মাসুদ রানা। 'আমি চালাবো।'

'এখনই ভেনিস রওনা হচ্ছি আমরা?' ও উঠে বসতে প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

'একটু পর। আগে কয়েকটা জরুরী কাজ আছে।' ভিয়েলি রোজিনিতে গাড়ি থামালো রানা, রোজিনি ট্রাভেল সার্ভিসের সামনের ফুটপাথ ঘেঁষে। 'তুমি বসো। আমি আসছি।'

দৃঢ় পায়ে হেঁটে অ্যাডামসকে অফিসটায় ঢুকতে দেখলো লুইসা। ভাবলো, এ মুহূর্তে ইচ্ছে করলেই গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যেতে পারি আমি। খুঁজে পাবে না ও আমাকে। ভাবনাটা খানিকটা স্বস্তি দিলো ওকে কেবল। সরে গিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসা বা গাড়ি চালিয়ে সরে পড়ার কোনও আগ্রহ অনুভব করলো না।

ওদিকে, ভেতরে ঢুকে কাউন্টারে এক যুবতী সেলস অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে মাসুদ রানা। 'কয়েকটা রিজার্ভেশন করাতে চাই।'

'শিওর,' হেসে বললো যুবতী। 'সেজন্যেই তো আছি আমরা, সেনর। কোথায় কোথায় যাবেন, বলুন।' সামনে রাখা কম্পিউটারের কী-বোর্ডে মেনিকিওর করা দীর্ঘ, সরু আঙুল রাখলো মেয়েটি।

'প্রথমে বেইজিং। ফার্স্ট ক্লাস এয়ারলাইন টিকেট চাই। ওয়ান ওয়ে।'

'হুঁ হুঁ।' কয়েকটা কী টিপলো অফিসার। 'কবে যেতে চাইছেন?'

'আগামী শুক্রবার।'

'বেনে।' আরও কয়েকটা কী টিপলো সে। সামান্য একটু বিরতি দিয়ে পর্দায় ভেসে উঠলো হিজিবিজি কিছু লেখা। 'ওইদিন সন্ধে সাড়ে সাতটায় এয়ার চায়নার একটা ফ্লাইট আছে, সেনর। রোম টু বেইজিং। ওটায় হলে চলবে?'

'চলবে।'

কয়েক সেকেন্ড পর পর্দা থেকে চোখ সরালো মেয়েটি। 'কি নামে রিজার্ভ করবো, সেনর?'

'মেজর মাসুদ রানা।'

আবার কয়েকটা চাবি টিপলো সে। 'রিজার্ভেশন কনফার্মড। টিকেটের দাম কি...'

'দাঁড়ান, শেষ হয়নি এখনও। রোম-বুদাপেস্ট ট্রেন টিকেট চাই আরেকটা। ওটাও ফার্স্ট ক্লাস।'

'কবেকার, মেজর? কি নামে?'

'সোমবারের। একই নামে।'

অবাক হলো মেয়েটি। 'আপনি বেইজিং যাচ্ছেন শুক্রবার। আবার...'

'আরও আছে,' একঘেয়ে সুরে বললো রানা। 'আলইটালিয়ার রোম-মায়ামি ওয়ান ওয়ে টিকেট কনফার্ম করুন আরেকটা। বুধবারের যে কোনো ফ্লাইট।'

'কি নামে?'

তার চোখে চোখ রেখে হাসলো রানা। 'মেজর মাসুদ রানা।'

চেহারার বিস্ময় এবং বিরক্তি চাপা দিতে পারলো না আর মেয়েটি। 'সেনর, আপনি কি ঠাট্টা...'

কার্ডটা বের করলো ও। 'টিকেটগুলো এটার ওপর চার্জ করুন।'

চোখ কুঁচকে কার্ডটা উল্টে পাল্টে দেখলো অফিসার। তারপর 'এক্সকিউজ মি,' বলে আসন ছাড়লো। ঘুরে দরজার কাঁচ দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো রানা। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তবলা বাজাচ্ছে কাউন্টারে। জানালা দিয়ে এদিকেই চেয়ে আছে লুইসা। ফিরে এলো অফিসার।

'ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ঠিক আছে।' কম্পিউটারের সামনে বসলো সে। পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে গেল টিকেটগুলো।

'ওগুলো আলাদা আলাদা খামে ভরে দেবেন, প্লীজ।'

'শিওর, মেজর। কোন্ ঠিকানায় পাঠাবো টিকেটগুলো?'

'তার দরকার হবে না,' বললো রানা। 'আমিই নিয়ে যাবো।'

'সি, সেনর।'

ক্রেডিট কার্ড স্লিপে সই করে রসিদ নিলো রানা। টিকেটের খাম তিনটে পকেটে পুরলো। 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'হ্যাভ আ নাইস ট্রিপ...ইয়ে...ট্রিপস্, মেজর।'

বেরিয়ে গেছে রানা ততোক্ষণে। গাড়িতে উঠে খাম তিনটে ড্যাশবোর্ডের ওপর রেখে স্টার্ট দিলো ও। 'আরেকটা কাজ করতে হবে তোমাকে, হানি।'

'কি কাজ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো লুইসা।

'চলো, বলছি।' শ'খানেক গজ এগিয়ে হোটেল ভিকটোরিয়ার সামনে গাড়ি থামালো রানা। একটা খাম তুলে দিলো তার হাতে। 'এখন থেকে তুমি মেজর মাসুদ রানার সেক্রেটারি। ভেতরে যাও, ডেস্কে গিয়ে তোমার বসের নামে একটা স্যুইট রিজার্ভ করো। বলবে এক ঘন্টার মধ্যে হোটেলে পৌঁছুবেন মেজর।'

চোখ কোঁচকালো লুইসা। 'কে এই মেজর?'

'পরে বলছি। স্যুইট নিজে দেখে পছন্দ করবে তুমি। আর, বেরিয়ে আসার আগে এই খামটা রেখে আসবে স্যুইটে।'

'আর কিছু?'

almsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

'না,' হাসলো মাসুদ রানা। 'আপাতত এইটুকুই।'

লোকটা পাগল নয় তো? গাড়ি থেকে নামতে নামতে চিন্তাটা পেয়ে বসলো মেয়েটিকে। হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয় পাগলামির লক্ষণ? কিন্তু...। লবিতে ঢুকে খানিকটা নার্ভাস হয়ে পড়লো ও। এরকম বিলাসবহুল হোটেলে জীবনে এই প্রথম ঢুকলো।

খুবই বিনীত ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা জানালো তাকে ডেস্ক ক্লার্ক। 'আমি মেজর মাসুদ রানার সেক্রেটারি। তাঁর জন্যে একটা স্যুইট রিজার্ভ করতে এসেছি। এক ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন, মেজর,' যথাসম্ভব সহজভাবে বললো লুইসা।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' রুম চার্টের ওপর নজর বুলিয়ে নিলো লোকটা। 'আমাদের স্যুইটগুলো চমৎকার, সেনরা।'

'আমি নিজে চেক করে দেখতে পারি?'

'একশোবার।'

একজন সহকারী ম্যানেজার সাথে করে ওপরে নিয়ে এলো মেয়েটিকে। লিভিং রুমে দাঁড়িয়ে চারদিক নজর বোলালো ও। মনে মনে ভাবলো, আরি বাপ! কী একখানা স্যুইট। খামটা কফি টেবিলের ওপর রাখলো লুইসা। 'এটা এখানে থাক। মেজরের জন্যে জরুরী মেসেজ আছে এটায়।'

'বেনে,' মাথা দোলালো সহকারী ম্যানেজার।

'দাঁড়ান, দেখি আগে ঠিক আছে কি না।' ওতে কি আছে, দেখার ইচ্ছেটা সংবরণ করতে পারলো না লুইসা। লোকটার দিকে পিছন ফিরে খামটা খুললো সে। রোম-বেইজিং এয়ার চায়নার ওয়ান-ওয়ে টিকেট বেরোলো ভেতর থেকে। ইস্যু করা হয়েছে মেজর মাসুদ রানার নামে। 'হ্যাঁ, ঠিকই আছে।' খামটা রেখে সিধে হলো সে। 'চলুন।'

গাড়িতে ফিরে এলো লুইসা। 'সমস্যা হয়নি তো কোনো?' প্রশ্ন করলো রানা।

'না।'

দশ মিনিট চলার পর আবার থামলো রানা হোটেল ভ্যালাডিয়ের-এর সামনে। 'আরেকবার নামতে হচ্ছে তোমাকে, হানি।' দু'নম্বর খামটা ওকে দিলো রানা। 'এটাতেও মেজরের নামে আরেকটা স্যুইট রিজার্ভ করতে হবে। বলবে, এক ঘন্টার মধ্যেই রিপোর্ট করবেন তিনি। আর...'

দরজা খুলে এক পা নামিয়ে দিয়েছে লুইসা। 'খামটা রেখে আসবো স্যুইটে।'

'ঠিক।'

'এবার আগের মতো নার্ভাস লাগলো না তার মোটেই। সোজা গট গট করে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালো। তোতা পাখির মতো আউড়ে গেল একই সবক।

'হবে, সেনরা,' বললো ক্লার্ক। 'খুব সুন্দর স্যুইট আমাদেরগুলো।'

'হলেই ভালো,' সেয়াণী ঢঙে বললো ও। 'মেজর খুব খুঁতখুঁতে মানুষ। ক'তলায় স্যুইটটা?'

'সাত তলায়।'

'আমি দেখে আসতে পারি?'

'শিওর।'

লিফটে উঠে খামটা খুললো লুইসা। একটা ট্রেনের টিকেট আছে ভেতরে, রোম টু বুদাপেস্ট। যাত্রী একজনই, মেজর মাসুদ রানা। দ্বিধায় পড়ে গেল সে, এ কোন্ ধরনের খেলা? আসলে কি করতে চাইছে লোকটা?

লুইসাকে বেরিয়ে আসতে দেখেই স্টার্ট দিলো মাসুদ রানা। 'স্যুইটটা কেমন?' ভুরু নাচালো তার উদ্দেশে।

'চমৎকার।'

এবার হোটেল লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। গাড়ি থামিয়ে শেষ খামটা তুলে নিলো রানা। মুখ খুলতে যাবে, তার আগেই নেমে পড়লো লুইসা। 'জানি, কি করতে হবে।' হাত বাড়ালো সে। 'দাও, খামটা দাও।'

'অবশ্যই আছে,' লুইসার প্রশ্নের উত্তরে বললো ডেস্ক ক্লার্ক। 'এবং এতো সুন্দর হোটেল স্যুইট রোমে আর পাবেন না আপনি। কখন আসছেন, মেজর মাসুদ রানা?'

'এক ঘন্টার মধ্যেই। স্যুইটটা দেখতে চাই আমি।'

দেখানো হলো। বেডরুম দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল মেয়েটির। দুই হাত পুরু গদির বিশাল ডবল খাট, তার ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজ করা কাঠের ক্যানোপি। কি অপচয়, ভাবলো লুইসা। খামটার ভেতর নজর বোলাতে ভুললো না সে। এটায় আরেকটা প্লেনের টিকেট দেখা যচ্ছে। রোম টু মায়ামি, ফ্লোরিডা। খামটা বিছানার ওপরই রেখে দিলো সে।

'আমাদের এখানে কালার টিভি, ভিসিআর সব আছে, সেনরা,' বলে উঠলো সঙ্গে আসা হোটেলের কর্মচারীটি। ওপাশের দেয়ালের সাথে স্ট্যাণ্ডের ওপর রাখা একটা বিশ ইঞ্চি ইনডিসিট টিভি সেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো লোকটা। টিপে দিলো 'অন' সুইচ। 'এই যে, দেখুন।'

সাথে সাথে ভীষণভাবে চমকে উঠলো লুইসা। সারা পর্দা জুড়ে ভেসে উঠেছে অ্যাডামসের মুখটা। অফ ভয়েসে মোটা একটা গলা বলছে '...ইন্টারপোলের অনুমান, এ মুহূর্তে রোমে আছে লোকটি। বড় ধরনের এক ড্রাগ স্মাগলিং মামলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে খোঁজা হচ্ছে একে। সিএনএন নিউজ থেকে, আমি ব্রায়ান রুজভেল্ট।'

বিস্ফারিত দু'চোখ সেঁটে আছে লুইসার পর্দায়। ড্রাগ স্মাগলার!

দুপুর গড়িয়ে গেছে। হোটেল ভিকটোরিয়ার গেস্ট রেজিস্টার পরখ করে দেখছে এক লোক। পাশেই রয়েছে তার এক সঙ্গী। এক জায়গায় চোখ থমকালো লোকটার। 'মেজর মাসুদ রানা কখন চেক ইন করেছেন?' ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করলো সে।

'এখনও আসেননি তিনি। তাঁর সেক্রেটারি সকালে এসে রিজার্ভ করে গেছে স্যুইট। বলে গেছে এক ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন মেজর।' হাতঘড়ির দিকে তাকালো সে। তারপর কাঁধ ঝাঁকালো। 'অথচ...চার ঘন্টা পেরিয়ে গেল, এখনও দেখা নেই তাঁর।'

সঙ্গীর দিকে ফিরলো লোকটা। 'হেড অফিসে টেলিফোন করে আরও লোক আনাও। আমি ওপরে যাচ্ছি।' ঘুরে ক্লার্কের দিকে চাইলো, 'স্যুইটের ডুপ্লিকেট চাবি

দিন।'

এদের পরিচয় আগেই জানা হয়ে গেছে। অতএব বিনা প্রশ্নে একটা চাবি বের করে দিলো সে ড্রয়ার থেকে। তিন মিনিট পর, পিস্তল উঁচিয়ে রানার স্যুইটে ঢুকলো লোকটা। প্রথমেই কফি টেবিলে রাখা খামটা চোখে পড়লো তার। খুললো সে ওটা।

এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই রিসিভার তুলে ডায়াল করতে দেখা গেল লোকটিকে।

দু'ঘণ্টা আগে রোম পৌঁছেছে কর্নেল হ্যারিসন কেলার। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি সাইফার হেডকোয়ার্টারে চলে এসেছে সে। এই মুহূর্তে বসে আছে কর্নেল জিয়ানলুকা ফোযযির মুখোমুখি। চেহারায় ক্লান্তির সামান্যতম চিহ্নও নেই।

'আমাদের জানামতে,' কর্নেল ফোযযি বলছে, 'এখনও রোমেই আছে মাসুদ রানা। পালাতে পারেনি। পারবেও না। দুটো পথ আছে ওর পালাবার, হয় ফ্রান্স, নয় সুইটজারল্যাণ্ড। কিন্তু সে উপায় নেই তার। আকাশ সড়ক রেল সাগরপথ এমনভাবে সীল করে দিয়েছি, একটা পিঁপড়েও বেরোতে পারবে না।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো সাইফার ডেপুটি, কিন্তু বাধা দিলো টেলিফোন। রিসিভার তুললো সে। 'সি!'

'আলবার্টো, কর্নেল। মাসুদ রানাকে পাওয়া গেছে।'

'কোথায়?' ভারি দেহটা নিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো ফোযযি।

'না, মানে, ওকে ধরতে পারিনি। তবে হোটেল ভিকটোরিয়ায় একটা স্যুইট রিজার্ভ করা হয়েছে রানার নামে। খুঁজে বের করেছি আমরা। এখানে ওর নামে একটা প্লেনের টিকেট পাওয়া গেছে আগামী শুক্রবারের। বেইজিং যাচ্ছে...'

'থাকো ওখানে! আমি আসছি এখনই।' রিসিভার রেখে সামনে বসা লোকটির দিকে তাকালো ফোযযি। খবরটা জানালো তাকে।

সে থামতে শান্ত গলায় বললো কেলার, 'হোটেল স্যুইট রিজার্ভ করেছে রানা নিজের নামে?'

'হ্যাঁ।'

'প্লেনের টিকেটও নিজের নামে?'

'হ্যাঁ। চলুন, দেরি করা ঠিক হবে না।' দরজার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিলো ফোযযি, কিন্তু থেমে দাঁড়ালো কেলারের কথায়।

'শুধু শুধু সময় নষ্ট করবেন না,' বললো সে।

'হোয়াট!'

'মাসুদ রানা এমন গাধামী করতে পারে না, কর্নেল।'

আবার বেজে উঠলো টেলিফোন। থাবা চালালো ফোযযি। হুঙ্কার ছাড়লো, 'সি!'

'কর্নেল? ন্যাজিও বলছি, হোটেল ভ্যালাডিয়ের থেকে। এখানে নিজের নামে স্যুইট রিজার্ভ করেছে মাসুদ রানা। অবশ্য চেক ইন করেনি এখনও। স্যুইট সার্চ করে দেখেছি। একটা ট্রেনের টিকেট পাওয়া গেছে...'

'থাকো ওখানে।' হতভম্ব চেহারা হলো কর্নেলের। 'নজর রাখো।'

'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করলো হ্যারিসন কেলার।

'না, হোটেল ভ্যালাডিয়ের থেকে আমার আরেক অপারেটর...' ঝট করে মাথা ঘোরালো ফোযযি। রিসিভার রাখতে না রাখতেই বাজতে শুরু করেছে রিঙ।

'সি!' নীরবে ও প্রান্তের বক্তব্য শুনলো সে। ক্রমে গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগলো তার বুলডগ মার্কা চেহারা। কয়েক সেকেণ্ড পর 'ফিরে এসো,' বলে রিসিভার রেখে দিলো। বিড়বিড় করে বললো, 'কি আশ্চর্য!'

'আবার কি?'

'হোটেল লিওনার্দো দা ভিঞ্চিতেও স্যুইট রিজার্ভ করা হয়েছে মাসুদ রানার নামে। বুঝতে পারছি না...'

'মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করুন, কর্নেল, ঠিকই বুঝবেন। মাসুদ রানা চাইছে এসব ইনফরমেশন পেয়ে আপনি ছোটাছুটি করুন।'

'তাহলে? কি করবো আমরা?'

মিষ্টি করে হাসলো কর্নেল হ্যারিসন কেলার।

কামানের গোলার মতো ভেনিসের দিকে ছুটছে নীল ফিয়াট। ভায়া ক্যাসিয়া পেরিয়ে এসেছে রানা এরই মধ্যে। ওরা নিশ্চয়ই পশ্চিমে আশা করছে রানাকে। ফরাসী এবং সুইস বর্ডারের ওপরই কড়া নজর রাখছে ফোযযি। এবং সেটাই স্বাভাবিক। রানা ঠিক করে রেখেছে, ভেনিস থেকে একটা হাইড্রোফয়েল ভাড়া করে ট্রিয়েস্টে যাবে। ওখান থেকে অস্ট্রিয়া। তারপর...।

লুইসার কথায় চিন্তার সূত্রটা ছিঁড়ে গেল রানার। 'খুব খিদে পেয়েছে।'

'কিছু বলছো?' জবর চাল চেলেছেন হিলিংটন, ভাবছে ও, ড্রাগ স্মাগলার বানিয়ে ছেড়েছেন ওকে। রেডিওতে ঘন ঘন ঘোষণা করা হচ্ছে রানার নাম এবং চেহারার বর্ণনা। এ অবস্থায়...।

'বলছি নাশতা তো করালেই না, লাঞ্চের সময়ও পেরিয়ে গেছে। আর কতো না খাইয়ে রাখতে চাও?'

আধ হাত জিভ বেরিয়ে পড়লো রানার। 'আমি দুঃখিত, হানি। খুবই দুঃখিত।' জাতিসংঘ সনদের এই সার্বজনীন মৌলিক অধিকারটির কথা আজ একটিবারের জন্যেও মনে পড়েনি ওর। রীতিমতো লজ্জাই পেলো রানা। ছিঃ ছিঃ, এমন ভুলও হয় মানুষের? 'আর একটু অপেক্ষা করো, প্লীজ। সামনের প্রথম রেস্টুরেন্টেই ক্ষতিটা পুষিয়ে দেবো তোমার।'

পাশ থেকে রানার মুখের দিকে চেয়ে আছে লুইসা। লোকটার চেহারা যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি ইস্পাত দৃঢ় একটা কাঠিণ্যও রয়েছে তাতে, একটু ভালো করে তাকালেই পরিষ্কার বোঝা যায়। এ মুহূর্তে কি এক কঠিন প্রতিজ্ঞা যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে ওর দু'চোখের জ্বলন্ত চাউনি থেকে। অথচ আশ্চর্য, ওর সাথে যখন কথা বলে মানুষটা, অদ্ভুত রকম শান্ত লাগে দেখতে। যেন একই মুখে বাস করছে পরস্পর বিরোধী দুটি সত্তা। এ লোক কিছুতেই অপরাধী হতে পারে না, মন বলছে লুইসার। নিশ্চয়ই ভেতরে আর কোনও ব্যাপার আছে।

পনেরো মিনিট উড়ে চলার পর একটা লোকালয় দেখে গাড়ির গতি কমালো

মাসুদ রানা। একটা পেট্রোল পাম্প, কয়েকটা দোকান আর দুটো রেস্টুরেন্ট, এই নিয়ে লোকালয়। গাড়ি রাখলো রানা প্রথম রেস্টুরেন্টটার সামনে। বেশ নিরিবিলি ভেতরটা, খদ্দের প্রায় নেই বললেই চলে। এমনিতেও এখন অসময়।

ভেতরে এসে বসলো ওরা। রানার চিন্তার মোড় ঘুরে গেছে এর মধ্যে। খুব গুরুত্বের সাথে সুজানের সেদিনকার প্রস্তাবটির কথা ভাবছে ও। এই চান্সে ওর ইয়টে কয়েকদিন অবস্থান নিলে কেমন হয়? ওরা কি ধারেকাছে কোথাও আছে? দেখাই যাক না খোঁজ নিয়ে।

আসন ছাড়লো রানা। মেন্যু নিয়ে একজন ওয়েটার এগিয়ে আসছে দেখে লুইসাকে বললো, 'তুমি অর্ডার দাও। আমি আসছি।'

ওদের টেবিলে কয়েক গজের মধ্যেই একটা ওয়াল মাউন্টেড পাবলিক টেলিফোন। ওটার সামনে গিয়ে ওকে রিসিভার তুলতে দেখলো লুইসা। স্লটে কয়েন ফেলে নাম্বার টিপতে শুরু করলো রানা।

'জিব্রাল্টারের মেরিন অপারেটরের সাথে কথা বলতে চাই আমি,' বললো রানা। যথেষ্ট নিচু গলায় বললেও প্রতিটি কথা পরিষ্কার কানে গেল মেয়েটির। জিব্রাল্টারে কাকে ফোন করছে ও? ভাবলো সে।

'অপারেটর,' কয়েক মুহূর্ত বিরতির পর আবার বলে উঠলো রানা। 'মারস নামে এক আমেরিকান ইয়টের সাথে কথা বলতে চাই, কালেক্ট কল। জিব্রাল্টারের আশেপাশেই রয়েছে ইয়টটা। নাম্বার, ব্ল্যাক ডগ ৭৩৭। ধন্যবাদ।'

কয়েক মিনিট লাগলো অপারেটরের মারসকে ট্রেস করতে। ওটার অনুমতি নিয়ে সংযোগ ঘটিয়ে দিলো সে লাইন দুটোর। জুন এলিসনের কণ্ঠ আশা করেছিলো রানা, কিন্তু শোনা গেল সুজানের।

'সুজান...'

'রানা!' ওর গলা চেনামাত্র চেঁচিয়ে উঠলো মেয়েটি উত্তেজিত কণ্ঠে। 'রানা, তুমি কেমন আছো?'

'ভালো। একটা জরুরী কথা বলবো বলে ফোন করলাম।'

'জানি, রানা। রেডিও-টিভিতে বারবার...রানা, কি করেছো তুমি? কেন তোমাকে খুঁজছে ইন্টারপোল?' মনে হলো কেঁদেই ফেলেছে বুঝি সে।

'সে অনেক লম্বা কাহিনী, সুজান।'

'তা হোক। খুলে বলো সব, প্লীজ।'

একটু ইতস্তত করলো ও। 'ব্যাপারটা রাজনৈতিক, সুজান। কয়েকটা দেশের সরকার মিলে নিজেদের দোষ আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে, আমার কাছে প্রমাণ আছে। নিজেরা দোষী বলেই এগোতে সাহস পাচ্ছে না, লেলিয়ে দিয়েছে ইন্টারপোলকে।'

রানার বক্তব্য হজম করতে অনেকক্ষণ লাগলো সুজানের। 'রানা, তোমার এই বিপদে...কোথায় আছো তুমি?'

'ইটালি।' হঠাৎ করেই আবার সিদ্ধান্ত পাল্টালো রানা। ঠিক করলো, সুজানের সাহায্য নেবে না। বড়ো শক্ত প্যাঁচে পড়েছে ও, এর সাথে ওকে আর জড়াবে না। রানা ইয়টে আশ্রয় নিয়েছে, যদি টের পায় কর্নেল ফোর্বস, ওরা স্বামী-স্ত্রীও

মারাত্মক বিপদে পড়বে। তারচেয়ে যা করার একাই করবে রানা।

'ঠিক আছে, রানা। কাছেই আছি আমরা। তোমার সুবিধেমতো যে কোনো জায়গা থেকে ইয়টে তুলে নিতে পারবো তোমাকে।'

'না, সুজান। শোনো...'

'আগে আমার কথা শোনো। এটা খামখেয়ালী করার সময় নয়। বিপদে বন্ধু বন্ধুর সাহায্য নেবে না, এ হতে পারে না, রানা।'

'জানি। কিন্তু এর সাথে তোমাকে আমি জড়াতে চাই না। সেক্ষেত্রে তুমিও মারাত্মক বিপদে পড়তে পারো।'

'রানা, জুনের সাথে কথা বলো।'

পরক্ষণেই শোনা গেল এলিসনের গলা। 'নিজের বিপদের গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করুন, মিস্টার রানা। চলে আসুন ইয়টে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার এলিসন। কিন্তু...'

'আপনাকে আমরা সাহায্য করতে চাই। ইন্টারপোল আর যেখানেই খুঁজুক, অন্তত আমার ইয়টে আপনাকে খুঁজবে না।'

'ধন্যবাদ। আপনার প্রস্তাব ভেবে দেখবো। সুজানকে দিন আরেকবার।'

'ওর মন ভালো নেই, মিস্টার রানা। সকালে টিভিতে প্রথমবার ঘোষণাটা শোনার পর থেকেই খুব কান্নাকাটি করছে। অন্তত ওর মনের কথা চিন্তা করে হলেও রাজি হয়ে যান। চলে আসুন।'

একটু থমকালো রানা। 'আচ্ছা, দিন দেখি ওকে।'

সুজানের কান্না জড়ানো গলা শুনলো রানা। 'প্লীজ, রানা। তোমাকে সাহায্য করার একটা সুযোগ দাও...' কান্নার দমকে বক্তব্য শেষ হলো না তার।

'ঠিক আছে, সুজান, ঠিক আছে,' ব্যস্ত হয়ে উঠলো মাসুদ রানা। 'শোনো, এখনই অতো ঘাবড়াবার কিছু নেই। নিজে আরেকটু চেষ্টা করে দেখি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারি কি না। পারলে ভালো। আর যদি না পারি, চলে আসবো তোমার ইয়টে।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'প্রতিজ্ঞা করছো?'

'হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা।' আরও মিনিটখানেক নানান কথা বলে সুজানকে শান্ত করলো রানা। তারপর ফোন রেখে টেবিলে এসে বসলো। চিন্তিত।

ওর পিলে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করলো লুইসা, 'সুজান কে, রানা?'

শক্ত হয়ে গেল ও। ন্যাপকিনের দিকে হাত বাড়িয়েছিলো, থেমে গেল। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালো মেয়েটির দিকে।

'তোমার নাম কি তা... জানলাম অবশেষে? টিভিতে। পিএরলার্গো দ্য ভিঞ্চিতে তোমার স্যুইট রিজার্ভ করার সময়। ইন্টারপোল তোমাকে খুঁজছে কেন, রানা?'

জোর করে সহজ হওয়ার চেষ্টা করলো মাসুদ রানা। 'ও কিছু না। সামান্য ভুল বোঝাবুঝি...'

'আমাকে বোকা বানাতে চেষ্টা কোরো না। আমি তোমাকে সাহায্য করতে

চাই।'

ন্যাপকিন খুললো রানা। 'কেন তুমি সাহায্য করবে আমাকে?'

মুখ খোলার আগে একটু চিন্তা করে নিলো মেয়েটি। 'কারণ তুমি আমার সাথে যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করেছো। বিশ্বাস করে প্রচুর টাকা তুলে দিয়েছো আমার হাতে, যা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম আমি। খদ্দেররা আমাকে টাকা দেয় শুধুমাত্র হায়েনার মতো আমার সুন্দর দেহটা খুবলে খাওয়ার জন্যে। অথচ প্রচুর টাকা দেয়ার পরও তোমার মধ্যে লালসার কোনো…'

'ব্যস ব্যস, প্লীজ।'

'আরও আছে। ইটালীর পুলিসকে আমি রাস্তার নোংরা-আবর্জনার চাইতেও বেশি ঘৃণা করি। ওরা জানোয়ারেরও অধম।'

'বুঝি। কিন্তু লুইসা, এর মধ্যে আমি কাউকে জড়াতে চাই না।'

টেবিলে দুই কনুই রেখে ঝুঁকে এলো মেয়েটি। 'ভেনিসে তুমি ধরা পড়ে যাবে, রানা। কিন্তু নেপলস্-এ ওরা তোমার সন্ধান পাবে না কোনোদিনও। আমি নেপলসের মেয়ে। আমার মা ছোট ভাই থাকে ওখানে। আমাদের বাড়িতে নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারবে। পুলিস নিশ্চয়ই ইটালির বাড়ি বাড়ি খুঁজে বেড়াবে না তোমাকে?'

মন্দ বলেনি মেয়েটি, ভাবলো মাসুদ রানা, যাওয়া যেতে পারে এক-আধ দিনের জন্যে। অন্য যে কোনও জায়গার তুলনায় প্রাইভেট বাড়িই অনেক নিরাপদ। তবুও, সম্ভাব্য বিপদের গুরুত্বটা একে বোঝানো উচিত।

'লুইসা, আমি ধরা পড়লে বিপদে পড়বে তুমিও। অপরাধীকে সহযোগিতা করার অভিযোগে কঠিন সাজা হবে তোমার।'

হাসলো মেয়েটি। 'তুমি ধরা পড়লে তো? নাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়া যাক।'

'কোথায় যে আছে মানুষটা,' আনমনে বললো কর্নেল জিয়ানলুকা ফোয়ৃযি। 'তবে ধরা তাকে পড়তেই হবে। একটু সময় লাগবে, এই যা।'

'ওই জিনিসটারই তো বড্ডো অভাব। সময় কোথায়?' বললো কর্নেল হ্যারিসন কেলার। 'আচ্ছা, রানার প্রাক্তন আমেরিকান বান্ধবী, সুজান এ মুহূর্তে কোথায় আছে খোঁজ নিয়েছেন?'

চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকালো ফোয়ৃযি। 'ওর প্রাক্তন বান্ধবী? কেন, তাকে খুঁজে কি হবে?'

'আই সী! আপনি দেখছি হোমওয়ার্কের কথাই ভুলে বসে আছেন। ক'দিন আগে এক আমেরিকান ধনকুবের, জন এলিসনের সাথে বিয়ে হয়েছে সুজানের। নিজেদের ইয়ট নিয়ে এদিকেই কোথাও এসেছে ওরা হানিমুন করতে। আমার পরামর্শ হচ্ছে, ইয়টটা লোকেট করার চেষ্টা করুন, কর্নেল। এবং দ্রুত।'

ছয়

চওড়া বুলেভার্ড ধরে হেঁটে চলেছে সে। কিন্তু কোথায়, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। কতোদিন হলো গ্রহচ্যুত হয়েছে সে দুর্ঘটনায়? তা-ও আজ আর মনে নেই, হতাশ হয়ে দিন গোণা ছেড়ে দিয়েছে। মনের জোর বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে। উপোস কাটাতে বাধ্য হচ্ছে দিনের পর দিন। কিন্তু খিদের জ্বালা আর সইতে পারছে না। মাঝে মাঝে মুখ তুলে আকাশের দিকে চাইছে সে, মেঘ করেছে কি না কোথাও। না, ঝকঝকে নীল আকাশ। চিহ্নমাত্র নেই মেঘের।

খাদ্য না হোক, পানি তার খুবই প্রয়োজন। নির্মল পানি–বৃষ্টির পানি। শক্তি ফিরে পেতে হবে তাকে। খুঁজে পেতেই হবে কমিউনিকেশন যন্ত্রের হারানো অংশটা। হঠাৎ করেই কারও সাথে ধাক্কা খেলো সে।

'হেই!' লোকটা আমেরিকান। অবাক চোখে অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকালো সে। 'দেখে হাঁটুন।'

বিড়বিড় করে কি যেন বললো সে উত্তরে। আবার পা বাড়ালো। ব্যাপারটা কেমন সন্দেহজনক মনে হলো আমেরিকানের। 'কোত্থেকে আসা হয়েছে, হানি?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

'প্লায়াডিজ-এর সপ্তম সূর্য থেকে।'

হো হো হেসে উঠলো লোকটা। 'চমৎকার রসবোধ তোমার। তা কোনদিকে যাওয়া হচ্ছে?'

'জানি না। এখানকার কিছু চিনি না আমি।'

চমৎকার, খুশি হয়ে উঠলো লোকটি। এমন একটা মাল…পটানোর চেষ্টা করে দেখা যাক। 'কোথায় থাকো তুমি? চলো, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

মাথা দোলালো মেয়েটি। 'কোথাও থাকি না। থাকার জায়গা নেই।'

'কয়েক মুহূর্ত ভাবলো আমেরিকান। 'তোমাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, খুব ক্লান্ত আমি। একটু ঘুমাতে পারলে…'

'আমার সাথে যাবে?' রক্ত গরম হয়ে উঠতে লাগলো তার। 'আমার হোটেলে? চমৎকার নরম বিছানা আছে। আরামে ঘুমাতে পারবে।'

'হ্যাঁ, যাবো।'

নিজের সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে লোকটার। চওড়া হাসি দেখা দিলো মুখে। 'চলো তাহলে।' মেয়েটির হাত ধরলো সে। ইশারায় একটা খালি ট্যাক্সি ক্যাব ডাকলো।

দশ মিনিট পর হোটেলে পৌঁছুলো ওরা। সুইটের দরজা খুলে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো আমেরিকান। 'এনি ড্রিঙ্ক, হানি?'

'না। তোমাদের কিছুই মুখে তুলতে পারি না আমি। বিছানাটা কোথায়?'

ও বাবা, খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে মনে হয়! জিভ বের করে দুই

amarsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ঠোঁটের এমাথা-ওমাথা চাটলো সে। 'এসো।' হাত ধরে ওকে বেডরুমে নিয়ে এলো।

মেয়েটিকে তাড়াতাড়ি বিছানার দিকে এগোতে দেখে বলে উঠলো, 'এখনই শুয়ে পড়ছো নাকি? ইয়ে…কাপড় চোপড়…?'

উত্তর দিলো না সে। দেহটা গড়িয়ে পড়লো তার গদিমোড়া বিছানায়। পরের দৃশ্যটা দেখে সশব্দে আঁতকে উঠলো আমেরিকান। ডান হাতটা ধীরে ধীরে লম্বা হচ্ছে মেয়েটির। চার ফুট…ছয় ফুট…আট ফুট। সেই সাথে রঙ পাল্টে গাঢ় সবুজ হয়ে উঠছে দেখতে দেখতে। বারো ফুট পথ পেরিয়ে রুমের দরজার সাথে বসানো আলোর সুইচটার ওপর পৌঁছুলো হাতটা। নিভে গেল ঘরের আলো।

বিকট এক চিৎকার দিয়েই জ্ঞান হারালো আমেরিকান।

অটোস্ট্রাডা ডেল সোলে ধরে নেপলসের দিকে এগিয়ে চলেছে রানা-লুইসা। রানার নাকের নিচে চওড়া লালচে গোঁফ, গালে চাপ দাড়ি। চোখে গাঢ় চশমা। চুলগুলো তার ঐতিহ্য হারিয়েছে—ব্যাকব্রাশ করা নেই এখন আর। সিঁথি করে আঁচড়ানো।

'মেয়েটিকে তুমি ভালোবাসো, তাই না?' জিজ্ঞেস করলো লুইসা।

'কাকে?'

'সুজানকে?'

'কি করে বুঝলে ভালোবাসি?'

'তোমার গলার স্বরেই টের পেয়েছি। কে মেয়েটা, রানা?'

'আমার বন্ধু।'

অন্যমনস্কের মতো বললো মেয়েটি, 'সুজান খুব ভাগ্যবতী। আমার যদি তোমার মতো বন্ধু থাকতো। মাসুদ রানা কি তোমার সত্যিকার নাম?'

'হ্যাঁ।'

'এবং তুমি মেজর?'

'ছিলাম। এখন অবসরপ্রাপ্ত।'

'ইন্টারপোল কেন তোমাকে খুঁজছে, পরে বলবে বলেছিলে?'

'বলেছিলাম। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু না বলাই ভালো হবে, লুইসা। তোমারই ভালো হবে তাতে। এসব যতো কম জানবে, ততোই লাভ।'

'বেশ।' আর কথা বাড়ালো না মেয়েটি। 'ঠিক আছে।'

পনেরো মিনিট পর একটা ফিলিং স্টেশনে গাড়ি ঢোকালো মাসুদ রানা। 'তেল ভরে নিই এখান থেকে,' বললো ও।

'ভালোই হলো,' হাসলো লুইসা। 'আমিও মাকে একটা টেলিফোন করবো।'

'যাও।' রানা নামলো না গাড়ি থেকে। একজন অ্যাটেনডেন্ট কাছে এসে দাঁড়াতে ফ্লোর ইটালিয়ানে বললো, 'ফেট ইল পিয়েনো, পর ফেভরে।'

'সি, সেনর।'

ওদিকে, স্টেশন অফিস লাগোয়া পাবলিক ফোন বুদে ঢুকলো এসে লুইসা। খুচরো পয়সা ফেলে ডায়াল করতে লাগলো। তারই ফাঁকে হাত তুলে রানার উদ্দেশে নাড়লো সে। ও প্রান্ত থেকে অপারেটরের গলা ভেসে আসতে চাপা কণ্ঠে বলে উঠলো,

'ইন্টারপোলের লাইন দিন, সুবিতো!'

টেলিভিশনে মাসুদ রানাকে ধরিয়ে দেয়ার ঘোষণাটা শোনামাত্রই ঠিক করেছে লুইসা, এই সুযোগে বড় একটা দাঁও মারতে হবে। ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ ফোর্স যখন খুঁজছে ওকে, তখন নিশ্চয়ই এর সাথে বড় অঙ্কের পুরস্কারের প্রশ্নও জড়িত আছে। এ সুযোগ মিস্ করা বোকামি হবে।

'ইন্টারপোল। মে আই হেল্প ইউ?' একটা হেঁড়ে গলা শোনা গেল।

বুক কাঁপছে লুইসার। আড়চোখে রানার ওপর আরেকবার নজর বুলিয়ে নিলো ও। না, ভয়ের কিছু নেই। এখনও গাড়িতেই বসা ও। 'আপনারা মেজর মাসুদ রানাকে খুঁজছেন, ঠিক?'

এক মুহূর্ত নীরব থাকলো লোকটা। 'কে বলছেন, প্লীজ?'

'নেভার মাইণ্ড। আপনারা তাকে খুঁজছেন, কি খুঁজছেন না?'

'এক মিনিট। আপনি আমার অফিসারের সঙ্গে কথা বলুন। লাইন দিচ্ছি আমি।' মাউথপীস মুঠোয় চেপে ধরে সহকারীর দিকে ফিরলো লোকটা। 'কলটা ট্রেস করো, প্রনটো!'

ত্রিশ সেকেণ্ড পর আরেকজনের গলা শুনলো লুইসা। 'ইয়েস, সেনরা?'

'মেজর মাসুদ রানাকে খুঁজছেন আপনারা?'

'সি, সেনরা। জানেন আপনি তার খোঁজ?'

'জানি। কতো টাকা পুরস্কার দেবেন ধরিয়ে দিলে?'

'পুরস্কার, সেনরা?'

'অফ কোর্স! কতো টাকা?'

হাত ইশারায় সহকারীকে আরও তাড়াতাড়ি করতে বললো অফিসার। 'ও ব্যাপারে এখনও কিছু ঠিক হয়নি। তা আপনি…'

'না হয়ে থাকলে এখনই ঠিক করুন। সময় নষ্ট হচ্ছে।'

'আপনি কতো আশা করেন?'

'এক মিলিয়ন ডলার।'

'মাই গড! এক মিলিয়ন…অনেক টাকা, সেনরা। বেশ, ঠিক আছে। আপনার ঠিকানাটা দিন। আমি বড়কর্তাদের সাথে…'

'না!' ধমকে উঠলো লুইসা চাপা কণ্ঠে। 'টাকাটা দেবেন কি না এই মুহূর্তে কথা দিতে হবে।' রানাকে হাসিমুখে এগিয়ে আসতে দেখে জান উড়ে গেল ওর। 'জলদি! হ্যাঁ কি না?'

'ভেরি ওয়েল।' নাক দিয়ে সশব্দে দম ছাড়লো অফিসার। লুইসা ভাবলো, ওর সঙ্গে দর কষাকষিতে হেরে গিয়ে হতাশ হয়েছে সে। আসলে ওটা ছিলো স্বস্তির নিঃশ্বাস। 'আমরা রাজি, সেনরা। কোথায় আসতে হবে টাকা নিয়ে?'

কাঁচের দরজাটা টান দিয়ে খুললো মাসুদ রানা। লুইসাকে বললো, 'তাড়াতাড়ি করো।'

ওদিকে 'হ্যালো' 'হ্যালো' করছে অফিসার। প্রথমে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও সামলে নিলো মেয়েটি। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'আমরা ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবো, মা। কোনো চিন্তা নেই। চিয়াও।'

anmamun@yahoo.com
www.murchona.com

রিসিভার রেখে ঘুরলো রানার দিকে। 'আমাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে মা।'

ইন্টারপোল হেডকোয়ার্টার্স। রিসিভার জায়গামতো রাখতে রাখতে ভাবলো অফিসার, কার গলা শুনলাম ওটা? 'কোত্থেকে করা হয়েছে কলটা?'

'অটোস্ট্রাডা ডেল সোলের একটা সার্ভিস সেন্টার থেকে, স্যার। খুব সম্ভব ওরা নেপলস চলেছে।'

'হুঁম!'

সাইফার হেডকোয়ার্টার্স। কর্নেল ফোর্যথির অফিসের দেয়ালে টাঙানো ইটালির প্রকাণ্ড এক ম্যাপ পর্যবেক্ষণ করছে কর্নেল কেলার। পাশেই ফোর্যথি দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে মাসুদ রানাকে সনাক্ত করার কাজে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। রোমের যে জুয়েলারি দোকান পঞ্চাশ হাজার ডলার চার্জ করেছে, ওয়াশিংটন থেকে টেলিফোনে তার ঠিকানাটা কেলারকে জানিয়ে দিয়েছেন জেনারেল হিলিংটন।

ওখানে খোঁজ নিতে গিয়ে বাধে আরেক বিপত্তি। রানার ছবি সনাক্ত করেছে দোকানের সেলসম্যান, কিন্তু ওর সঙ্গে যে মেয়েটি ছিলো, তার চেহারা আর ফিগারের বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই জানাতে পারেনি তাদের। মেয়েটি কে হতে পারে ভেবেই পাচ্ছে না কেউ। খবর আরও এসেছে এইমাত্র। ইন্টারপোল জানিয়েছে, নেপলসের দিকে চলেছে মাসুদ রানা। কিন্তু মেয়েটি কে? ধরিয়ে দিতে চাইছে মাসুদ রানাকে, তার মানে কি ওর পূর্ব পরিচিত বা ওই ধরনের কেউ নয় সে? ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ফোর্যথি।

'এই মেয়েটার ব্যাপারে...কর্নেল, আমার মাথায় কিছুই আসছে না,' বললো সে। 'কে হতে পারে...?'

'জানা যাবে।' পিছিয়ে এসে চেয়ারে বসলো কেলার।

'কি করে?'

'ওর এজেন্সির রোম চীফ, মনিকা নয় মেয়েটি, আপনি শিওর?'

'নিশ্চই শিওর। কাল ওর টারমিনেশন অর্ডার পাওয়ার সাথে সাথে সে ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি আমি। বের হতেই পারবে না ওরা কেউ অফিস থেকে।'

'সেক্ষেত্রে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো কেলার, '...এ হয়তো বিশেষ পেশার কোনো মেয়ে হবে। একজন সঙ্গীর প্রয়োজন ছিলো মাসুদ রানার। জুটিয়ে নিয়েছে।'

'তার মানে,আপনি বলতে চাইছেন মেয়েটি বেশ্যা?'

মাথা দোলালো কর্নেল হ্যারিসন কেলার। 'ঠিক। এ ক্ষেত্রে প্রথমে কোথায় খোঁজ করতে হবে আমাদের?'

'টর ডি অউনট।'

'চলুন।'

ডিস্ট্রিক্ট পুলিস সুপারভাইজর, ক্যাপ্টেন ভিয়ালিসহ প্যাসেজজিটা আর্কিওলজিকা পৌঁছুলো তারা এক ঘণ্টা পর। 'কাজটা সহজ হবে না,' আগেই দুই গোয়েন্দা অফিসারকে সতর্ক করে দিয়েছে ক্যাপ্টেন। 'এমনিতে সারাদিন নোংরা

প্রতিযোগিতায় মেতে থাকে এরা। কিন্তু পুলিস দেখলেই একে অন্যের নিকটাত্মীয় বনে যায়। মুখ খোলানো কঠিন হতে পারে।'

দুই সাদা পোশাকধারীর সঙ্গে ক্যাপ্টেন ভিয়ালিকে দেখেই ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল মেয়েরা। এ আচরণ গা সওয়া। কাজেই পাত্তা দিলো না ক্যাপ্টেন। মুখে চেষ্টাকৃত এক চিলতে হাসি ধরে ফুটপাথে অপেক্ষমাণ এক সুন্দরী যুবতীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

'গুড আফটারনূন। কেমন চলে ব্যবসা?' ভুরু নাচালো সে।

'এ মুহূর্তে মন্দা। তোমরা বিদেয় হলে জমবে।' কঠিন মুখ যুবতীর। আরও কয়েকজন বারবণিতা এসে ঘিরে দাঁড়ালো মেয়েটিকে। চোখের দৃষ্টিতে পারলে ভস্ম করে দেয় তারা ক্যাপ্টেনকে।

'আমরা থাকতে আসিনি। একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে এসেছি।' পকেট থেকে রানার কি-টু আকারের একটা ছবি বের করে তুলে ধরলো ভিয়ালি যাতে সবাই দেখতে পায়। 'এই লোকটিকে খুঁজছি আমরা। কাল রাতে এখানে এসেছে লোকটা, তোমাদের ভেতরের কাউকে নিয়ে গেছে সঙ্গে করে। জানতে চাই মেয়েটি কে।'

'আমি জানি না,' ধারালো কণ্ঠে বললো যুবতী। 'তবে একজন সম্ভবত জানে।'

'গুড।' এতো সহজে তথ্যটা আদায় করা যাবে কল্পনাই করেনি পুলিস সুপারভাইজর। খুশি হয়ে উঠলো মনে মনে। 'গুড। কে সে?'

হাত লম্বা করে রাস্তার ওপারের একটা সাইনবোর্ড দেখালো সে। একটা দোকানের মাথায় ঝুলছে। ওতে বড় বড় অক্ষরে লেখা: মাদাম লুসিয়া–হস্তরেখা বিশারদ। 'ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।'

খিল খিল করে হেসে উঠলো মেয়েরা। গড়িয়ে পড়তে লাগলো এ ওর গায়ে।

লাল হয়ে উঠলো অপদস্থ ক্যাপ্টেন ভিয়ালি। তবুও দাঁত বের করলো সে জোর করে। নিচু গলায় বললো, 'আমি যখন এ রসিকতার জবাব দেবো, তখন হাসি থাকবে না তোমাদের মুখে।' হাত তুলে গাড়ির পাশে দাঁড়ানো দুই কর্নেলকে দেখালো সে। 'ওই দুই ভদ্রলোক খুঁজছেন মেয়েটিকে। যদি তোমাদের জানা না থাকে মেয়েটি কে, তাহলে তাড়াতাড়ি জানার চেষ্টা করো। আমি অফিসে চললাম। নামটা জানামাত্র ফোন করবে আমাকে।'

'যদি না করি?'

'সেক্ষেত্রে আবার আসতে হবে আমাকে। এক ঘণ্টা সময় দিয়ে গেলাম।'

ঘুরে দাঁড়ালো ডিস্ট্রিক্ট পুলিস সুপারভাইজর। প্রতীক্ষার সময় কাটানো মুশকিল। তবুও সময়টা পার করলো সে অফিসে বসে। এলো না টেলিফোন। এবার সে নিজেই টেলিফোন তুললো। একের পর এক নির্দেশ পাঠাতে লাগালো শহরের সবগুলো পুলিস স্টেশনে। এ অভিযানের নাম রাখলো সে 'অপারেশন পুট্টানা'।

শ'খানেক পেট্রোল ওয়াগন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পথে নামলো। টর ডি অউনট তো বটেই, শহরের প্রায় প্রতিটি ভাসমান পতিতাকেও খুঁজে বের করলো পুলিস, টপাটপ তুলতে লাগলো গাড়িতে। সঙ্গে তাদের দালালদেরও। মাঝরাতের আগেই রোমের সবগুলো জেল হাজত ভরে গেল, বলতে গেলে পতিতাশূন্য হয়ে পড়লো রোম।

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

'ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না, সেনর,' আর টিকতে না পেরে বলে উঠলো ক্যাপ্টেন ভিয়ালি। হাজত থেকে ভেসে আসা পতিতাদের তীক্ষ্ণ গলার চেঁচামেচি শুনতে শুনতে মাথা ধরে গেছে। অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে তারা। 'এদের বেশিক্ষণ আটকে রাখা ঠিক হবে না। হাজার হাজার ট্যুরিস্ট রয়েছে এখন রোমে। তাদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। এদিকে এরাও মচকাচ্ছে না।'

'ভাববেন না।' মুখোমুখি বসে আছে দুই কর্নেল। তাদের মধ্যে থেকে বলে উঠলো কেলার, 'কেউ না কেউ মচকাবেই।'

ভোর হয়ে এসেছে তখন। এই সময় বিজয় ঘটলো পুলিস বাহিনীর। ক্যাপ্টেনের সেক্রেটারি ইন্টারকমে জানালো, 'এক ভদ্রলোক আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন, স্যার।'

'কি নাম?' সামনে বসা দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তার দিকে তাকালো সে।

'সেনর রবার্টো।'

'পাঠিয়ে দাও।'

লোকটি মাঝবয়সী। অত্যন্ত দামী কাপড়ের তৈরি চমৎকার ছাঁটের কমপ্লিট পরনে। পায়ে চকচকে শু। বাঁ হাতের তিন আঙুলে তিনটে ডায়মণ্ড বসানো আংটি। টর ডি অউনট-এর সবচেয়ে পয়সাওয়ালা দালাল লোকটি।

'কি করতে পারি আপনার জন্যে?' প্রশ্ন করলো সুপারভাইজর ভিয়ালি।

'আমিই আপনাদের জন্যে কিছু করতে এসেছি,' হাসলো লোকটা। ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি বসলো পায়ের ওপর পা তুলে। 'আইনের রক্ষাকারীদের সহযোগিতা করা দেশের প্রতিটি সুনাগরিকেরই কর্তব্য। যখন জানলাম যে আপনারা আমার এলাকার একটি মেয়েকে খুঁজছেন, তখন ভাবলাম, তার নামটা আপনাদের জানানো উচিত।'

'মেয়েটি কে?' জানতে চাইলো কর্নেল হ্যারিসন কেলার।

শুনেও না শোনার ভান করলো রবার্টো। তাকালই না কর্নেলের দিকে। ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে বললো, 'স্বভাবতই আমি আশা করবো মেয়েটির নাম জানার পর আমার মেয়েদের এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেয়া হবে।'

রেগে গেছে কর্নেল জিয়ানলুকা ফোর্যাথি। খেঁকিয়ে উঠলো। 'তোমার ওই বেশ্যাদের ব্যাপারে আমরা মোটেই আগ্রহী নই। আমরা কেবল মেয়েটির নাম জানতে চাই।'

'নিশ্চিন্ত হলাম, স্যার,' ফোর্যাথির দিকে ফিরে আবার গা জ্বালানো হাসি দিলো রবার্টো। 'আমি জানি আপনাদের মতো হাই-অফিশিয়ালরা কখনও...'

দাঁতে দাঁত চাপলো ক্যাপ্টেন ভিয়ালি। 'মেয়েটার নাম, রবার্টো!'

'শিওর। লুইসা, লুইসা জিয়েল্লোনি। বিদেশী এক খদ্দেরের সাথে লা ইলেক্ট্রোপলিও হোটেলে রাত কাটিয়েছে কাল মেয়েটি। আজ সকালে তার সাথেই চলে গেছে কোথায়, জানি না।'

রিসিভার কানে লাগিয়ে কথা-বলতে শুরু করে দিয়েছে ততোক্ষণে ক্যাপ্টেন। 'লুইসা জিয়েল্লোনির ফাইল নিয়ে এসো আমার রুমে।'

'আশা করি এবার আপনারা ওয়াদা রক্ষা করবেন, ছেড়ে...'

চোখ তুললো ক্যাপ্টেন। যোগ করলো, 'সবাইকে জানিয়ে দাও, অপারেশন পুট্টানা ক্যানসেলড।'

'গ্রাৎসি।' সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়লো রবার্টোর।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে লুইসার ফাইল পৌঁছে গেল ক্যাপ্টেনের টেবিলে। হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে তার ওপর। মেয়েটির জীবনী পড়তে শুরু করলো। 'পনেরো বছর বয়সে এই পেশায় নামে লুইসা। নানা কারণে অনেকবার অ্যারেস্ট করা হয় তাকে। মেয়েটি...' কেলারের প্রশ্নে বাধা পেলো সে।

'কোথাকার মেয়ে লুইসা?'

'নেপলস। ওখানে তার মা আর ছোট এক ভাই আছে।'

'ওদের খুঁজে বের করা সম্ভব?'

'চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।'

'ভেরি গুড।'

নেপলসের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে লুইসাদের বাড়ি। পুরানো একটা ফার্মহাউস। পাথরের তৈরি। 'ওই যে!' বাচ্চা মেয়ের মতো খুশি হয়ে উঠলো লুইসা। 'কি, সুন্দর না?'

'হ্যাঁ।' নিশ্চিন্ত বোধ করলো মাসুদ রানা। জায়গাটা শহর কেন্দ্রের অনেক দূরে। এখানে ওকে কেউ খুঁজতে আসবে বলে মনে হয় না। একটা সেফ হাউসের মতোই নিরাপদ বাড়িটা।

লুইসার পরামর্শে ঘুরে ফার্মহাউসের পিছনে চলে এলো রানা গাড়ি নিয়ে। সদর রাস্তা থেকে দেখা যাবে না এখন ওটা। গাড়ি থেকে নামলো ওরা। প্রায় সাথে সাথেই এক মাঝবয়সী মহিলা উদয় হলো পিছনের দরজা দিয়ে। সম্ভবত রান্নাঘর ওটা। একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছে খোলা দরজা দিয়ে।

'লুইসা!' দু'হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো মহিলা। 'কারা! মি সেই মানকাতা!'

'আই হ্যাভ মিসড ইউ টু, মামা।' ছুটে গিয়ে মাকে আলিঙ্গন করলো মেয়েটি। চুমোর চুমোয় মেয়ের দু'গাল ভরিয়ে দিলো মা। হঠাৎ রানার ওপর চোখ পড়তে লজ্জা পেয়ে লুইসাকে ছেড়ে এগিয়ে এলো মহিলা।

'মা, এ আমার বন্ধু। এর কথাই ফোনে বলেছিলাম তোমাকে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো লুইসা।

পরেরটুকু সম্ভবত শুনতে পায়নি মহিলা। রানার উদ্দেশে মিষ্টি হেসে বললো, 'গরীবের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন বলে ধন্যবাদ, সেনর...?'

'হেনরি,' বললো রানা।

'আসুন আসুন।'

ঘুরে সামনের দরজা দিয়ে ড্রইংরুমে নিয়ে এলো মহিলা ওদের। রুমটা প্রকাণ্ড। ফার্নিচারে একেবারে ঠাসা। সোফা, চেয়ার, সব কিছুই অত্যন্ত আরামদায়ক, দেখেই বোঝা যায়।

'বসুন, সেনর হেনরি,' বললো মহিলা।

'ধন্যবাদ।'

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

এই সময় অন্য এক দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো আঠারো উনিশ বছরের এক যুবক। বেশ খাটো সে। লুইসার ভাই, চেহারা দেখেই বুঝলো মাসুদ রানা। গায়ের রঙ তামাটে। বাদামী চোখ। চাল চলনে চালবাজ মনে হলো তাকে রানার। জিনস আর জ্যাকেট পরে আছে সে। জ্যাকেটের বুকের কাছে বড় করে লেখা 'ডিয়াভোলি রোজি'। লুইসার ওপর চোখ পড়ামাত্র চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো যুবকের।

'লুইসা! তুমি হঠাৎ, কি ব্যাপার?'

'হ্যালো, লুইগি। বেড়াতে এলাম ক'দিনের জন্যে।' রানার দিকে ফিরলো লুইসা। 'হেনরি, এ আমার ভাই, লুইগি। লুইগি, এ আমার বন্ধু, মিস্টার হেনরি জোনস।'

'হ্যালো, লুইগি,' মৃদু গলায় বললো রানা। কেন যেন প্রথম দর্শনেই যুবককে পছন্দ হলো না ওর।

রানার আপাদমস্তক নজর বোলালো সে কয়েকবার। 'হ্যালো।'

'আমি তোমাদের দু'জনের জন্যে সুন্দর করে গুছিয়ে দিচ্ছি বেডরুম,' খুশি খুশি গলায় বললো মা। পা বাড়াতে যাচ্ছিলো ভেতরে যাওয়ার জন্যে।

বাধা দিলো রানা। 'কিছু যদি মনে না করেন···মানে, আমার জন্যে যদি একটা আলাদা বেডরুমের ব্যবস্থা করা যায়···'

অস্বস্তিকর নিরবতা নেমে এলো ঘরের আবহাওয়ায়। ওদের তিনজনই একভাবে চেয়ে থাকলো কিছুক্ষণ রানার দিকে।

'কি ব্যাপার?' মেয়ের দিকে ফিরে ফিসফিসিয়ে বললো মা।

কাঁধ ঝাঁকালো মেয়ে। জানি না, মনে মনে বললো।

'ঠিক আছে, সেনর হেনরি,' বলে মেয়ের হাত ধরলেন মহিলা। 'চলো, রান্নাঘরে যাই। আগে কফি বানিয়ে আনি সেনরের জন্যে।'

শান দেয়া চোখ লুইগির। আর কিছু না হোক, বোনের হাতের এমারেল্ড ব্রেসলেট ঠিকই চোখে পড়েছে। ওরা দু'জন বেরিয়ে যেতে রানার দিকে ফিরলো সে। 'এমারেল্ডগুলো কি আসল? আমার বোনকে ওটা আপনি কিনে দিয়েছেন?'

বিরক্তি বোধ করলো মাসুদ রানা। 'ওকেই জিজ্ঞেস করো না।'

একটু পর ফিরে এলো মা-মেয়ে। রানাকে জিজ্ঞেস করলো, 'সেনর হেনরি, সত্যিই আপনি একা শুতে চান?'

অস্বস্তি লাগছে রানার। কোনওরকমে বললো, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে,' বললো লুইসা। 'চলো, তোমার বেডরুমে পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে। ডিনার রেডি হওয়া পর্যন্ত রেস্ট নাও।'

লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে লম্বা একটা করিডর ধরে এগিয়ে চললো সে আগে আগে। পর পর তিনটে রুম পেরিয়ে বড় একটা বেডরুমে নিয়ে এলো ওকে।

'রানা, তুমি ভাবছো তুমি আমি এক সঙ্গে ঘুমালে মা বাবা কি ভাববেন, তাই না?' ওর চোখে চোখ রেখে বললো মেয়েটি। মুখ দেখে মনে হলো রানার সরাসরি প্রত্যাখ্যানে দুঃখ পেয়েছে। 'মা জানেন, আমি কি করি।'

আমতা আমতা করতে লাগলো রানা। 'না, ঠিক তা নয়। মানে, আমি খুব টায়ার্ড, লুইসা। ইউ নো।'

ঠিক আছে।'

মনে মনে চটে উঠলো মেয়েটি। ওকে ধরিয়ে দেয়াই উচিত, ভাবতে লাগলো সে। যদিও থেকে থেকে একটা অপরাধবোধ খুঁচিয়ে চলেছে ওকে সেই টেলিফোনটা করার পর থেকেই।

ডিনার শেষ হতে থালা বাসন নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল লুইসা আর তার মা। রানা আর লুইগি বসলো লিভিংরুমে।

'আপনাকে ছাড়া লুইসা কখনও ওর কোনো বন্ধুকে বেড়াতে নিয়ে আসেনি এখানে,' বললো লুইগি। 'ও নিশ্চয়ই আপনাকে খুব পছন্দ করে।'

'আমারও ওকে ভালো লাগে।'

লোকটা নিঃসন্দেহে প্রচুর টাকা-পয়সার মালিক, ভাবছে যুবক। এতো দামী পোশাক সাধারণ মানুষের গায়ে ওঠার কথা নয়। কিন্তু নেপলসে অসংখ্য বিলাস বহুল হোটেল থাকতেও এখানে এসে উঠলো কেন লোকটা? লুইসাই বা কথা নেই বার্তা নেই হট করে চলে এলো কেন ব্যবসা বাদ দিয়ে? এ লোক কি ভাড়া করেছে ওকে? তাই হবে। ওই ব্রেসলেটের এমারেল্ড যদি খাঁটি হয়ে থাকে, তাহলে তো···আরি বাপ! খুব সম্ভব লোকটা গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে, সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো লুইগি।

'আপনি কোত্থেকে এসেছেন, সেনর হেনরি?'

'সুইটজারল্যাণ্ড।'

'আই সী।' মাথা দোলালো যুবক। লুইসার কাছ থেকে লোকটার পরিচয় জানতে হবে। তারপর···ওর ধারণা যদি সত্যিই হয়, ডিয়াভোলি রোজির লীডার, ভার্গিল সিজারকে কাল সকালেই সব জানাবে ও। যতো সেয়ানাই হোক, এর মতো মক্কেল টিট্ করতে দু'মিনিটও লাগবে না সিজারের।

রাত দশটায় ওদের সবার কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে বেডরুমের দিকে পা বাড়ালো রানা। পিছন থেকে এক দৃষ্টে ওর গমনপথের দিকে চেয়ে থাকলো সবাই। রানা অদৃশ্য হয়ে যেতে ফোড়ন কাটলো লুইগি বোনের উদ্দেশে। 'ও হয়তো মনে করে তুমি ওর সাথে শোবার উপযুক্ত নও।'

লুইসা এর কোনও উত্তর দিলো না।

ওকে ধরিয়ে দেয়াই উচিত কাজ হবে, নিজের ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল বাঁধতে বাঁধতে আবার ভাবলো লুইসা জিয়েলোনি। যথেষ্ট অপমান করেছে ওকে লোকটা। আশ্চর্য! সবাই ওর রূপ-যৌবনের কতো প্রশংসা করে, ওর সঙ্গে একবার শুতে পারলে জীবন ধন্য মনে করে। আর এ কি না বারবার প্রত্যাখ্যান করছে তাকে! কেন? কিসের জন্য? ব্যাটা মাদক চোরাচালানী, সাধু সেজেছে।

চিন্তায় বাধা পড়লো লুইসার। লুইগি এসে ঢুকলো রুমে। ওর পাশে এসে বসলো। 'তোমার এই বন্ধুটাকে জোটালে কোত্থেকে, লুইসা?'

চুলগুলো ঘাড়ের কাছে টান টান করে ধরে ফিতে বাঁধছিলো সে, থেমে গেল হাত। আয়নার ভেতর দিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকালো। 'কেন?'

'এমনিই জানতে চাইলাম,' কাঁধ ঝাঁকালো লুইগি।

'রোমে।'

amisuman@yahoo.com
www.murchona.com

'লোকটা খুব ধনী, তাই না?'

'মোটামুটি।'

'মিথ্যে বলছো। ধনী না হলে অতো দামী ব্রেসলেট কাউকে কেউ উপহার দেয় না।'

'ও আমাকে পছন্দ করে।'

'তাহলে কেন একা একা শুতে গেল? সমকামী নয়তো?'

'আরে না,' জোর করে হাসলো লুইসা। 'শরীরটা ভালো নেই ওর।'

'আমার কি মনে হয়, জানো? লোকটা কারও কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জায়গামতো খবরটা দিতে পারলে হয়তো প্রচুর পুরস্কার...'

বোনের জ্বলন্ত চাউনি দেখে থমকে গেল সে। 'ওসব চিন্তা ছাড়ো, লুইগি,' ঝাঁঝালো গলায় ধমকে উঠলো মেয়েটি।

'তার মানে আমার ধারণাই ঠিক?' হাসছে যুবক।

'না!' মুখ ঝামটা মারলো লুইসা। 'ঠিক নয়। তুমি আজকাল নিজেকে খুব চালাক ভাবতে শুরু করেছো, কেমন? সব কিছুতেই সন্দেহ।'

ওকে রেগে উঠতে দেখে জোরে হেসে উঠলো লুইগি। 'তার মানে পুরস্কারের টাকা পুরোটাই তুমি চাও। আমাকে ভাগ দেবে না।'

'ওহ্-হো!' বিরক্ত হয়ে মাথা দোলালো লুইসা। 'শোনো, মিস্টার হেনরি পালিয়ে বেড়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সে তার স্ত্রীর কাছ থেকে। এর মধ্যে থানা পুলিসের কোনো ব্যাপার নেই। কাজেই পুরস্কারের প্রশ্নই আসে না, বুঝলে?'

'তাই নাকি? তা আগে বলবে তো? আমি এদিকে... যাকগে। আগেভাগে আসল ঘটনা জানতে পেরে ভালোই হলো।' দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবলো লুইগি, রাতটা পোহাক, তারপর যাচাই করে দেখতে হবে সত্যি মিথ্যে।

'কোনো সংবাদ পাওয়া গেল লোকটার?' জানতে চাইলো কোবরা।

'হ্যাঁ। খোঁজ পেয়েছি, নেপলসে গা ঢাকা দিয়েছে মাসুদ রানা,' বললেন এনএসএ ডেপুটি।

'বর্তমান পরিস্থিতি?'

'কর্নেল হ্যারিসন কেলার ওখানকার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর লেটেস্ট অ্যাকশনের ব্যাপারে এখনও কিছু জানতে পারিনি।'

'অল রাইট। কেলার যোগাযোগ করামাত্র আমাকে খবর জানাবেন।'

পরদিন ভোর ছ'টায় মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করতে মাঠে নামলো নেপলস্ কর্তৃপক্ষ। নেপলস্ ব্যুরো অভ মিউনিসিপ্যাল হাউজিঙের কর্মচারীরা লুইসাদের বাড়ি খুঁজে বের করার কাজে লেগে পড়লো। প্রায় অসম্ভব একটা কাজ এটা। কারণ পুলিসের কাছে লুইসার যে ঠিকানা দেয়া হয়েছিলো সেটা ভুয়া। কাজটা লুইসাই করেছিলো ইচ্ছে করে।

অন্যদিকে, কয়েক ডজন সাইফার অপারেটর ও সাদা পোশাকধারী পুলিসের ইনফর্মার রানার ছবিসহ চষে বেড়াচ্ছে গোটা পুরো শহর।

গতরাতের কথা। গভীর রাতে পা টিপে টিপে রানার ঘরের দিকে এগোলো লুইসা। সবাই তখন ঘুমে বিভোর। আবছা আলোয় বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা রানার দিকে তাকালো লুইসা। রহস্যময় এক টুকরো হাসি ফুটলো ঠোঁটে। গায়ের পাতলা নাইট গাউনটা খুলে ফেললো। সম্পূর্ণ নগ্ন সে এখন। দেখবো, তুমি কতো সাধুপুরুষ, মনে মনে বললো।

বিছানায় উঠে পড়লো লুইসা। কাছে গিয়ে একটা হাত রাখলো রানার গায়ে। পরমুহূর্তে ভীষণভাবে চমকে উঠলো। কোথায় মাসুদ রানা? এ যে একটা পাশ বালিশ! এক ঝটকায় চাদরটা সরিয়ে হতভম্বের মতো চেয়ে থাকলো লুইসা জিয়েলোনি। আজব কাণ্ড! গেল কোথায় লোকটা?

এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো ও। এই সময় পিছনদিকের জানালার ওপর চোখ পড়লো। সাদা ফ্রেমের পটভূমিতে কালচে লক দেখা যাচ্ছে—খোলা। দুটোই। তাড়াতাড়ি জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো লুইসা। আস্তে করে নিচের পাল্লাটা ওপরদিকে তুলে দিয়ে গলা বের করে বাইরে ঝুঁকলো। গাড়িটাও নেই। চলে গেছে মাসুদ রানা! কেন?

আকাশ পাতাল ভেবে ভেবে রাত পার করে দিলো মেয়েটি। দু'চোখের পাতা এক করতে পারলো না।

ওদিকে, রানা তখন ওদের বাড়ির মাত্র দু'তিনশো গজ দূরের একটা সাইড রোডে বসে আছে গাড়ি নিয়ে। ওখান থেকে দেখা যায় লুইসাদের বাড়ির সামনেটা। এখানেই বেশ নিরাপদ বোধ করছে রানা। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে হাজারো চিন্তা। সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছে ওকে রাহাত খানের সাথে যোগাযোগ করতে না পারার ব্যাপারটা। ঠিক আছে, নিজেকে প্রবোধ দিলো ও, কাল যেভাবেই হোক, ফোন করতেই হবে ওকে ঢাকায়।

পাখিদের মিষ্টি কিচির মিচির গানে ঘুম ভাঙলো ওর খুব ভোরে। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে একটু একটু করে। সিধে হয়ে বসলো রানা। একভাবে বসে থাকতে থাকতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে পিঠ আর নিতম্ব। আড়মোড়া ভেঙে লম্বা করে হাই তুললো ও। স্টার্ট দিলো গাড়িতে।

'আমি ভেবেছিলাম, তুমি বোধহয় আর ফিরবে না।' চোখ ছল ছল করছে লুইসার।

ঝামেলা! উত্তর দিলো না মাসুদ রানা। আনমনে চুমুক দিতে লাগলো কফির কাপে। ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। বেরোতে হবে ওকে।

'একটা কথা বলবো, রানা। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো রাগ করবে না।'

'কি কথা?'

'আগে প্রতিজ্ঞা করো।'

'বেশ। প্রতিজ্ঞা করলাম।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো মেয়েটি। যখন মুখ খুললো, মনে হলো যেন বহুদূর থেকে কথা বলছে। 'আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি, রানা।'

'লুইসা...'

alamsumon@yahoo.com www.murchona.com

'আমি জানি,' তেমনি নিচু, ধীর গলায় বললো সে। 'এটা বোকামি। তবুও, জীবনে এই প্রথম, রানা। এ কথা আর কাউকে বলিনি আমি।'

'আমি...'

'থাক, প্লীজ। কিছু বলতে হবে না। কথাটা বিশ্বাস করলে খুশি হবো।'

'আমি বিশ্বাস করি, লুইসা।'

'ঠাট্টা করছো?'

'না।' গভীর দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকলো ও। 'ঠাট্টা নয়। সত্যি বলছি।'

হঠাৎ করে প্রসঙ্গ পাল্টালো লুইসা। 'আমি তোমাকে চিনেছি, রানা।' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার।

'মানে?'

'তুমি আসলে স্পাই, তাই না?'

হেসে উঠলো মাসুদ রানা। 'আচ্ছা!'

'স্বীকার করো, সত্যি না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি জানতাম!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো লুইসা। 'আমি জানতাম! আমাকে শেখাবে তোমাদের দুয়েকটা সিক্রেট?'

'কি ধরনের সিক্রেট?'

'এই...কোড, বা এই সব আর কি। আমি গোয়েন্দা কাহিনী খুব ভালোবাসি। বই পেলে এক নিঃশ্বাসে শেষ করি। কিন্তু সেগুলো তো সব বানানো গল্প। ওরা যে সব বিপদ সঙ্কেত ব্যবহার করে, তুমি তা জানো। শেখাও না-দুয়েকটা।'

'ঠিক আছে।' একটু ভাবলো রানা। 'আমাদের মধ্যে উইণ্ডো শেড ট্রিক নামে একটা সঙ্কেত চালু আছে।'

'উইন্ডো শেড ট্রিক?'

'হ্যাঁ। কাপ রেখে একটা জানালা দেখালো রানা। রোদ ঠেকানোর জন্যে বড় প্লাস্টিক শীট ব্যবহার করা হয় ওতে। মাঝখানে একটা ভাঁজ থাকে শীটটার, ওপরে তোলা থাকে। প্রয়োজনে অর্ধেকটা বা পুরো জানালাই ঢেকে রাখা সম্ভব। 'সব স্বাভাবিক থাকলে শেডটা নামাবে না তুমি। কিন্তু যদি অস্বাভাবিক কিছু ঘটে যায়, সহকর্মীকে তা জানানোর জন্যে অর্ধেক শেড নামিয়ে রাখবে। তাতেই যা বোঝার বুঝে নেবে সে।'

'চমৎকার!' আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠলো লুইসা। 'এর কথা কোনো বইতে পড়িনি তো। আরেকটা, প্লীজ।'

'একটার কথা ছিলো।' মুচকে হাসলো মাসুদ রানা।

'আর মাত্র একটা।' অনুনয় করলো মেয়েটি।

'বেশ। এটা হলো টেলিফোন ট্রিক। ধরো, তোমার কোনো সহকর্মী, মানে, স্পাই আর কি, ফোন করলো তোমাকে। জানতে চায় সব ঠিকঠাক আছে কি না। যদি ঠিক থাকে, নিজের পরিচয় জানাবে তুমি প্রত্যুত্তরে। আর যদি না থাকে, "রং নাম্বার" বলে রেখে দেবে।'

ব্রেসলেটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে লুইগি। রাতে লুইসা যখন রানার ঘরে ছিলো, সে সময়ে জিনিসটা হাতিয়েছে সে। লুইগি নিশ্চিত, হেনরি সম্পর্কে বোন যা বলেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। বউ নয়, আর কারও কাছ থেকে আত্মগোপন করে আছে লোকটা। ধরিয়ে দিতে পারলে নির্ঘাত মোটা অঙ্কের পুরস্কার জুটবে। কিন্তু কাকে দেবে সে খবর? কারা খুঁজছে হেনরিকে? ঠিক আছে, ব্যাপারটা জানাই আগে ভার্গিলকে। দেখা যাক, কি পরামর্শ দেয় সে।

পিয়াযযা গ্যারিবাল্ডির পিছনে এক অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙে থাকে ভার্গিল, তার সহসেক্রেটারির। নিজের ভেসপা স্কুটার নিয়ে সেখানে পৌঁছুলো লুইগি। ডোরবেলের আওয়াজে খেঁকিয়ে উঠলো ভিয়াভেলি রোজির লীডার, ভার্গিল সিজার।

'কোন হারামজাদা?'

'আমি লুইগি, ভার্গিল। দরজা খোলো, কথা আছে।'

ঘটাং করে দরজা খুললো ভার্গিল। শুধু একটা জাঙিয়া পরে আছে লোকটা। বডি বিল্ডার। চেহারা দেখলেই জান উড়ে যায় অনেকের। মুখটা প্রকাণ্ড। বড় বড় বসন্তের দাগে ভরা। তার ওপর রয়েছে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ।

'এতো সকালে কি মনে করে?'

'গরম খবর আছে। আনন্দে সারারাত ঘুমাতে পারিনি।'

'তাই নাকি? ভেতরে এসো।'

ভার্গিলের দুই রুমের নোংরা, জঘন্য দুর্গন্ধে ভরা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলো লুইগি।

'বলো। কি এমন খুশির খবর নিয়ে এলে।'

'কাল আমার বোন এসেছে রোম থেকে। সঙ্গে ওর এক ছেলে বন্ধুকে নিয়ে এসেছে। খুব পয়সাওয়ালা লোকটা, দেখলেই বোঝা যায়।'

'তো কি?'

'লোকটা আসলে আত্মগোপন করতে এসেছে এখানে।'

'কার কাছ থেকে আত্মগোপন করছে?' চোখ-কপাল কুঁচকে চেহারা কদাকার করে তুললো ভার্গিল।

'জানি না। জানতে হবে।'

'তোমার বোনকে জিজ্ঞেস করোনি?'

'করেছি। কিন্তু বলছে না কিছুই।' পকেট থেকে ব্রেসলেটটা বের করলো লুইগি। 'এই দেখো। আমার বোনকে এটা উপহার দিয়েছে লোকটা।'

'আসল এমারেল্ড?'

'মনে হয়। ওরোলোপিয়ায় গিয়ে চেক্ করে দেখতে হবে।'

'আসল হলে নিশ্চয়ই অনেক দাম হবে?'

'তা হবে। ভাবছি বেচে দেবো।'

'লোকটাকে আমাদের ক্লাবে নিয়ে আসতে পারবে?'

'হ্যাঁ! পারবো।'

উঠে দাঁড়ালো ভার্গিল। 'তাই করো। এক ঘণ্টা পর আসছি আমি। ধোলাই দিয়ে পেটের কথা সব বের করে নেবো।'

amsimon@yahoo.com
www.murchona.com

মনে মনে এটাই চাইছিলো লুইগি। খুশি হয়ে উঠলো। বললো, 'ঠিক আছে। আগে ওরোলোগিয়া থেকে এটা চেক করিয়ে নিই। তারপর বাসায় যাবো। কামাই যা হবে ফিফটি-ফিফটি শেয়ার হবে কিন্তু, ভার্যিল।'

'নিশ্চয়ই।' মনে মনে বললো সে, নিশ্চয়ই না।

'আমি গেলাম তাহলে।'

ওখান থেকে বেরিয়ে কোয়ার্টিয়েরে স্প্যাগনোলোর ছোট এক জুয়েলারি দোকানে এলো লুইগি। 'ওরোলোগিয়া' নাম দোকানটির। কাউন্টারে বসে আছে বুড়ো মালিক, পাওলো লুক্কা। মাথায় দু'তিন সাইজ বড়, নড়বড়ে উইগ। দাঁতগুলোও সব বাঁধানো।

যুবককে দেখে হাসলো লুক্কা। 'কি হে, কেমন আছো?'

'ভালো।'

'কি এনেছো আজ?'

বিনা বাক্যব্যয়ে ব্রেসলেটটা কাউন্টারের ওপর রাখলো লুইগি। জিনিসটা হাতে নিয়েই চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো বুড়োর।

'কোথায় পেলে এটা?'

'নেভার মাইণ্ড। দাম অনেক হবে এর, তাই না?'

'হতে পারে,' সতর্ক মন্তব্য করলো লুক্কা।

'চালাকির চেষ্টা করো না,' কড়া গলায় ধমকে উঠলো লুইগি।

আহত হয়েছে যেন বুড়ো, এমনভাবে বললো, 'তোমাকে কখনও ঠকিয়েছি?'

'সব সময়।'

'সব সময়? মশকরা করছো? যাকগে, এটা নিজের কাছে রেখে দাও। অনেক দামী জিনিস। দেখি, যদি টাকা জোগাড় করতে পারি, তো বিকেলে কিনে নেবো। এখন অতো ক্যাশ নেই।'

'সত্যি? অনেক দাম?' আনন্দে বুকটা নেচে উঠলো লুইগির।

'হ্যাঁ। বিকেলে এসো।'

জিনিসটা পকেটে পুরে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে স্কুটার ছোটালো সে। ছোট্ট গাড়িটা চোখের আড়ালে চলে যেতে কাউন্টারের ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করলো পাওলো লুক্কা। একটা সরকারী সার্কুলার ওটা, নেপলসের সব জুয়েলারি দোকানেই বিতরণ করা হয়েছে এক কপি করে। তাতে পরিষ্কার বর্ণনা আছে ব্রেসলেটটার, যেটা এইমাত্র দেখিয়ে গেল লুইগি।

কিন্তু এ ধরনের সার্কুলারে সব সময় পুলিসের সাথে যোগাযোগ করার কথা বলা থাকলেও এটায় বলা আছে: 'নোটিফাই সাইফার ইমিডিয়েটেলি'। পুলিসের হলে কাঁচকলা দেখাতো লুক্কা, যেমন দেখিয়েছে অতীতে বহুবার। কিন্তু সাইফার সম্পর্কে ভালোই জানা আছে তার, ওদের সাথে টেক্কা দিয়ে কেউ কোনদিন রেহাই পায়নি।

ওরকম মূল্যবান একটা ব্রেসলেটের কেনা-বেচার লাভ থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হচ্ছে সে সাইফারের কারণে, ভেবে লুক্কার বুকটা মুচড়ে উঠলো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করেই হাতে তুলে নিলো সে ফোনের রিসিভার। সার্কুলারের

নিচে টাইপ করা নাম্বারে ডায়াল করলো।

সাত

সাড়ে ন'টায় গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রানা বন্দরের উদ্দেশে। একটা হাইড্রোফয়েল ভাড়া করার চেষ্টা করবে। কিন্তু হলো না। ডকে কয়েকটা পুলিশ পেট্রল কার চোখে পড়লো ওর, ঘুর ঘুর করছে। রানার অভিজ্ঞ চোখ প্রচুর ডিটেকটিভও সনাক্ত করলো। ডক কর্মী এবং দেশী-বিদেশী জাহাজের নাবিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে তারা। চিন্তায় পড়ে গেল ও। ভাব দেখে মনে হচ্ছে সাইফার ওর নেপলসে উপস্থিতির কথা টের পেয়ে গেছে।

কিভাবে? ভাবলো ও, এতো দ্রুত কি করে সম্ভব করলো ওরা কাজটা? সে যে ভাবেই হোক, এর অর্থ হচ্ছে, এ পথের চিন্তা বাদ দিতে হবে রানাকে। শুধু এ পথ কেন, ওর এখানে আত্মগোপনের খবর যদি সত্যিই পেয়ে গিয়ে থাকে সাইফার, তাহলে অন্য সব পথও বন্ধ হয়ে গেছে এতোক্ষণে।

বাতাসে বিপদের গন্ধ পেলো মাসুদ রানা। এতো স্পষ্ট যে মনে হয় হাত বাড়ালেই বুঝি তার ছোঁয়া অনুভব করা যাবে। আর এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না। যতো সময় যাবে, ততোই বিপদ বাড়বে। বাধ্য হয়েই সুজানের সাহায্য নিতে হবে এখন ওকে–আর কোনও উপায় নেই। ওর ইয়টে করে একবার যদি মার্সেই পৌঁছানো যায় কোনমতে, ভাবলো রানা, তাহলে হয়তো…সে তখন দেখা যাবে।

একটা পাবলিক কল বুদের সামনে গাড়ি থামালো রানা। ঝাড়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর পাওয়া গেল মারস-এর সংযোগ। 'মিসেস এলিসন, প্লীজ,' বললো রানা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে।

'কে কথা বলবেন, স্যার?' অপরিচিত একটা গলা।

'বলুন এক বন্ধু।'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সুজানের কাঁপা গলা শোনা গেল। কোনও কারণে হয়তো ভয় পেয়েছে মনে হলো। 'রানা… তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা…ওরা তোমাকে অ্যারেস্ট করেনি তো?'

'না, সুজান।' প্রশ্নটা করতে কিছুতেই চাইছে না মন, তবু করলো রানা। 'সুজান, আমি যদি তোমার ইয়টে আসতে চাই, কোনো অসুবিধে হবে?'

'অবশ্যই না। কখন…?'

'আজ রাতের মধ্যে নেপলসের আশেপাশে পৌঁছুতে পারবে?'

সামান্য দ্বিধান্বিত মনে হলো তাকে। 'একটু ধরো, এক মিনিট।' কারও সাথে ওকে কথা বলতে শুনলো রানা। পরক্ষণেই লাইনে এলো, 'রানা, ক্রুন বলছে এনজিনে সামান্য গোলযোগ দেখা দিয়েছে। আজ না পারলেও কাল পৌঁছে যাবো আমরা নেপলস, যে কোনো সময়ে।'

কি আর করা, ভাবলো মাসুদ রানা। 'ঠিক আছে।'

'কোথেকে পিক্ করবো তোমাকে, রানা?'

'ধন্যবাদ। সময়মতো যোগাযোগ করবো আমি। তখন জানাবো।'

'রানা, প্লীজ, খেয়াল রেখো নিজের দিকে। সাবধানে থেকো।'

'ভেবো না। ঠিকই থাকবো আমি। গুড বাই।'

রানা রিসিভার রেখে দিতে চোখের পানি মুছলো সুজান। আনমনে চেয়ে থাকলো টেলিফোন সেটটার দিকে।

রোম। এক ঘণ্টা পর। কর্নেল হ্যারিসন কেলারের হাতে একটা কেবলগ্রাম তুলে দিলো কর্নেল জিয়ালুকা কোষ্যি। মারস থেকে এসেছে ওটা এইমাত্র। দুটো মাত্র বাক্য: 'মাসুদ রানা কামিং অ্যাবোর্ড মারস। উইল কীপ ইউ ইনফর্মড'।

'মারসের কমিউনিকেশন মনিটর করার ব্যবস্থা করুন, কর্নেল,' বললো কেলার। 'যেন ওটায় পা রাখামাত্র ধরা যায় মাসুদ রানাকে।'

কোথায় যাওয়া যায়? ভাবছে রানা। লুইসাদের বাড়ি মোটেই নিরাপদ নয়। খুব সম্ভব ওর সঙ্গে নেপলস্ এসেছে রানা, কোনোভাবে ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে সাইফার। কিন্তু কিভাবে? পুলিসের কাছে লুইসার যে রেকর্ডস্ আছে, তা থেকে? কিন্তু তা-ই যদি হয়, তাহলে এখানে ওখানে ছোঁক ছোঁক না করে সরাসরি ওদের বাড়িতে কেন চড়াও হয়নি তারা? যা-ই হোক, লুইসাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া ওর কর্তব্য। হয়তো ওর জন্যে হয়রানির শিকার হতে যাচ্ছে লুইসা জিয়েলোনি।

পরক্ষণেই বিদ্যুৎচমকের মতো অন্য একটা চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়। এই গাড়িটা...এটার কথাও জেনে গেছে নাকি সাইফার? এটা নিয়ে রাস্তায় চলা কি ঠিক হচ্ছে? রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রাখলো মাসুদ রানা। হঠাৎ করেই চিকন ঘাম দেখা দিতে শুরু করেছে কপালে। ছোট-বড় অসংখ্য গাড়ি-কার, ভ্যান, বাস, ট্রাক। ওর মধ্যে কোনোটা কি ফলো করছে ওকে? কপালের ঘাম মুছলো ও হাতের চেটো দিয়ে।

কাস্টোমার নেই। বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি এসে গিয়েছিলো ওরোলোগিয়ার মালিক, পাওলো লুক্কার। কাউন্টারে 'ঠুক' 'ঠুক' করে দুটো আওয়াজ উঠতে চোখ মেললো সে। ছাই রঙের কমপ্লিট পরা দুই লোক দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। চোয়াড়ের মতো চেহারা।

'বলুন, সেনর?' পিঠ কুঁজো করে উঠে দাঁড়ালো বৃদ্ধ লুক্কা।

'পাওলো লুক্কা?'

বাঁধানো দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়লো তার। 'সি!' এদেরকে আশা করেছিলো সে। সাইফার অপারেটর।

'ফোন করেছিলেন আপনি।'

'ঠিক। একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে এটা আমার কর্তব্য...'

'অহেতুক কথা বলবেন না। কে নিয়ে এসেছিলো ব্রেসলেটটা?'

'লুইগি নামে এক ছেলে।'

'লুইগি কি, শেষ নাম কি তার?'

কাঁধ ঝাঁকালো লুক্কা। 'দুঃখিত। বলতে পারবো না। ডিয়াভোলি রোজির সদস্য ছেলেটা, বলের হাড্ডি।'

'ডিয়াভোলি রোজি?' একজনই কথা বলছিলো এতোক্ষণ, এবার অন্যজন প্রশ্ন করলো। 'কি সেটা?'

'একটা ক্লাব।'

'কোথায় ক্লাবটা?'

'পাসকালোনে কোয়ার্টিয়েরে সানিটায়। একটা পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউসে।'

'ব্রেসলেটটা রেখে গেছে লুইগি?'

'না, নিয়ে গেছে।'

'হুঁম। লুইগির ঠিকানা জানেন?'

মাথা দোলালো লুক্কা। 'ওর ক্লাবের লীডারের ঠিকানা জানি। ওকে ধরলে জানতে পারবেন।'

'কি নাম তার?'

'ভার্যিল সিজার। কিন্তু সেনর, লোকটা যদি বুঝতে পারে যে আমি আপনাদের ওর ঠিকানা জানিয়েছি...'

'বুঝবে না।'

'পিয়াযযা গ্যারিবল্ডির কাছে ভায়া সরসেন্তায় থাকে সে।

'গ্রাৎসি, সেনর লুক্কা।'

ক্লাবে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো ভার্যিল সিজার। কেডস্ আর জিনস্ পরা সারা, এখন শুধু টি-শার্টটা গায়ে চড়ানো বাকি, এমন সময় দড়াম করে খুলে গেল অ্যাপার্টমেন্টের দরজা। হুড়মুড় করে অপরিচিত দুই লোক এসে ঢুকলো ভেতরে।

চমকে উঠলো আনমনা সিজার। 'অ্যাই! কারা, কি ব্যাপার?'

তার নাকের সামনে একটা আইডেন্টিটি কার্ড ধরলো একজন। চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো ভার্যিল সিজারের। একটা ঢোক গিলে বললো সে, 'আমি তো অন্যায় কিছু করিনি।'

'জানি, ভার্যিল। তোমার ব্যাপারে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। আমরা লুইগি সম্পর্কে আগ্রহী।'

লুইগি! বিস্মিত হলো ভার্যিল। 'কি করেছে ও?'

'ওয়েল। ওকে তুমি চেনো, কি, চেনো না?'

'খুব সম্ভব।'

'তোমার স্মৃতি শক্তি খুব দুর্বল মনে হচ্ছে,' ঠোঁট বাঁকা করে হাসলো একজন। 'চলো,' তার বাহু ধরে টান দিলো দরজার দিকে, 'আমাদের ওখানে স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর ওষুধ আছে।'

'দাঁড়ান!' চেঁচিয়ে উঠলো ভার্যিল সিজার। 'মনে পড়েছে। আপনারা নিশ্চই লুইগি জিয়েলোনির কথা বলতে চাইছেন। কি করেছে সে?'

'কথা বলতে চাই ওর সাথে। কোথায় থাকে ছেলেটা?'

ammsurma@yahoo.com www.murchona.com©

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো ভার্গিল। এর অর্থ হচ্ছে বড় রকম দাঁও মারার যে সম্ভাবনাটা দেখা দিয়েছিলো, সেটা বাতিল। এছাড়া ভিয়াভোলি রোজির প্রতিটি সদস্যকেই কঠিন শপথ নিয়ে ঢোকানো হয় সংগঠনে। রক্তের শপথ। কোনো অবস্থাতেই নিজেদের কারও সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা চলবে না, তার আগে হাসি মুখে মৃত্যু বরণ করবে তারা। ওটাও আরেক সমস্যা।

কিন্তু, কাঁধ ঝাঁকালো ভার্গিল সিজার, কি আর করা। এর নাম সাইফার।

দরজা খুলেই থতমত খেয়ে গেল লুইসা অপরিচিত দুই লোককে দেখে। বুকটা কেন যেন কেঁপে উঠলো ওর।

'সেনরিনা জিয়েলোনি?'

'হ্যাঁ।'

'ভেতরে আসতে পারি আমরা?'

বলতে চাইলো, না, কিন্তু সাহসে কুলালো না। 'কারা আপনারা?'

একজন পকেট থেকে পরিচয় পত্র বের করে দেখালো। 'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমরা।'

আতঙ্কিত হয়ে উঠলো লুইসা। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে লাগলো প্রাণপণে। কাল কি এদের সঙ্গেই কথা হয়েছে আমার টেলিফোনে? ভাবলো ও, কিন্তু এখানে কি করে এলো এরা? 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

'ধন্যবাদ।' লিভিংরুমে এসে বসলো তারা। সামনের একটা সিঙ্গেল সোফায় বসলো লুইসা। বুক কাঁপছে অজানা আশঙ্কায়। মাসুদ রানাকে সহায়তা করার অপরাধে কি ওকেও...।

'কাল এখানে এসেছেন আপনি, রোম থেকে,' বললো একজন। ঠিক প্রশ্ন নয়, জবানবন্দীর মতো শোনালো কথাটা।

'হ্যাঁ। কেন, কোনো অন্যায় করেছি তাতে? স্পীড লিমিট ব্রেক করেছি?'

মুখের কঠোর ভাবটা মোটেই বদলালো না প্রশ্নকারীর। পলকও পড়ছে না।

'সঙ্গে কেউ একজন ছিলো?'

'হ্যাঁ,' সতর্কতার সাথে উত্তর দিলো লুইসা।

'লোকটা কে ছিলো, সেনরিনা?'

কাঁধ ঝাঁকালো ও। 'চিনি না। পথে লিফট চাইলো, নিয়ে এলাম।'

দ্বিতীয়জন জানতে চাইলো, 'সে কোথায় আছে এখন?'

'জানি না। আসার পথে শহরে নামিয়ে দিয়ে এসেছি তাকে।'

'কি নাম ছিলো লোকটার, মাসুদ রানা?'

চিন্তা করার ভঙ্গিতে কপাল কোঁচকালো লুইসা। 'মাসুদ রানা? বলতে পারবো না। নাম জিজ্ঞেস করিনি।'

দুই অপারেটর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। হাসছে। 'আমি বলছি,' বললো প্রথমজন, 'মন দিয়ে শুনুন। ভুল হলে শুধরে দেবেন। পরশু রাতে টর ডি অউনট থেকে আপনাকে ভাড়া করে মেজর মাসুদ রানা। রাউটা দ্য ইনক্রোনিও হোটেলে কাটান আপনারা। কাল সকালে আপনাকে একটা এমারেল্ড ব্রেসলেট

প্রেজেন্ট করে সে। তার অনুরোধে তিন সেট প্লেন আর ট্রেনের টিকেট প্ল্যান্ট করেন আপনি তিনটে হোটেলে। এবং নিজের নামে গাড়ি ভাড়া নিয়ে, সম্ভবত তার টাকায়, পালিয়ে নেপলস আসতে সাহায্য করেন তাকে। কি, ভুল হয়েছে কোথাও?'

মোহাবিষ্টের মতো মাথা দোলালো লুইসা। দু'চোখে নগ্ন ভীতি। 'না,' চাপা গলায় বললো, 'ভুল হয়নি।'

'বেশ। এবার বলুন, মাসুদ রানা কি বাইরে কোথাও গেছে? এখানে ফিরে আসবে আর, না, নেপলস ছেড়ে সরে পড়েছে?'

কোন উত্তরটা ঠিক হবে ভেবে দ্বিধায় পড়ে গেল লুইসা। যদি বলে, চলে গেছে মাসুদ রানা, নিশ্চয়ই এরা অবিশ্বাস করবে ওকে, কোনও সন্দেহ নেই। হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকবে সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে। জানা কথা, যে কোনও মুহূর্তে কাজ সেরে ফিরে আসবে মাসুদ রানা। এবং ধরা পড়ে যাবে এদের হাতে। সেক্ষেত্রে, পালিয়ে আসতে সাহায্য করা ছাড়াও সত্য গোপনের অভিযোগেও অভিযুক্ত হতে হবে ওকে। তার চেয়ে সত্যি কথাটা জানিয়ে দেয়াই ভালো।

'ফিরে আসবে,' বিড়বিড় করে বললো লুইসা জিয়েলোনি।

'কখন?'

'জানি না। বলে যায়নি।'

'অল রাইট, আমরা অপেক্ষা করবো ওর জন্যে। তার আগে আপনাদের বাড়িটা সার্চ করে দেখতে চাই, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।' সোফা ছাড়লো প্রথমজন। কোট সরিয়ে কোমরে গোঁজা রিভলভারটা দেখালো মেয়েটিকে, যেন অজান্তেই।

'ন...না!'

ঘুরে ভেতরদিকে এগোতে যাচ্ছিলো লোক দুটো, এই সময় লিভিংরুমে এসে ঢুকলো লুইসার মা। তাদের দেখে হাসলো, কিছু না বুঝেই। 'কারা এরা, লুইসা?'

'সেনর হেনরির বন্ধু, মা,' মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললো ও। 'তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

লোক দুটোর দিকে ফিরে মাথা দোলালো মহিলা। 'সেনর হেনরি খুব ভালো লোক। আপনাদের জন্যে লাঞ্চের ব্যবস্থা করছি, চলে যাবেন না যেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মামা।' বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়লো প্রথমজনের।

লোকটাকে সাবধান করে দেবে ও, ভাবছে লুইসা তখন থেকে। যেভাবেই হোক, মাসুদ রানাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, সামনে বিপদ। ওদের বাসায় যেন না আসে সে। কিন্তু কিভাবে? লাঞ্চে বসে গেছে দুই সাইফার অপারেটর। গপাগপ গিলেই চলেছে। তাদের দিকে চেয়ে স্থানুর মতো বসে আছে লুইসা। মাসুদ রানাকে ধরিয়ে দিয়ে টাকা রোজগারের চিন্তা অনেক আগেই বিদেয় নিয়েছে ওর মন থেকে।

অমন কাজ কিছুতেই করতে পারবে না লুইসা। কারণ ও ভালোবেসে ফেলেছে তাকে। প্রয়োজনে সারা জীবন বেশ্যা হয়েই থাকবে লুইসা, কিন্তু অমন পথে টাকা রোজগার করবে না। তাছাড়া এই লোক দুটোর কাছে অস্ত্র আছে, নিশ্চয়ই দেখামাত্র খুন করে ফেলবে এরা মাসুদ রানাকে।

arnsumon@yahoo.com
www.murchona.com

কাজেই, সাবধান করতেই হবে ওকে। কিন্তু কিভাবে? মরিয়া হয়ে উপায়
খুঁজতে লাগলো লুইসা জিয়েলোনি। এমন সময় হঠাৎ করেই আজ সকালে রানার
শিখিয়ে দেয়া কায়দাটা মনে পড়ে গেল। আরে, তাইতো! কী বোকা আমি?
চট করে সোফা ছাড়লো ও। মেইন দরজার সাথে একটা জানালা, ওটার সামনে
গিয়ে দাঁড়ালো। আড়চোখে খাওয়ায় ব্যস্ত লোক দুটোর দিকে তাকালো এক পলক।
কোনওদিকে খেয়াল নেই ব্যাটাদের, বড় এক ডিশ ক্যাপেল্লিনি গিলছে ভাগাভাগি
করে।
টান মেরে জানালার সানশেডটা নামিয়ে আনলো লুইসা অর্ধেকটা। আসার পথে
দূর থেকেই ব্যাপারটা চোখে পড়বে মাসুদ রানার–অবশ্য যদি চোখ-কান খোলা রাখে
লোকটা, তবেই।

লুইসাদের বাড়ির দিকে ছুটছে রানা তীরবেগে। সাবধান করতে হবে ওকে। ওর
জন্যে বিপদে পড়তে যাচ্ছে মেয়েটি। সম্ভব হলে ওকে আর কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে
নিজের পথে যাবে রানা। এখন নিশ্চিন্ত মনে গাড়ি চালাতে পারছে ও। কারণ, গাড়ি
এক হলেও নাম্বার প্লেটটা পাল্টে গেছে। শহরের বাইরে, মিউনিসিপ্যাল কার
ইয়ার্ডের ভাঙাচোরা বাতিল গাড়ির স্তূপ থেকে চলনসই একটা ফিয়াটের নাম্বার প্লেট
খুলে লাগিয়ে নিয়েছে রানা এটায়। কাজটা করতে গিয়ে পুরো একটা ঘণ্টা ব্যয়
হয়েছে।
ফার্মহাউসের কাছে এসে গতি কমালো মাসুদ রানা। আরও একটু এগোতেই
ব্যাপারটা চোখে পড়লো, এবং সাথে সাথেই ধড়াশ্ করে লাফিয়ে উঠলো হৃৎপিণ্ডটা।
ব্যাপার কি! ভাবলো ও, সানশেড নামানো কেন? দৈব-সংযোগ না তো? কিন্তু...মনের
মধ্যে বিপদের ডঙ্কা বেজে উঠলো রানার। নিশ্চয়ই বিপদ অপেক্ষা করছে ওখানে।
এক্সিলারেটর দাবিয়ে ধরলো ও। ব্যাপারটা যা-ই হোক, কোনও রকম ঝুঁকি সে
নিতে রাজি নয়। মাইল খানেক সরে এলো রানা ওখান থেকে। একটা সার্ভিস
স্টেশনে গাড়ি থামিয়ে পাবলিক বুথে এসে ঢুকলো। দুই অপারেটর তখনও ডাইনিং
টেবিলেই বসা। ফোনটা বেজে উঠতে হাত থেমে গেল তাদের। একজন সটান
দাঁড়িয়ে গেল চেয়ার ছেড়ে।
কিন্তু তার আগেই উড়ে পৌঁছে গেল লুইসা টেলিফোনের পাশে। 'হ্যালো?'
'লুইসা, কি ব্যাপার? জানালার শেড...'
'রঙ নাম্বার।'
রিসিভার রেখে দিয়েছে লুইসা, টের পাওয়ামাত্র গলা শুকিয়ে গেল রানার। তার
মানে, তার মানে...মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলো ও বুথের ভেতর।
ধাক্কাটা সামলাতে মিনিটখানেক সময় লাগলো রানার। ফিরে এসে গাড়ি
ছাড়লো। দ্রুত ফিরতি পথ ধরলো লুইসাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। তাড়া খাওয়া
শেয়ালের মতো ছুটছে আবার বন্দরের দিকে। নতুন একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।
মূল পোর্টে সারি সারি ফ্রেইটার এবং ওশেন লাইনার মাল বোঝাই দিয়ে ইটালি
ত্যাগের অপেক্ষায় আছে।
ওগুলোর পাশ কাটিয়ে আরও প্রায় দেড় মাইল এগোলো রানা। এবার একটিও

পুলিসের গাড়ি চোখে পড়লো না। সম্ভবত মাসুদ রানার 'অবস্থান' সম্পর্কে অবহিত
হতে পেরে ওদের সরিয়ে নিয়েছে সাইফার। ফেরিঘাটে এসে দাঁড়ালো রানা।
সামনেই বড় একটা বোর্ডে লেখা: 'হাইড্রোফয়েল ফেরি সার্ভিস: ক্যাপরি অ্যাণ্ড
ইশিয়া'।
এমন এক জায়গায় ফিয়াটটা পার্ক করলো রানা যাতে সহজেই চোখে পড়ে।
তারপর চাবিটা ইগনিশনের সাথে রেখে বেরিয়ে এলো। ফেরি সার্ভিসের টিকেট
কাউন্টারে এসে দাঁড়ালো।
'ইশিয়ার পরবর্তী হাইড্রোফয়েল কখন ছাড়বে?' জানতে চাইলো রানা।
'আর আধ ঘণ্টা পর, সেনর।'
'আর ক্যাপরির?'
'ওটা ছাড়ার জন্যে তৈরি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছেড়ে যাবে, সেনর।'
চলবে। 'আমাকে ক্যাপরির ওয়ান-ওয়ে টিকেট দিন একটা।'
'সি, সেনর।'
মহা খাপ্পা হয়ে উঠলো রানা। হাতের তালু খোলা রেখে কাউন্টারের ওপর
'চড়াৎ' করে থাবা মারলো। 'কথায় কথায় শুধু, "সি সেনর" "সি সেনর"!' গলা
উঁচু স্বরে বললো ও যাতে আশপাশের সবার কানে যায়। 'আপনাদের মতো নোংরা
ভাষা পৃথিবীর আর কোথাও শুনিনি আমি। কেন, ইংরেজিতে বলতে পারেন না?'
হাঁ হয়ে গেল টিকেট বিক্রেতা। চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে রানার দিকে।
কাছে পিঠে আর যারা ছিলো, তাদের অবস্থাও প্রায় একই। লোকটির পা থেকে মাথা
পর্যন্ত মাপছে প্রত্যেকে।
'কী ভাষা!' গজগজ করছে রানা, 'যেন মুখ দিয়ে সারাক্ষণ বিষ্ঠা বেরোয়।
স্টুপিড। ও না, ভুল হয়ে গেল। এ দেশে তো বলতে হবে স্টুপিডো!' তীব্র ব্যঙ্গ আর
তাচ্ছিল্য ওর কণ্ঠে। কাউন্টারে টাকা রেখে হতভম্ব বিক্রেতার হাতে ধরা টিকেটটা
থাবা দিয়ে কেড়ে নিলো রানা। তার দিকে এক পলক জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে সরে গেল
জানালার সামনে থেকে।
তিন মিনিট পর ছাড়লো হাইড্রোফয়েল। ছোট ছোট তিনটে ডাক ছেড়ে পিছিয়ে
যেতে শুরু করলো ওটা ঘাট থেকে। চ্যানেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ছোট-
বড় নৌ যানের পাশ কাটিয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে চললো চ্যানেল মাউথের দিকে।
চওড়া আউটার লিমিটে পৌঁছে গতি বেড়ে গেল ফেরির, মাথা পানির ওপরে তুলে
প্রকাণ্ড এক শুশুকের মতো ছুটে চললো ইশিয়ার দিকে।
প্রচুর ট্যুরিস্ট রয়েছে ফেরিতে। নানা দেশের। চারদিকে উচ্চকণ্ঠে হাসাহাসি
আর নানান ভাষার কথোপকথন। কারও নজর নেই রানার দিকে। কিন্তু তা ও হতে
দিতে পারে না। ওপরতলায় সামনের দিকে একটা ছোট্ট বার দেখে সেদিকে
এগোলো রানা। বারটেণ্ডারকে ভদকা আর টনিকের অর্ডার দিয়ে উঁচু একটা টুলে
বসলো। হাতের কাজ সেরেছে বারটেণ্ডারের।
ভাঁজ করা টিস্যু পেপারের ওপর গ্লাসটা বয়ে এনে ওর সামনে রাখলো সে
সসম্মানে। ওতে চুমুক দিলো রানা, এবং পরক্ষণেই 'ঠকাশ্' করে গ্লাসটা আছড়ে
রাখলো কাউন্টারে। চমকে ঘুরে তাকালো বারটেণ্ডার।

'সেনর!'

'এটা কোনো ড্রিঙ্ক হলো?' ঝাঁঝিয়ে উঠলো রানা। 'তোমার কাছে ঘোড়ার পেচ্ছাপ চেয়েছি আমি?'

হাসি-গল্প থামিয়ে সবাই বারের দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে লজ্জায় কান-গাল লাল হয়ে উঠলো লোকটার। শক্ত হয়ে গেছে সে। গলা নামিয়ে বললো, 'আমি দুঃখিত, সেনর। ভদকার সাথে সেরা টনিক...'

কড়া দাবড়ি লাগালো মাসুদ রানা। 'ডোণ্ট গিভ মি দ্যাট শিট!'

একজন ইংরেজ এগিয়ে এলো। 'মিস্টার, আশেপাশে মেয়েরা আছেন। কথাবার্তা সতর্ক হয়ে বলা উচিত।'

বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়ালো রানা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে, চট্ করে দু'পা পিছিয়ে গেল লোকটা। নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে বললো ও, 'জানো, আমি কে? আমি একজন মেজর। ভাগো, জ্ঞান দিতে এসো না আমাকে।' লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে নিজেই সরে পড়লো ও বারের সামনে থেকে। মুখ গোমড়া করে রেলিঙের পাশে একটা খালি চেয়ার দেখে বসে পড়লো।

ক্যাপরি ডকে ভিড়লো এক সময় ফেরিবোট। এখান থেকে মূল দ্বীপে যেতে আরেকটা সরু খালমতো পার হতে হয়–ফিউনিকুলার বা দড়ি টানা খুদে ফেরিতে করে। এর জন্যেও টিকেট করতে হয়। এক বুড়ো ফিউনিকুলারের টিকেট বিক্রি করছে।

'একটা টিকেট দিন,' তাকে ধমকের সুরে বললো রানা। 'দয়া করে তাড়াতাড়ি করুন, সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না আমার। আপনার মতো বুড়ো হাবড়াকে দিয়ে এসব কাজ করানো চলে না, তা বোঝে না আপনার ম্যানেজমেন্ট?'

প্রথমে বিস্মিত হলো লোকটা, পরক্ষণেই রেগে উঠতে লাগলো। কিন্তু তার রাগ দেখার সময় রানার নেই। টিকেটটা ছিনিয়ে নিলো ও বৃদ্ধের হাত থেকে। টাকা ছুঁড়ে ফেলে গট্ গট্ করে ফিউনিকুলারে গিয়ে উঠলো। নিশ্চয়ই ওকে মনে রাখবে অনেকেই, ভাবলো মাসুদ রানা। এ এমন ট্রেইল যা কিছুতেই মিস করবে না সাইফার।

দ্বীপে নেমে ভায়া ভিট্টোরিও এমানুয়েল এলো ও হাঁটতে হাঁটতে। এখানকার কিছুই চেনে না। রাস্তার দু'দিকে তাকাতে তাকাতে এগোচ্ছে। দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে 'কুইসিসানা হোটেল', নিওন সাইনে লেখা বড় একটা হোটেল দেখে ভেতরে ঢুকে পড়লো রানা।

'একটা রুম চাই আমার,' ক্লার্ককে বললো ও।

'দুঃখিত, সেনর। তেমন কোনো ভালো রুম নেই আমাদের।'

'যে কোনো একটা হলেই চলবে।' গুনে গুনে ষাট হাজার লিরা আলাদা করলো রানা একটা বাণ্ডিল থেকে। এগিয়ে দিলো তার দিকে।

'তাহলে দেয়া যাবে।' টাকাটা ক্যাশে পুরে বড় একটা খাতা এগিয়ে দিলো লোকটা রানার দিকে। 'আপনার নামটা লিখুন, সেনর।'

বড় বড় করে লিখলো ও, মেজর মাসুদ রানা।

ওর পদবী দেখে হাসি ফুটলো ক্লার্কের মুখে। 'কতোদিন থাকবেন, মেজর?'

'এক সপ্তা।'

'দ্যাট উইল বি ফাইন। আপনার পাসপোর্টটা?'

'ওহ্, ওটা আমার স্যুটকেসে আছে। একটু পরে পাবেন।'

'ঠিক আছে। বেলবয় ডেকে দিচ্ছি, ও আপনাকে রুমে পৌঁছে দেবে।'

'এখনই না। একটা কাজ আছে বাইরে। ওটা সেরে আসি।'

'নিশ্চই, মেজর, নিশ্চই।'

বেরিয়ে পড়লো মাসুদ রানা। এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো সময় কাটানোর জন্যে। ভায়া ইগনাজিও কেরিরো এবং ভায়া ভি কেমপো পিছনে ফেলে এলো ও। এক কাপ কফি পান করলো বারবারোসা রিসটোরান্টে। এরপর আবার ফিরে এলো পিয়াযা আমবার্টো, ফিউনিকুলার স্টেশনে। খাঁড়ির অপর পাড়ে ফিউনিকুলার থামতে ভিড়ের ভেতর নিজেকে আড়াল করে নেমে এলো রানা যাতে বুড়ো টিকেট বিক্রেতা দেখে না ফেলে।

ওয়াটারফ্রন্টের একটা বারে এসে বসলো। স্কচের অর্ডার দিয়ে চিন্তায় ডুবে গেল। ঠিক করেছে, যতো ঝুঁকিই থাকুক, ঢাকায় ফোন করবে ও এখন। সব খুলে জানাবে মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানকে।

ঢাকা। বিসিআই। চোখ কপালে তুলে সামনে স্তূপ হয়ে থাকা মেসেজগুলোর দিকে চেয়ে আছে চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সোহেল আহমেদ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে এগুলো, বেশ কয়েকটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির গোপন বার্তার প্রতিলিপি–প্রতিটিতে পরিষ্কার ভাষায় মাসুদ রানাকে হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে।

নির্দেশটা ভুল পড়ছে কি না, বা রানার নামটা ওগুলোয় ভুল করে বসানো হয়েছে কি না ভেবে কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগলো সোহেল। লক্ষ্য করলো হাত কাঁপছে ওর একটু একটু। ঘেমে উঠেছে তালু। ঢোক গিলতে গিয়ে আবিষ্কার করলো গলা শুকিয়ে কাঠ।

মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের লাল টেলিফোনটা বেজে উঠলো। কয়েক সেকেণ্ড পর সংযোগটা সোহেলের রুমে দিলো তাঁর পি.এ. ইলোরা। দুরু দুরু করে উঠলো সোহেলের বুক। কাঁপা হাতে রিসিভার তুললো ও। 'হ্যালো?' পরমুহূর্তে বুকের গরম রক্ত ছলকে উঠলো রানার গলা শুনে।

'সোহেল? বুড়ো...'

'ওয়াশিংটন গেছে। তুই কোথায়?' উত্তেজনায় গলা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে ওর।

'বলা যাবে না। শোন, সময় কম।'

'আমরা জানি, বলতে হবে না। তোর ব্যাপারটা সুরাহা করতেই গেছেন বস্। হাবড়াসনে, বুঝলি?' থেমে গেল সোহেল রানার হাসি শুনে। 'তুই...তুই শালা হাসছিস? আমি এদিকে চিন্তায় বাঁচিনা...'

'খুব চিন্তায় পড়ে গেছিস, দোস্ত?' হঠাৎ করেই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলো, দু'চোখ ভিজে উঠলো স্নেহ-ভালোবাসার কাঙাল মাসুদ রানার।

'না!' খেঁকিয়ে উঠলো সোহেল। 'কিসের চিন্তা? বসে বসে পোলাও-কোর্মা

থাকছি, শালা! জানোয়ারই থাকলি চিরকাল, মানুষ আর হবি কবে?'

'এই জন্যেই তোকে এতো ভালোবাসি, বুঝলি?'

পানি এসে গেল এবার সোহেলের চোখেও।

'আগে কখনও বলেছি কথাটা, দোস্ত?' আবার বললো রানা।

'ফিচলামো রাখ,' চোখের পানি মুছলো সোহেল। 'খেয়াল রাখবি নিজের দিকে। কিছু হয়ে গেলে...'

'হবে না, রে! নিশ্চিন্ত থাক। তোদের ভালোবাসার ক্ষমতা প্রচণ্ড। ওটা যতোদিন সঙ্গে থাকবে, ততোদিন অন্তত অপঘাতে মৃত্যু হবে না মাসুদ রানার। রাখছি। কল ট্রেস্‌ হওয়ার ভয় আছে।'

বার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো মাসুদ রানা। সরে পড়তে হবে এখান থেকে। ইশিয়া যাবে ও, তবে ফিউমিকুলারে নয়। হাঁটতে হাঁটতে একটা বোট ল্যান্ডিংএ এসে দাঁড়ালো। ওটার দু'পাশে বেশ কয়েকটা স্পীডবোট বাঁধা রয়েছে। যার যার চালকও আছে বোটে। কড়া স্প্যানিশ বের হলো এবার রানার গলা দিয়ে।

'আ কুয়ে হোরা সালে এল...বোটে ইশিয়া যেতে কতোক্ষণ লাগবে?' একজন চালককে প্রশ্ন করলো ও।

'ট্রেইনটা মিনিটোস...দশ মিনিট।'

ঠিক সময়েই ওকে ইশিয়া পৌঁছে দিলো স্পীডবোট। কোত্থেকে সুজানের ইয়টে উঠবে, কোথায় নেমে যাবে, ঠিক করে ফেলেছে রানা এর মধ্যে। জায়গাটার নাম সুজানকে জানিয়ে দেয়া দরকার। একটা রেস্টুরেন্ট থেকে টাকা বদলে বেশ কিছু কয়েন সংগ্রহ করলো মাসুদ রানা। ওখান থেকেই ফোন করলো মেরিন অপারেটরকে। এবার মারসের লাইন পেতে সময় লাগলো দশ মিনিট।

সুজানই কথা বললো প্রথম। 'তোমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম, রানা। এনজিন ঠিক হয়ে গেছে। বলো, কোত্থেকে তুলতে হবে তোমাকে।'

'সেই প্যালিনড্রোমের কথা মনে আছে তোমার?'

'কিসের কথা?'

'প্যালিনড্রোম। তুমি আমি একবার গিয়েছিলাম সেখানে বেড়াতে।'

কয়েক সেকেণ্ড কথা বললো না সুজান। ভাবছে নিশ্চয়ই। ওর নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে রানা। 'হ্যাঁ, রানা। মনে পড়েছে।'

'কাল ওখানে পৌঁছুতে পারবে?'

'একটু ধরো।' মাউথপীস চেপে ধরে সম্ভবত স্বামীর সাথে কথা বলে নিলো সুজান। 'হ্যাঁ। পারবো।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু তোমাকে আবারও বলছি, সুজান। আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে তুমি বিপদে পড়তে পারো। তুমি...'

'বিপদের ভয় আমি করি না, রানা।'

'অল রাইট। থ্যাঙ্কস এগেইন।'

কেটে দিল লাইন।

*

রোম। সাইফার হেডকোয়ার্টার্স। রেডিও অপারেটরের রুমে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল জিয়ানলুকা ফোর্যিথ এবং কর্নেল হ্যারিসন। রানা-সুজানের ফোনালাপ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে তারা।

'কথাগুলো রেকর্ড করে ফেলেছি, স্যার,' বসের দিকে তাকিয়ে বললো রেডিও অপারেটর। 'বাজিয়ে শোনাবো আবার?'

জিজ্ঞাসু নেত্রে সাইফার ডেপুটি তাকালো কেলারের দিকে।

'ইয়েস, প্লীজ।' মাথা দোলালো কেলার। 'জায়গাটার নাম কি বললো মাসুদ রানা, ওখানটা আরেকবার শুনতে চাই। প্যালিনড্রোম, না কি বললো মনে হলো। জায়গাটা কোথায়? ইটালির কোথাও?'

'কি জানি,' কাঁধ ঝাঁকালো চিন্তিত ডেপুটি। 'আগে কখনও এ নাম শুনিনি আমি। অসুবিধে নেই, ম্যাপ দেখে খুঁজে নেবো।' অপারেটরের দিকে ফিরলো সে। 'বাজাও। আরেকবার শুনি।'

'সি।' টেপ রি-ওয়াইণ্ড করলো লোকটা। তারপর টিপে দিলো 'প্লে' বাটন।

টেলিফোন সেরে ফেরিঘাটে এলো মাসুদ রানা। ফিরে যাবে মেইনল্যাণ্ডে। প্রকাণ্ড এক হাইড্রোফয়েল দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, দশ মিনিটের মধ্যে সরেনটোর উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। টিকেট কেটে উঠে পড়লো রানা।

পেট বোঝাই ট্যুরিস্ট নিয়ে নির্দিষ্ট সময় ইশিয়া ত্যাগ করলো হাইড্রোফয়েল।

চমকে উঠলো অন্যমনস্ক লুইসা জিয়েলোনি। ঝন্‌ ঝন্‌ করে বাজছে টেলিফোন। তাড়াতাড়ি উঠতে গেল সে।

'বসে থাকুন,' ধমকের সুরে বললো অপারেটরদের একজন। লম্বা পায়ে এগিয়ে এসে রিসিভার তুললো। 'হ্যালো?'

কয়েক মুহূর্তেই ওপ্রান্তের বক্তব্যের মর্মার্থ বোঝা হয়ে গেল তার। রিসিভার আছড়ে রাখলো সে ক্রাডলে। সঙ্গীর দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললো, 'জলদি চলো! হাইড্রোফয়েলে চড়ে ক্যাপরি পালিয়ে গেছে মাসুদ রানা।'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল তারা। প্রথমে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো লুইসার কথাটা শুনে। তার মানে ওর সঙ্কেত বুঝতে পেরেই পালিয়ে গেছে মাসুদ রানা। পরক্ষণেই ম্লান হয়ে গেল। আর কি দেখা হবে না মানুষটির সঙ্গে? তা না হোক, ও নিজেকে বাঁচাতে পারলেই লুইসা খুশি।

প্রচণ্ড ভিড় সরেনটো ফুড মার্কেটে, মানুষের ধাক্কায় পথ চলাই দায়। তাজা ফল আর শাক সবজীর পাহাড় জমে আছে রাস্তার ওপর। ফুটপাথ তো বটেই, মূল রাস্তাটা যে কোথায় তাই বুঝে ওঠা দায়।

কতো আর পারা যায়! সমানে কাঁধ আর কনুইয়ের গুঁতো চালাতে গিয়ে এক সময় নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়লো মাসুদ রানা। হাঁপাচ্ছে। শীতের মধ্যেও ঘাম ছুটে গেছে ওর।

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

আধ মাইল লম্বা গরুর মাংসের বাজার পেরিয়ে আন্তঃজেলা ট্রাক টার্মিন্যালে পৌঁছুলো রানা। গোটা দশ-বারো ট্রাক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ফল, শাক-সবজি আর মাংস বোঝাই করে ছেড়ে যাবে বিভিন্ন স্থানের উদ্দেশে। সবার পিছনেরটির ড্রাইভারকে সামনের বনেটে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে দেখে এগিয়ে গেল রানা।

নিখুঁত ফরাসী টানে জিজ্ঞেস করলো, 'পার্ডন, মঁশিয়ে, আমি সিভিটাভেক্কিয়া যাওয়ার ট্রাক খুঁজছি। আপনি কি ওদিকেই যাচ্ছেন?'

'না। ও যাবে,' ইশারায় সামনের ট্রাকটা দেখালো লোকটা। 'আল- ফ্রেডো। ওর সাথে কথা বলে দেখুন।'

'মার্সি।'

পরবর্তী ট্রাকের পিছনে এসে দাঁড়ালো রানা। পিছনের টেইলবোর্ড তুলতে যাচ্ছিলো ড্রাইভার, লোডিং শেষ। ওকে দেখে থেমে গেল।

'আপনি সিভিটাভেক্কিয়া যাচ্ছেন, মঁশিয়ে?'

'যেতে পারি।' কাঠখোট্টা জবাব ড্রাইভারের। 'কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'আমিও ওদিকে যাবো। আপনার যদি আপত্তি না থাকে...আই শ্যাল বি গ্ল্যাড টু পে ইউ।'

'কতো?'

পাঁচশো লিরার বিশটা নোট তুলে দিলো রানা ড্রাইভারের হাতে। 'চলবে নিশ্চই?'

বেকুবের মতো চেয়ে থাকলো ড্রাইভার নোটগুলোর দিকে। 'এই টাকায় আপনি পাঁচবার প্লেনে সিভিটাভেক্কিয়া আসা-যাওয়া করতে পারেন। তাই না?'

সাথে সাথে সঙ্কুচিত হয়ে গেল রানা। নার্ভাস ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকালো। তারপর নিচু গলায় বললো, 'পারতাম। কিন্তু আমার কিছু পাওনাদার আছে, ওরা নজর রাখছে আমার ওপর। এয়ারপোর্টে গেলেই ধরা পড়ে যাবো। এই জন্যেই ট্রাক খুঁজছি, বুঝলেন না?'

'ম।' মাথা দোলালো ড্রাইভার। নোটগুলো পকেটে পুরে বললো, 'বুঝেছি। ঠিক আছে, উঠে পড়ুন ক্যাবে।'

ইতস্তত করতে লাগলো ও। হাই তুললো লম্বা করে। 'আমি খুব টায়ার্ড, মঁশিয়ে। ঘুমে ভেঙে আসছে চোখ।' হাত তুলে ক্যারিয়ার দেখিয়ে বললো, 'আমি বরং এখানেই শুয়ে থাকি।'

'ক্যারিয়ারে? রাস্তা ভালো নয়, গাড়ি বাম্প করবে খুব।'

'তাতে অসুবিধে নেই। আমার ঘুম খুব গাঢ়, টের পাবো না।'

'অ্যাজ ইউ প্লীজ।'

'মার্সি।'

উঠে পড়লো রানা ক্যারিয়ারে। কয়েকটা সবজির ক্রেট সরিয়ে শোয়ার মতো জায়গা করে নিয়ে পা মেলে দিয়ে বসলো। গর্জন করে স্টার্ট নিলো ট্রাক। রওনা হয়ে গেল। রাত হয়ে গেছে আগেই। হাইওয়ের দু'পাশের গাঢ় অন্ধকার দেখতে দেখতে ঝিমুনি এসে গেল রানার কয়েক মিনিটের মধ্যে। কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো ও। এবং

গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

ওদিকে, গাড়ি চালাতে চালাতে রানার কথা ভাবছে ড্রাইভার আলফ্রেডো। সরেনটো পুলিসের গোপন সার্কুলারে যাকে ধরিয়ে দিতে বলা হয়েছে, তার সঙ্গে এই লোকটির মোটামুটি মিল রয়েছে—শুধু গোঁপ আর চাপ দাড়ি বাদে। ওগুলো নকলও তো হতে পারে, ভাবছে সে, সত্যি মিথ্যে যাচাই করে দেখলে ক্ষতি কি? দেখাই যাক না। ব্যাটাকে ধরিয়ে দিতে পারলে নিশ্চয়ই বড় অঙ্কের পুরস্কার পাওয়া যাবে।

এক ঘণ্টা পর, একটা হাইওয়ে ট্রাক স্টপের সার্ভিস স্টেশনে গাড়ি দাঁড় করালো আলফ্রেডো। অ্যাটেনডেন্টকে ট্যাঙ্ক ভরার নির্দেশ দিয়ে পিছনদিকে দাঁড়ালো এসে। কাৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে রহস্যময় মানুষটি। জোর পায়ে রাস্তার ওপারের একটা রেস্টুরেন্টের দিকে চললো আলফ্রেডো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' আনন্দের আতিশয্যে চেয়ার ছেড়ে প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছে জিয়ানলুকা ফেরারি। 'এই-ই সেই লোক। কোনো ভুল নেই। মন দিয়ে শুনুন। লোকটা সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক। যেভাবে যা করতে বলি, ঠিক সেভাবে করবেন। বুঝতে পেরেছেন আমার কথা?'

'ইয়েস, স্যার।'

'এখন কোথায় আছেন আপনি?'

'সরেনটো–সিভিটাভেক্কিয়া হাইওয়ের এক এজিআইপি ট্রাক স্ট্যাণ্ডে, স্যার।'

'লোকটা এখনও ঘুমে?'

'জ্বী, স্যার।' চিন্তায় পড়ে গেছে আলফ্রেডো। টেলিফোনটা আসলে করেছিলো সে সরেনটো পুলিস স্টেশনে, কিন্তু তার বক্তব্যের মর্মার্থ টের পেয়ে কলটা সরাসরি রোমে ডাইভার্ট করে দিয়েছে ব্যাটারা সাথে সাথে। কাজটা বোধহয় উচিত হয়নি, উসখুস করছে আলফ্রেডো।

'এমন কিছু করবেন না যাতে ওর সন্দেহ হয়, কেমন? আপনার ট্রাকের বর্ণনা আর লাইসেন্স নম্বরটা বলুন।'

বললো সে।

'গুড। এবার ফিরে যান গাড়িতে, রওনা হয়ে পড়ুন। আমরা আসছি।'

রিসিভার রেখে কর্নেল কেলারের দিকে তাকালো সাইফার ডেপুটি। মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি। 'পেয়েছি শালাকে। চলুন, হেলিকপ্টারে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবো জায়গামতো।'

হাসি ফুটলো কেলারের মুখেও। 'চলুন তাহলে।'

ওদিকে, রিসিভার রেখে ঘেমে ওঠা হাতের তালু মুছলো আলফ্রেডো শার্টে ঘষে। ফিরে এসে কোনওদিকে তাকালো না, ফুয়েলের দাম শোধ করে উঠে বসলো ক্যাবে। স্টার্ট দিলো। মনটা কেমন খুঁত খুঁত করছে। গোলাগুলি হলেই সর্বনাশ। গাড়ির ক্ষতি হলে বউ আস্ত রাখবে না।

এক ঘণ্টা পর কট কট একটা আওয়াজ এলো কানে। হেলি-কপ্টারের আওয়াজ খুব সম্ভব। গতি কমিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকালো সে ঝুঁকে। সাথে সাথেই প্রকাণ্ড কালো একটা অশুভ ছায়া চোখে পড়লো। ওটার পেটের কাছে লাল

আলো জ্বলছে একটা, তার পাশেই স্টেট পুলিশের মার্কিং দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। গতি আরও কমাতে বাধ্য হলো আলফ্রেডো।

সামনের রোড ব্লকটা দেখতে পেয়েছে সে। দুটো পুলিস ট্রাক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। হেলমেট পরা কয়েক ডজন পুলিস, অটোমেটিক অস্ত্র উঁচিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে প্রস্তুত। থেমে পড়লো আলফ্রেডো। রোড ব্লকের পিছনে রাস্তার ওপর নেমে পড়েছে হেলিকপ্টার। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দুই কর্নেল। বিশাল তিনটে রোটরের প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাসের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সামনে ঝুঁকে ছুটে আসছে এদিকে।

স্টার্ট বন্ধ করে লাফ দিলো আলফ্রেডো। দৌড়ে গেল তাদের দিকে। কর্নেল ফোয়যির ইশারায় ট্রাকটা ঘিরে ফেললো পুলিস বাহিনী। 'লোকটা আছে এখনও?' আলফ্রেডোকে জিজ্ঞেস করলো ফোয়যি।

'আছে।'

'খবরদার, গুলি করবে না কেউ।' ট্রাকের দিকে এগিয়ে গেল কেলার ফোয়যিকে পিছনে ফেলে। পিছনের টেইল গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। 'বেরিয়ে এসো, মাসুদ রানা,' চেঁচিয়ে বললো সে। 'কুইক! ঘিরে ফেলা হয়েছে তোমাকে। পালাবার চেষ্টা করো না, রানা। ইট'স ওভার।'

কোনও উত্তর নেই।

'পাঁচ সেকেণ্ড সময় দেয়া হলো তোমাকে, রানা।'

এবারও কোনও সাড়া এলো-না ও তরফ থেকে।

এইবার এগোলো ফোয়যি। তার নীরব ইশারায় যার যার অস্ত্রের বোল্ট টেনে তৈরি হলো পুলিস বাহিনী।

'না!' চেঁচিয়ে উঠলো কেলার। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততোক্ষণে।

এক সাথে গর্জে উঠলো সবগুলো স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। বিকট আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল কেলারের। অবস্থা বেগতিক দেখে আগেই বসে পড়েছে সে ঝপ্ করে। বৃষ্টির মতো গুলির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল ফল আর সব্জির ক্রেটগুলো, একই অবস্থা হয়েছে আলফ্রেডোর সাধের ট্রাকের।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর থামলো গোলাগুলি। লাফিয়ে ক্যারিয়ারে উঠে পড়লো জিয়ানলুকা ফোয়যি। আতিপাতি করে খুঁজতে লাগলো রানার মৃতদেহটা। কিন্তু হতাশ হতে হলো তাকে। মাথা চুলকাতে চুলকাতে কর্নেল কেলারের সামনে এসে দাঁড়ালো সে।

'কই, নেই তো, রানা।'

উত্তর দিলো না কেলার। আগুন ঝরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো তার দিকে।

আট

সিভিটাভেক্বিয়া। প্রকাণ্ড দুর্গঘেরা রোমের প্রাচীনতম সমুদ্র বন্দর। ১৫৩৭ সালে

মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর নকশায় তৈরি করা হয় এই দুর্গ। ইউরোপের ব্যস্ততম সমুদ্রবন্দরগুলোর অন্যতম। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আর সব বন্দরের মতোই—নোংরা।

ভোর হয়েছে কেবল। কিন্তু আরও আগেই জেগে উঠেছে বন্দর, শুরু হয়ে গেছে দিনের কাজ। ক্যাঁচ কোঁচ ঘ্যাঁচ ঘোঁচ আওয়াজ তুলে তেলের ওয়্যাগন টানা একটা রেলগাড়ি এসে দাঁড়ালো বন্দরের একেবারে কাছের রেল স্টেশনে। সারেন্টো থেকে এসেছে। ওটা ঠিকমতো দাঁড়াবার আগেই মাঝামাঝি জায়গার একটা ওয়্যাগন থেকে লাফিয়ে নামলো মাসুদ রানা। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে রেলরোড ইয়ার্ড পার হলো ও।

মোটামুটি চলনসই একটা রেস্টুরেন্ট দেখে ঢুকে পড়লো ভেতরে। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। প্রায় সবগুলো টেবিলই ভরে উঠেছে এর মধ্যে। এরা সবাই বন্দরের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হবে, মনে হলো রানার। খুঁজেপেতে একটা খালি টেবিল বের করলো ও। লম্বা নাশতার অর্ডার দিয়ে কয়েক ঘণ্টা আগের কথা ভাবতে বসলো।

ট্রাক চলতে শুরু করার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো রানা। ওটার গতি অব্যাহত থাকলে ঘুমিয়েই থাকতো, কিন্তু থেমে দাঁড়াতেই পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠলো ও মুহূর্তে। ট্রাক চলছে না বুঝতে পেরে উঠে বসে উঁকি দিলো বাইরের দিকে। আলফ্রেডোকে হন হন করে রাস্তা পেরিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকতে দেখে কেমন সন্দেহ জাগলো মনে।

মিনিট পাঁচেক পর লোকটা যখন বেরিয়ে এলো, তার ত্রস্ত হাঁটা দেখেই বুঝে ফেললো রানা গণ্ডগোল ঘটে গেছে কোনও। ঘুমের ভান করে অপেক্ষা করতে লাগলো, যদি উঁকি দেয় আলফ্রেডো। কিন্তু সোজা এসে ক্যাবে উঠেই ট্রাক স্টার্ট দিলো সে। সুযোগ বুঝে চট্ করে নেমে পড়লো মাসুদ রানা। চিন্তিত মনে আধ মাইল হাঁটার পর রেল লাইন...।

চিন্তায় ছেদ পড়লো রানার। নাশতা আর গনগনে আগুনের মতো এক কাপ কফি দিয়ে গেল ওয়েটার। ঝটপট খাওয়া সারলো মাসুদ রানা। কফিতে একটা ছোট্ট চুমুক দিতেই প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল, দূর হয়ে গেল সমস্ত ক্লান্তি। সিগারেট ধরালো ও। সুজানের কথা ভাবতে লাগলো। এতোক্ষণে হয়তো জায়গামতো পৌঁছে গেছে মারস, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। জায়গাটার নাম সুজানের এখনও মনে আছে ভেবে কৃতজ্ঞ বোধ করলো রানা।

প্যালিনড্রোম বলেছিলো রানা অন্য কারণে। গোপনীয়তার স্বার্থে। জায়গাটার নাম আসলে এলবা-গালফ্ অভ লায়নস-এর এক ছোট্ট দ্বীপ। সুজানের বাবার ব্যবসায়িক স্বার্থ আছে সেখানে। বড় এক ফার্টিলাইজার কারখানা। বছর দুয়েক আগে সুজানের চাপাচাপিতে সেখানে বেড়াতে যেতে হয়েছিলো রানাকে। ছোট হলেও ঘন বসতিপূর্ণ দ্বীপ। বিশেষ এক কারণে দ্বীপটা বিখ্যাত হয়ে আছে ইতিহাসে।

দু'কাপ কফি আর তিনটে সিগারেট ধ্বংস করলো রানা এক বসায়। তারপর বেরিয়ে এলো রাস্তায়। আরও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সিভিটাভেক্বিয়া। ভিড় ঠেলে মূল বন্দর এলাকা থেকে বেরিয়ে এলো মাসুদ রানা। ফেরিঘাটে এসে দাঁড়ালো। ছোট

anmsomon@yahoo.com
www.murchona.com

ছোট মোটর বোট আর প্রাইভেট ইয়ট গিজ গিজ করছে পুরো হারবারে।

কয়েক মিনিট পর বিশাল এক ফেরিবোট এসে ভিড়লো। মোটে বড় করে লেখা: সিভিটাভেক্কিয়া-এলবা-সিভিটাভেক্কিয়া। ভালোই হলো, ভাবলো রানা। ফেরিতেই যাওয়া যাক। ভিড় ঠেলে এগোতে যাবে, এই সময় ব্যাপারটা চোখে পড়লো। সাথে সাথে পিছিয়ে এলো রানা।

সাইরেন বাজিয়ে বিদ্যুৎবেগে ফেরিঘাটের দিকে ছুটে আসছে একটা স্কোয়াড কার। ওটার পিছনেই এক ঝাঁক সেডান। প্রতিটিতে চারজন করে সাদা পোশাকধারী সাইফার অপারেটর। মিনিট খানেকের মধ্যে পুরো এলাকা ঘিরে ফেললো তারা। সর্বনাশ! ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলো রানা। কি করে টের পেলো ওরা যে এদিকেই এসেছি আমি?

পরক্ষণেই মনে পড়লো, বেখেয়ালে ও নিজেই আলফ্রেডোকে বলেছিলো কাল, সিভিটাভেক্কিয়া যেতে চায় ও। ইশ্‌শ্‌! অল্পের জন্যে বাঁচা গেছে এ যাত্রাও। হয়েছিলো আরেকটু হলেই। ফেরিতে না হোক, কোনও মোটর বোট ভাড়া করে যে এলবা যাবে, এখন আর তা-ও সম্ভব নয়। নিজের ভুলে নিজেই ফাঁদে পড়েছে মাসুদ রানা।

জোর পায়ে শহরের দিকে চললো ও। অন্য উপায় খুঁজতে হবে। ফেরিঘাট থেকে হাঁটাপথে মাত্র দশ মিনিটের দূরত্ব সিভিটাভেক্কিয়া শহরের। ঢোকার মুখে বড় বড় হেডিঙে কয়েকটা বিরাট আকারের রঙচঙে পোস্টার সাঁটা দেখতে পেলো রানা। বেলুনের রঙিন ছবি। নিচে লেখা: ফেয়ার গ্রাউণ্ডে আসুন। আকাশ ভ্রমণ করুন! এছাড়াও...।

কয়েক মুহূর্ত পোস্টারগুলোর দিকে চেয়ে থাকলো মাসুদ রানা। ভাবছে। এক সময় হাসি ফুটলো ওর মুখে। পাওয়া গেছে, ভাবলো, এবার আর কে পায় ওকে!

সিভিটাভেক্কিয়ার পাঁচ মাইল উত্তরে দিগন্তজোড়া এক মাঠ–ফেয়ার গ্রাউণ্ড। নানা রঙের ডজন খানেক বিশালাকার বেলুন দেখা যাচ্ছে, সারা মাঠজুড়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে। প্রতিটি একটা করে ট্রাকের সাথে মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। একদল গ্রাউণ্ড ক্রু ব্যস্তভাবে ঠাণ্ডা বাতাস ভরছে ওগুলোয়। মাঠের একদিকে কয়েকটা চেজ কার অপেক্ষা করছে–আকাশ ভ্রমণ শুরু হলে অনুসরণ করবে বেলুনকে। দু'জন করে মানুষ আছে কারে। একজন ড্রাইভার, অন্যজন বেলুন স্পটার।

চারদিকে নানান বয়সী নারী-পুরুষ এবং শিশুদের মহা হুল্লোড় চলছে। রীতিমতো উৎসবের আমেজ পুরো মাঠ জুড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যে এ প্রতিযোগিতার আয়োজনকারীর সাথে আলাপ জমিয়ে ফেললো মাসুদ রানা।

'খুব বড় আয়োজন মনে হচ্ছে,' তাকে বললো ও।

'হ্যাঁ। জানুয়ারি রেস বলি আমরা একে। চড়বেন নাকি? বেলুনে?'

মাথা দোলালো রানা। 'না।'

আসলে চড়েছে ও। সোহানাকে নিয়ে। লেক জেনেভায়। এতোদিন পর সোহানার কথা মনে পড়তে ধক করে উঠলো বুকের মাঝে। হঠাৎ করেই উল্টোপাল্টা আচরণ শুরু করেছিলো সেবার বেলুন। ভারসাম্য হারিয়ে হু হু করে নামতে থাকে

নিচের দিকে। সোহানা তো বটেই, রানাও ঘাবড়ে গিয়েছিলো। বাস্কেটের তলা যখন উত্তাল লেকের ঢেউ ছুঁই ছুঁই করছে তখন আর উপায়ান্তর না দেখে দুটো স্যাণ্ডব্যাগ ছুঁড়ে ফেলে দেয় ও। ওজন কমে যেতে সাথে সাথে আবার ওপরে উঠতে শুরু করে বেলুন।

'চেষ্টা করে দেখতে পারেন পরে এক সময়,' বললো লোকটা। 'মজার অভিজ্ঞতা হবে।'

'আজকের রেস কোথায় শেষ হবে?'

'ঘুগোস্লাভিয়া। চমৎকার পুবমুখো বাতাস আছে আজ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেস শুরু হবে। যতো ভোরে বেলুন ওড়ানো যায়, ততোই ভালো। ভোরের দিকে ঠাণ্ডা থাকে বাতাস।'

'তাই?'

বেলুনে বাতাস ভরার কাজ শেষ। এবার ওগুলোর খোলামুখ বরাবর নিচে বসানো বড় বড় প্রপেন বার্নার জ্বেলে দিলো ক্রুরা এক এক করে। ফড় ফড় শব্দ করছে আগুন, গরম বাতাস গিয়ে মিশতে শুরু করেছে ভেতরের ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নড়তে আরম্ভ করলো বেলুনগুলো, একটু একটু ভেসে উঠতে লাগলো শূন্যে। ট্রাকে বাঁধা দড়ি টানটান হয়ে উঠলো। এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে এখন ওগুলো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে।

'আমি একটু কাছে গিয়ে দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো মাসুদ রানা।

'যান,' বললো আয়োজনকারী। 'কিন্তু ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে হাত দেবেন না যেন।'

'আচ্ছা।' হলুদ আর লাল স্ট্রাইপের একটা বেলুনের কাছে এসে দাঁড়ালো ও। এটার বার্নারেই আগুন ধরানো হয়েছে প্রথমে। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই প্রপেন গ্যাসে ভরে গেছে ভেতরটা, ভাবলো ও। মাটির এক হাত ওপরে ভাসছে বেলুনটার বাস্কেট।

চট করে ট্রাকের ক্যাবের ওপর দিয়ে ঘুরে এলো রানার দৃষ্টি। কেউ নেই। ক্রুদের কাউকেও আশেপাশে দেখা গেল না। চট করে বাস্কেটে উঠে পড়লো এবার ও। মাথার ওপর পুরো আকাশ ঢেকে ফেলেছে ডিমের মতো দেখতে বেলুনটা।

প্রথমেই ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের পাইরোমিটারের ওপর চোখ বোলালো রানা। বেলুনের টেম্পারেচার চেক করে দেখলো। চলবে, সন্তুষ্ট হলো ও। এরপর একে একে অলটিমিটার, চার্ট, রেট অভ ক্লাইম্বিং ইণ্ডিকেটর এবং টুল কিট পরীক্ষা করে দেখলো। একেবারে তৈরিই আছে সব কিছু। ঝুঁকে টুল কিট থেকে একটা ধারালো ছুরি তুলে নিলো রানা।

এমন সময় মানুষের গলা কানে যেতে ঘুরে দাঁড়ালো ঝট করে। খুব সংক্ষিপ্ত পোশাক পরা এক জোড়া মার্কিন যুবক-যুবতীর ওপর চোখ পড়লো রানার। একটা করে মাঝারি আকারের ট্রাভেল ব্যাগ দু'জনের হাতে। গল্প করতে করতে এদিকেই আসছে। অন্য বেলুনগুলোর দিকে তাকালো রানা। এরই মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষ উঠে পড়েছে কয়েকটায়।

এটা বোধহয় ওই ছোঁড়া-ছুঁড়ির বরাদ্দ, ভাবলো রানা। মনে মনে বললো, মাফ

করো, বাপু। অন্যদিকে দেখো। বলেই ঘ্যাঁচ করে ছুরিটা বসিয়ে দিলো নড়িতে। এক মুহূর্ত থমকে থাকলো বেলুন, যেন দ্বিধান্বিত। তারপর নড়ে উঠলো। হেলেদুলে উঠতে শুরু করলো। তাই দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো যুবক-যুবতী।

'হেই!' ছুরি ফেলে দিয়ে উদ্বাহু নৃত্য শুরু-করে দিলো মাসুদ রানা। খুব ভয় পেয়ে গেছে যেন, এমন ভাঙা ভাঙা গলায় তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো। 'বেলুন থামাও...ওরে বাবা, মরে যাবো...'

প্রথমে থতমত খেয়ে গেলেও সামলে নিতে দেরি হলো না আয়োজনকারীর। দলবল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসতে লাগলো সে। কিন্তু রানা ততোক্ষণে নাগালের বাইরে চলে গেছে। থেমে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবলো লোকটা। তারপর চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'ফিগলিও ডিউনা মিগনেট্টা...ভয় পাবেন না, সেনর! ঘাবড়াবেন না! আপনার সামনের প্যানেলে অলটিমিটার আছে। ব্যালাস্ট ব্যবহার করে এক হাজার মিটার উচ্চতায় থাকার চেষ্টা করুন। ঠিক আছে?'

যেন বাধ্য হয়েই মাথা দোলালো ও। 'ঠিক আছে।'

'ভা বেনে।' হাসলো লোকটা। হাত নাড়লো মাথার ওপর। 'হ্যাভ আ ফ্রি রাইড টু যুগোস্লাভিয়া, মিও এমিকো। সী ইউ দেয়ার।'

বেশ দ্রুত ওপরে উঠতে শুরু করেছে বেলুন, সেই সাথে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে পুবে—এলবার উল্টোদিকে। কিন্তু তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই মাসুদ রানার। ওর জানা আছে, বিভিন্ন উচ্চতায় একেক দিকে গতি থাকে বাতাসের। নিচে তাকালো ও ফেয়ার-গ্রাউণ্ডের দিকে। অন্য বেলুনগুলো এখনও ওঠেনি। একটা চেক কারের ওপর চোখ পড়লো। রওনা হয়ে গেছে, এগিয়ে আসছে রানার বেলুন ট্র্যাক করতে।

ওজন কমাতে হবে। টপাটপ দুটো স্যাণ্ডব্যাগ ছুঁড়ে ফেলে দিলো ও বেলুন থেকে। তারপর অলটিমিটারের দিকে তাকালো। উত্থান দ্রুততর হয়েছে, ক্রমেই উঠে যাচ্ছে বেলুন। ছয়শো ফুট...সাতশো ফুট... নয়শো ফুট...এগারোশো ফুট...

পনেরোশো ফুট উচ্চতায় উঠে এসে টের পেলো রানা, দুর্বল হয়ে আসছে বাতাস। খুব আস্তে আস্তে উঠছে বেলুন। আরও একটা ব্যাগ ফেলে দিলো ও। শুরু করলো স্টেয়ার স্টেপ টেকনিক—একটু উঠে থেমে পড়া, আবার ওঠা, আবার থেমে পড়া। বাতাসের গতি বুঝতে সাহায্য করে এই টেকনিক। দু'হাজার ফুটে উঠেই অনুভব করলো রানা, বাতাসের গতি এখানে ভিন্নমুখী। থেমে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত দোল খেলো বেলুন অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। তারপর ধীরে, খুব ধীরে রওনা হলো পশ্চিমে।

অন্য বেলুনগুলোও ফেয়ার গ্রাউণ্ড ছেড়েছে ততোক্ষণে। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে ওগুলোকে। পুবদিকে চলেছে সব ক'টা, যুগোস্লাভিয়ার উদ্দেশে। আগুনের অস্পষ্ট ফড় ফড় আর বাতাসের মৃদু ফিসফিস ছাড়া কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। বাস্কেটের কিনারায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো মাসুদ রানা। আনমনা।

দুপুরের দিকে লিগুরিয়ান সাগরের ওপর এসে পড়লো রানা। সামান্য উত্তর-পশ্চিমে চলেছে এখন বেলুন, টাসকানি উপকূলের দিকে। বিস্তৃত উপকূল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য দ্বীপ। ওর মধ্যে সবচেয়ে বড়টি এলবা। এখানেই

অবরুদ্ধ শেষ জীবন কেটেছে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান বোনাপোর্টের। কাছেই রয়েছে কর্সিকা, তাঁর প্রিয় জন্মভূমি। মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত একটাই চিন্তা ছিলো নেপোলিয়ানের, কি করে পালিয়ে ফ্রান্সের মেইনল্যাণ্ডে যাওয়া যায়। রানারও একই ভাবনা এ মুহূর্তে—পার্থক্য শুধু, নেপোলিয়ানের সুজান ছিলো না, ছিলো না মারস।

তিন হাজার ফুট উঁচু ক্যাপানি পাহাড় চোখে পড়লো এক সময়। ওটার কাছে পৌঁছে সেফটি লাইন টানলো মাসুদ রানা। বেলুনের ওপরদিকের একটা ভালভ খুলে গেল, বেরিয়ে যেতে শুরু করলো গরম বতাস। একটু একটু করে নামতে লাগলো বেলুন। এলবার বাড়িঘর সব হালকা গোলাপী রঙের গ্র্যানিট পাথরে তৈরি। ওপর থেকে দারুণ লাগছে ওটা।

ক্যাপানির পাদদেশে অবতরণ করলো মাসুদ রানা। শহর এখান থেকে বেশ দূরে। ও নিজেও এটাই চাইছিলো, যতো কম জানাজানি করে পারা যায়, ততোই ভালো। বেলুনটার ব্যবস্থা করে দুরপথে তিন মাইল দূরের একটা পাহাড়ি রাস্তায় এসে দাঁড়ালো রানা, গাড়ির আশায়। বেশিক্ষণ লাগলো না। বাঁক ঘুরে একটা কার এদিকেই আসছে দেখে হাত তুললো ও।

'শহরে যেতে চাই। একটা লিফট দিলে খুশি হবো।'

'নিশ্চয়ই। জাম্প ইন।'

চালক বেশ বয়স্ক। আশি বছরের কম হবে না বয়স। সারা মুখের চামড়া কুঁচকে ঝুলে পড়েছে। রানা উঠে বসতে হাসলো লোকটা দাঁতহীন মাড়ি বের করে।

'একটু আগে ওদিকে একটা বিরাট বেলুন দেখলাম। চমৎকার লাল-হলুদ স্ট্রাইপের। দেখেছেন আপনি?'

'তাই নাকি? নাতো!'

'টুরিস্ট?'

'হ্যা।'

'কোত্থেকে এসেছেন?'

'রোম।'

'খুব ভালো জায়গা।' আবার মাড়ি দেখালো বৃদ্ধ। 'একবার গিয়েছিলাম।'

চল্লিশ মিনিট লাগলো এলবার একমাত্র শহর এবং রাজধানী পোর্টোফেরাইও পৌঁছুতে। বুড়োকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়লো মাসুদ রানা।

'হ্যাভ আ নাইস ডে,' ইংরেজিতে বললো লোকটা। এক্সিলারেটর দাবিয়ে ধরে ভোঁ করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

শহরের প্রধান সড়ক, ভায়া গ্যারিবল্ডি ধরে হাঁটতে লাগলো রানা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। চারদিকে কেবল টুরিস্ট আর টুরিস্ট, ধাক্কা না খেয়ে পথ চলা অসম্ভব। পরিচিত জায়গাগুলো ঘুরে দেখলো রানা। সব আগের মতোই আছে, কিছুই পাল্টায়নি। কেবল আগের সেই মুক্ত ভাবটা নেই নিজের ভেতরে, এই যা।

একটা গিফট শপ থেকে একটা বিনকিউলার কিনলো মাসুদ রানা। সূর্য অনেকটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে। খিদে পেয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ওয়াটারফ্রন্টের স্টেলা মেরিনার রেস্টুরেন্টে এসে লাঞ্চ সারলো রানা। ভেতরে নয়, রেস্টুরেন্টের সামনের খোলা জায়গায় একটা টেবিলে বসে খেলো ও। কারণ এখান থেকে হারবার

এবং খুদে পোর্ট এলাকার প্রায় পুরোটাই দেখা যায়। আগেই সন্দেহমুক্ত হয়ে নিয়েছে রানা, ওর চৌহদ্দিতে কোনও সন্দেহজনক পুলিস কার বা পুলিস অথবা টিকটিকি কিছুই নেই। থাকার কথাও নয় অবশ্য। কারণ, ও এখানকার নাম উচ্চারণ করেনি ভুলেও। এমনকি সুজানের কাছেও নয়।

ফোযযি বোধহয় এখনও ভাবছে ও মেইনল্যাণ্ডেই আছে। মারসে আশ্রয় নেয়ার ধারণাটা মন্দ হয়নি, মনে মনে বললো রানা, ওটাই এ মুহূর্তে সবচেয়ে নিরাপদ। জুন এলিসনের কথাই ঠিক, সবখানেই ওকে খুঁজবে সাইফার। খুঁজবে না কোনও প্রমোদতরীতে, বিশেষ করে জুন এলিসন যেটার মালিক।

হারব্যারের দিকে নজর দিলো রানা। কখন পৌঁছুবে মারস?

পড়ন্ত বিকেল। একই জায়গায় বসে আছে মাসুদ রানা। হাতে স্থানীয় এক গ্লাস সাদা ওয়াইন, প্রকানিকো। আনমনে মাঝে মধ্যে চুমুক দিচ্ছে রানা ওতে ছোট্ট করে। নেশায় কড়া। আধমরাকেও চাঙ্গা করে তুলতে পারে পানীয়টা কয়েক মুহূর্তে।

আপাতত প্যারিস যাবে রানা। ওকে ধাওয়া করার মতো নতুন আর কোনও সূত্র পাচ্ছে না জিয়ানলুকা ফোযযি, কাজেই ওদেশে গিয়ে একটু সুস্থির হয়ে ভাবনা-চিন্তা করে এ ফাঁদ থেকে বের হবার ব্যবস্থা করবে ও। অবশ্য তার আগেই যদি রাহাত খান...এরপর যখন ওয়াশিংটন যাবে রানা, জিমি স্টুয়ার্টের সাথে দেনা-পাওনাটা মিটিয়ে ফেলবে প্রথম সুযোগেই। ব্যাপারটা হবে পুরোপুরি ব্যক্তিগত। কারণ যতোই এ নিয়ে ভাবছে রানা, ততোই বদ্ধমূল হচ্ছে ধারণাটা যে এ কাজে ওই লোকটিই ইন্ধন যুগিয়েছে জেনারেল হিলিংটনকে। এবং সন্দেহ নেই, ওদের সঙ্গে তার শ্বশুর, ডোনাল্ড রীকও আছে।

ওই লোকটির আর্থিক সমর্থন না পেলে এ কাজে কিছুতেই হাত দিতেন না হিলিংটন। দেখা যাক, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

প্যারিসের গুপ্তজিয়া আনকুয়ানবু বা চাইনীজ মিনিস্ট্রি অভ স্টেট সিকিউরিটি প্রধান, ঝি লিং রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। ওর সাহায্য দরকার হবে রানার। কাজটা করবেও সে খুশিমনেই। এর আগে একবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে ওকে ঝি লিং। চীনাদের প্রচলিত ঐতিহ্য অনুযায়ী ওর পর থেকে মাসুদ রানার জীবনের দায়-দায়িত্ব সব তার ওপরই বর্তেছে। ওরা যাকে বলে উইন ইউ-এনার।

সন্ধের আগে উঠলো রানা। ওয়াটার ফ্রন্টে এসে দাঁড়ালো। নানা আকারের ঝকঝকে নতুন সব মোটর বোট আসছে, যাচ্ছে। একটু দূরে চমৎকার একটা ডলফিন মোটর বোট দেখে সেদিকে এগোলো ও। এক যুবককে দেখা গেল ওটার পা ডলে ডলে পরিষ্কার করছে। প্রচণ্ড শক্তিধর ভি-৮ ৩৫১ ইনবোর্ড এনজিনে চলে ডলফিন মোটর বোট। কিছুক্ষণ যুবকের হাতের কাজ দেখলো রানা।

'দারুণ আপনার বোট।'

খুশি হলো যুবক। 'থ্যাঙ্কস।'

'দু'চার ঘণ্টার জন্যে ভাড়া দেবেন কি না বোটটা, ভাবছি।'

কাজ থামিয়ে ওর দিকে তাকালো যুবক। 'নিতে পারেন। আগে কখনও চালিয়েছেন এ ধরনের বোট?'

'হ্যাঁ। আমার নিজেরই আছে ডলফিন।'

'কোত্থেকে এসেছেন আপনি?'

'অরেগন।'

'এক ঘণ্টা একশো ডলার ভাড়া।'

মৃদু হাসলো মাসুদ রানা। 'দ্যাট'স ফাইন।'

'জামানতও রাখতে হবে।'

'নিশ্চই।'

'এখনই লাগবে? বললেন তো...'

'না। ঘণ্টা দুয়েক পর। অথবা আরও দেরিও হতে পারে। আমি জানাবো আপনাকে।' এক থোক ডলার ধরিয়ে দিলো রানা যুবকের হাতে।

'ও কে।' খুশি হয়ে উঠলো সে থোকটার পুরুত্ব অনুভব করে। 'আমি তাহলে হাতের কাজটা শেষ করে ফেলি এই ফাঁকে।'

'ঠিক আছে।'

একটু আগে পরিকল্পনায় সামান্য রদবদল ঘটিয়েছে মাসুদ রানা। ঠিক করেছে, মারস এলবা উপকূলে পৌঁছার আগে ও নিজেই ইন্টারসেপট করবে তাকে মাঝসাগরে। নইলে পোর্টের ফর্মালিটি এড়ানো সম্ভব হবে না, জানাজানি হয়ে যাবে ওটার এলবা উপস্থিতি। হারবারে ঢুকতে হলে যে কোনও বোটকে 'অথরাইযেশন' নিতে হয় ক্যাপিটানো ডি পোর্টো'র অফিস থেকে। কিন্তু তা হতে দেয়া চলবে না।

নিজের জন্যে নয়, সুজানকে কোনও ঝামেলায় জড়াতে দিতে চায় না রানা।

মেরিন মিনিস্ট্রি। কর্নেল জিয়ানলুকা ফোযযি এবং কর্নেল হ্যারিসন কেলার কথা বলছে মেরিন অপারেটরের সাথে। নির্ঘুম রাত কাটছে দু'জনেরই, টকটকে লাল হয়ে আছে চোখ।

'আপনি শিওর,' বললো কেলার, '...মারসের সাথে আর যোগাযোগ করেনি মাসুদ রানা?'

'শিওর কর্নেল। আর করেনি।'

'ঠিক আছে, খেয়াল রাখো,' বললো ফোযযি। কেলারের দিকে ফিরলো সে। 'চিন্তা নেই। রানা মারসে পা রাখামাত্র জেনে যাবো আমরা।'

কিছু বললো না কেলার। মাথা ঝাঁকালো কেবল। অপারেটরকে বললো, 'সেই জায়গাটা ট্রেস করা গেল, প্যালিনড্রোম?'

'না, কর্নেল। ইটালির ম্যাপে প্যালিনড্রোম নামে কোনো জায়গা নেই। তবে মনে হয় ওটা কোথায় আছে, জানি আমি। মানে...'

'কোথায়?'

'প্যালিনড্রোম আসলে কোনো জায়গার নাম নয়, কর্নেল। ওটা একটা শব্দ।'

'মানে?'

'ইয়েস, স্যার। প্যালিনড্রোম হচ্ছে কোনো শব্দ বা বাক্য, যা সোজা দিক বা উল্টোদিক, যেদিক থেকেই পড়া যাক, মানের হেরফের হবে না। যেমন, 'MADAM I'M ADAM'। প্যালিনড্রোমের একটা কম্পিউটার লিস্ট তৈরি করে

রেখেছি আমি আপনাদের জন্যে।' ড্রয়ার থেকে একটা প্রিন্ট আউট বের করে কেলারকে দিলো লোকটা।

কাগজটা টেবিলে বিছিয়ে নজর বোলাতে লাগলো দুই কর্নেল।

'KOOK····DEED····BIB···BOB···BOOB···DAD···DUD···EVE···GAG···MOM···NON···NOON···OTTO···POP···SEES···TOT···TOOT···

বিরক্ত হয়ে চোখ তুললো ফোর্যিথ। 'এতে কি বোঝা গেল। প্যালিনড্রোম কি, সে না হয় শেখা গেল। কিন্তু মাসুদ রানার···।' থেমে গেল চিন্তিত কর্নেল।

'স্যার, বিখ্যাত একটা প্যালিনড্রোম আছে। ওটা নেপোলিয়ান স্বয়ং নাকি তৈরি করেছিলেন।'

'কি সেটা?' চোখ কুঁচকে তাকালো হ্যারিসন কেলার।

'ABLE WAS I ERE I SAW ELBA, স্যার।'

পরস্পরের দিকে তাকালো দুই কর্নেল। পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠলো ফোর্যিথ। 'জেসাস ক্রাইস্ট! এলবা!!'

সূর্য ডোবার কয়েক মিনিট আগে ইয়টটাকে দেখতে পেলো রানা। সবে দিগন্তরেখা পেরিয়ে এসেছে। কালো একটা গুবরে পোকার মতো দেখতে লাগছে ওটাকে। বেশ দ্রুত আসছে মারস, একটু একটু করে বড় হচ্ছে আকার। নাম পড়া না গেলেও নিশ্চিত হলো মাসুদ রানা, ওটাই। কোনও ভুল হয়নি। এ ধরনের বিলাসবহুল ইয়ট জুন এলিসনেরই হতে পারে।

তাড়াতাড়ি বোটের কাছে এসে দাঁড়ালো রানা। ধোয়ামোছার কাজ সেরে ফেলেছে যুবক। খুদে হুইল হাউসে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। রানাকে দেখে বেরিয়ে এলো সে। 'গুড ইভনিং। আপনি রেডি?'

'হ্যাঁ।' গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে উঠে এলো রানা।

'ফিরতে কতোক্ষণ লাগবে আপনার, সেনর?'

'দু'ঘন্টার বেশি নয়।'

আগেই বাকি টাকাটা আলাদা করে রেখেছিলো মাসুদ রানা। ওটা এগিয়ে দিলো যুবকের দিকে। খুশি মনে নেমে গেল সে। 'টেক গুড কেয়ার অভ ইট, সেনর,' চেঁচিয়ে বললো।

'কোনো চিন্তা নেই।'

ডনজির বাঁধন খুলে দিলো যুবক। এক মিনিট পর, নাক উঁচু করে সগর্জনে খোলা সাগরের দিকে ছুটে চললো বোট। বিশ মিনিট লাগলো রানার মারসের কাছে পৌঁছুতে। বোটটাকে এগোতে দেখে ফোরডেকে এসে দাঁড়িয়েছে জুন আর সুজান। দূরবীনে চোখ রেখে দেখছে ওকে। সুজানের মুখটা বেশ ফ্যাকাসে লাগছে দেখতে। নিশ্চয়ই ওর কথা ভেবে উদ্বিগ্ন ছিলো। মারসের এক ডেকহ্যান্ডকে লক্ষ্য করে লাইন ছুঁড়ে দিলো রানা। আরেকজন ওকে ইয়টে উঠতে সাহায্য করলো।

'বোটটা তুলে ফেলবো, স্যার?' প্রশ্ন করলো ডেকহ্যান্ড।

'নো। লেট ইট গো।' জামানতের যে অঙ্ক দিয়ে এসেছে ও যুবককে, তাতে

আরও দু'টো ডনজি মোটর বোট কিনতে পারবে সে।

ল্যাডার বেয়ে সেগুন কাঠের তৈরি ডেকে উঠে এলো মাসুদ রানা। ল্যাডারের মাথায় স্বামী-স্ত্রী সাদর অভ্যর্থনা জানালো ওকে।

'ওহ, রানা! তুমি সুস্থ আছো দেখে সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে,' বললো সুজান।

'ধন্যবাদ।' মেয়েটিকে বেশ ফ্যাকাসে মনে হলো ওর। যেন রক্তশূন্যতায় ভুগছে। কোথাও কোনও গণ্ডগোল হয়নি তো? ভাবলো রানা।

'আ'য়্যাম গ্ল্যাড ইউ মেড ইট।' ওর ডান হাত ঝাঁকিয়ে দিলো জুন এলিসন।

'এতে বিপদ আছে জেনেও সহায্য করেছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ,' আন্তরিক কণ্ঠে বললো রানা।

'ধন্যবাদ।'

সন্ধে হয়ে গেছে। আলো জ্বলে উঠেছে জুন এলিসনের ভাসমান প্রাসাদে। ডেক চেয়ারে বসে আছে ওরা। কফি পান করছে। আগে সুজানের মুখে মারসের গল্প শুনেছে রানা, কিন্তু বাস্তবে আরও অনেক সুন্দর ইয়টটা। দুশো আশি ফুট লম্বা। বিলাসবহুল ওউনার'স কেবিনসহ আরও আটটা ডবল স্যুইট আছে মেহমানদের জন্যে। ষোলোটা ক্রু'জ কেবিন। এছাড়াও আছে ড্রইংরুম, ডাইনিং রুম, একটা বড় অফিস স্যুইট, একটা সেলুন এবং সুইমিং পুল।

বারশো পঞ্চাশ হর্সপাওয়ার ষোলো সিলিন্ডার টারবো চার্জড ক্যাটারপিলার ডি ৩৯৯ ডিজেল এনজিনে চলে। এর অভ্যন্তরীণ ডিজাইনার ইটালির লুইগি স্টারসিও।

'তারপর?' বললো জুন, 'নতুন কোনো প্ল্যান করেছেন, মিস্টার রানা?'

'মার্সেই যাবো ভাবছি।'

'মার্সেই?'

'ওর কাছাকাছি কোথাও হলেও চলবে।' লক্ষ্য করলো রানা, আসতে না আসতেই চলে যেতে চাইছে শুনেও কিছু বললো না সুজান।

'ও, কে।' মারসের ক্যাপ্টেনকে ডেকে পাঠালো জুন।

আমেরিকান মেরিনদের মতো নিখুঁত ছাঁটের ইউনিফরম পরা ক্যাপ্টেনকে বিশাল এক গরিলার মতো লাগলো রানার। সারা শরীরে লোম লোকটার। কানের মাঝামাঝি জায়গায়ও আছে এক গোছা কাঁচা পাকা লোম। গালে কুচকুচে কালো চাপ দাড়ি।

'ইনি, ক্যাপ্টেন ক্যারিংটন। আর···' রানার দিকে তাকালো জুন সাহায্যের আশায়।

'রবার্ট স্মিথ।'

পরিচয়ের পর্ব শেষ হতে ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে বললো জুন, 'মার্সেইয়ের দিকে যেতে হবে আমাদের, মিস্টার ক্যারিংটন। কোর্স অলটার করুন, প্লীজ।'

'এলবা যাচ্ছি না আমরা?' ঘুরে দ্বীপটার দিকে তাকালো গরিলা। অনেক কাছে এসে পড়েছে ওটার প্রাইভেট হারবার।

'না।'

'ভেরি ওয়েল।' কিছুটা অবাক হয়েছে ক্যাপ্টেন, পরিষ্কার বোঝা গেল।

লোকটা অদৃশ্য হয়ে যেতে মুখ খুললো সুজান। 'রানা, এসব কেন ঘটছে,

শুনতে পারি না আমরা?'

'পারো। কিন্তু না শোনাই মঙ্গল, সুজান। এ ব্যাপারে যতো কম জানবে, ততোই লাভ। তবে এটুকু বিশ্বাস করতে পারো, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, কোনো অন্যায় আমি করিনি। একটা পলিটিক্যাল প্যাচে পড়ে তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। কোনভাবে খুব বেশি জেনে ফেলেছি, তাই। ওরা যদি আমাকে খুঁজে পায়, গুলি করতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করবে না।'

থামলো মাসুদ রানা। একটা সিগারেট ধরিয়ে আনমনে টানতে লাগলো। সুজান আর এলিসন চেয়ে আছে পরস্পরের দিকে। মেয়েটির দৃষ্টিতে কী এক নীরব প্রার্থনা, অন্যদিকে তাকিয়ে আছে বলে দেখতে পেলো না রানা।

'আমি চাই না,' আবার বললো ও। 'আমার এই মারসে ওঠার কথাটা জানাজানি হোক। সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তোমরাও বিপদে পড়বে। এই জন্যেই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নেমে যেতে চাই।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো জুন এলিসন। 'কোনো চিন্তা নেই। কেউ জানবে না আপনার কথা।'

মারসে ঘুরে গেছে আগেই। এলবা পিছনে ফেলে আরও পশ্চিমে ছুটছে। ডিনারের টেবিলেই ব্যাপারটা চোখে পড়লো মাসুদ রানার। ওরা স্বামী-স্ত্রী কেমন যেন এড়িয়ে চলেছে নিজেদের। কথাই বলছে না পারতপক্ষে। ব্যাপার কি? ভাবলো রানা, কি এমন ঘটলো হঠাৎ? ওর জন্যেই ঘটছে না তো এসব? নাকি আর কিছু?

জুন যা-ও বা কিছু খেলো, সুজান খেলো না কিছুই। রানার গলা দিয়েও নামলো না খাবার—নষ্ট হয়ে গেছে রুচি। ডিনার শেষে আরেক প্রস্থ কফি পরিবেশন করা হলো। এই সময় জুনের সাথে কথা বলতে এলো ক্যাপ্টেন। রানার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচু গলায় কিছু বললো সে তাকে। মাথা দোলালো জুন।

ওদের আলাপ শেষ হতে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কাল কখন মার্সেই পৌঁছুবো আমরা, ক্যাপ্টেন?'

'আবহাওয়া যদি গোলমাল না করে তাহলে দুপুরের পর পরই, মিস্টার স্মিথ।' হাসলো গরিলা।

এই লোকটার ভেতরে কি যেন একটা আছে, মনে হলো রানার। অস্বাভাবিক একটা কিছু।

রাত এগারোটায় হাতঘড়ির দিকে তাকালো জুন। সুজানের উদ্দেশে বললো, 'এবার ওঠা যাক, কি বলো, ডার্লিং?'

'হ্যাঁ।' চকিতে একবার স্বামীর মুখের ওপর চোখ বোলালো মেয়েটি। 'রানা, চলো। তোমার কেবিনটা দেখিয়ে দিয়ে আসি।'

'তার কোনো দরকার নেই।' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো জুন এলিসন। 'তুমি কেবিনে যাও। আমি পৌঁছে দিচ্ছি মিস্টার রানাকে।'

লজ্জা পেয়ে গেল রানা। অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো লোকটার মনোভাব টের পেয়ে।

'ঠিক আছে।' হাল ছেড়ে দিলো সুজান। রানার দিকে ফিরলো, 'গুড নাইট, রানা।'

'গুড নাইট, সুজান।'

হঠাৎ কি হলো ওদের? শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো মাসুদ রানা, এরকম আচরণ শুরু করলো কেন ওরা? সারারাত এপাশ ওপাশ করলো রানা। শান্তি পাচ্ছে না কিছুতেই, ঘুম আসছে না।

এক সময় ঘুম এলো, তখন ফর্সা হয়ে উঠতে শুরু করেছে পুবদিক।

রোমের সাইফার হেডকোয়ার্টারে মুখোমুখি বসা দুই কর্নেল। খানিকটা অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে হ্যারিসন কেলারকে।

'আপনি খুব দুশ্চিন্তায় ভুগছেন মনে হচ্ছে,' হাসি মুখে বললো জিয়ানলুকা কোয়ফি।

'লোকটাকে এলবাতেই ধরা উচিত ছিলো।'

'স্বীকার করি। কিন্তু কি আর করা। এ নিয়ে চিন্তার আর কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। আক্ষরিক অর্থেই ও এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। পালিয়ে কোথায় যাবে, সে তো জানাই আছে আমাদের।'

'তবুও,' মুখ ভার করে বললো কেলার। 'নড়তে চড়তে এতো সময় লাগানো ঠিক হচ্ছে না। মাসুদ রানার থেকে চিন্তায়-কাজে অনেক পিছিয়ে আছি আমরা।'

এক ঘন্টার মতো নিরবচ্ছিন্ন ঘুম হলো, তারপরই দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করলো মাসুদ রানা। দেখলো, ওকে টেনেহিঁচড়ে ইয়ট থেকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কর্নেল কোয়ফি। বাধা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সুজান। কাঁদছে মেয়েটি শব্দ করে। পাশেই দাঁড়িয়ে জুন এলিসন। মিটিমিটি হাসছে সে রানার দুর্দশা দেখে।

এরপর হঠাৎ করেই পাল্টে গেল দৃশ্যপট। ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে রানার, তার তোড়জোড় চলছে তার। হাত পিছমোড়া করে বেঁধে গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা এক দেয়ালের সামনে দাঁড় করানো হলো ওকে। রাইফেল তুললো স্কোয়াড, নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। চোখের আড়ালে কোথাও আছে সুজান, দেখতে পাচ্ছে না মাসুদ রানা। কিন্তু তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে পরিষ্কার।

তড়াক করে এক লাফে উঠে বসলো রানা। ঘেমে নেয়ে উঠেছে পুরো শরীর। বুকটা ধড়ফড় করছে। কয়েক মুহূর্ত বসে থাকলো রানা। নিজেকে সামলে নিয়ে সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। আধঘন্টা পর খোলা ডেকে বেরিয়ে এলো ও। কড়া রোদে জ্বালা করছে দু'চোখ। দূরবীনে চোখ রেখে চারদিকে সতর্ক নজর বোলালো রানা প্রচুর সময় নিয়ে। কোথাও কিছু নেই। সাগরও শান্ত।

'গুড মর্নিং।' ক্যাপ্টেন কারিংটন এগিয়ে এলো ওর দিকে। 'আবহাওয়া শেষ পর্যন্ত শান্তই থাকবে মনে হচ্ছে, মিস্টার স্মিথ।'

আনমনে মাথা দোলালো মাসুদ রানা।

'তিনটে নাগাদ মার্সেই পৌঁছে যাবো আমরা আশা করি। ওখানে কতোক্ষণ থাকতে হবে আমাদের?'

'এখনই বলতে পারছি না, ক্যাপ্টেন। গেলে বোঝা যাবে।'

'ইয়েস, স্যার।' ব্রিজে ফিরে গেল গরিলা।

aminsumon@yahoo.com
www.murchona.com

পায়ে পায়ে স্টার্নে চলে এলো রানা। মনটা ভার হয়ে আছে। নতুন করে দিগন্তরেখা পর্যবেক্ষণে মন দিলো ও। কোথাও কিছু নেই—কিচ্ছু নেই। কিন্তু মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা যাচ্ছে না। পরিষ্কার টের পাচ্ছে রানা, একটা কিছু ঘনিয়ে আসছে। সময় বেশি পাওয়া যাবে না।

পূর্ণ গতিতে মার্সেইর দিকে ধেয়ে চলেছে ইটালিয়ান নৌ-বাহিনীর ক্রুজার, টাইবেরিয়াস। ফ্লোরেন্স উপকূলে ছিলো সে নিয়মিত টহলে, ভোররাতের দিকে নতুন নির্দেশ পেয়ে রওনা হয়েছে এই অভিযানে।

ফোরডেকে শক্তিশালী দূরবীন চোখে লাগিয়ে সামনের দিকে চেয়ে আছে টাইবেরিয়াসের ক্যাপ্টেন, লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডার আলবারগো বাসিলি। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমেরিকান ইয়টটিকে পাকড়াও করতে পারবে সে।

নাশতার টেবিলে সুজানকে গতরাতের চেয়েও বেশি ফ্যাকাসে, মনমরা মনে হলো রানার। কোনদিকে তাকাচ্ছে না সে। বসে আছে মাথা নিচু করে।

'রাতে ভালো ঘুম হয়নি, তাই না?' জিজ্ঞেস করলো জুন এলিসন।

'না। ঘুমিয়েছি তো!'

ব্যাপার কি? ভাবলো রানা, একসাথে শোয় না নাকি ওরা? মন কষাকষি চলছে? কারণটার মূল যে ও নিজে, সে ব্যাপারে মনে সন্দেহ নেই রানার একটুও। বিরক্ত হলো ও নিজের ওপর, কেন এলাম? কি দরকার ছিলো এদের হানিমুনের আনন্দ মাটি করার?

বারোটার কাঁটা পেরিয়ে গেছে। মার্সেই আর ঘণ্টা দুয়েকের পথ। এর মধ্যে কিছুটা সহজ হতে পেরেছে সুজান। একটা দুটো কথা বলছে রানার সাথে। বেশিরভাগই অর্থহীন। রানার ধারণা, একটা কিছু বলতে চাইছে ওকে মেয়েটি, কিন্তু স্বামীর উপস্থিতির জন্যে বলতে পারছে না। কোনও সুযোগ দিচ্ছে না লোকটা।

সাড়ে বারোটার দিকে দূরে একটা মাছ ধরার বোট দেখে সিধে হয়ে বসলো সুজান। লক্ষ্য করেছে রানা, হঠাৎ করেই চেহারাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। জুনের দিকে ফিরলো সে। 'লাঞ্চের জন্যে কিছু তাজা মাছ হলে কেমন হয়, ডার্লিং?'

বোটটা দেখে হাসলো জুন। 'চমৎকার হয়। কি বলেন, মিস্টার রানা?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'ঠিক।'

সাইফার কমিউনিকেশনস রুম। ভেতরে অস্থির পায়ে পায়চারি করছে কর্নেল হ্যারিসন কেলার। সন্দেহ নেই আর আধঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়তে যাচ্ছে মাসুদ রানা নামের দুঃসাহসী স্পাইটি। দুঃখ, সে সময় জায়গামতো থাকতে পারছে না সে। আনন্দ, জিয়নলুকা ফোয়যির মতো নির্বোধ চরলও থাকতে পারছে না। সে ক্ষেত্রে অন্য লাইনে ভাবতে হতো হ্যারিসন কেলারকে।

কাজ শুরু করার আগে যে লোক সামান্য মাথা ঘামাতে রাজি নয়, ভেতরের ব্যাপার তলিয়ে দেখতে চায় না, সে কি করে সাইফারের ডেপুটি ডিরেক্টর হতে পেরেছে, কোন যোগ্যতাবলে, ভেবে পায় না কেলার। আরেকটু হলে রানার সাথে সেদিন তাকেও প্রায় শেষ করে ফেলেছিলো ব্যাটা। সেই রাগ এখনও পড়েনি তার। ফোয়যির কথায় সচকিত হলো সে।

'মারসের বর্তমান পজিশন কি?' কমিউনিকেশন অফিসারকে প্রশ্ন করলো কর্নেল।

'মার্সেই পোর্টের দু'ঘণ্টা দূরত্বে আছে, স্যার।'

'ওকে ধরতে কতোক্ষণ লাগবে টাইবেরিয়াসের?'

'আর আধঘণ্টা, স্যার। টাইবেরিয়াসের ক্যাপ্টেনের সাথে একটু আগেই কথা বলেছি আমি।'

'কি বলে সে?'

'ইয়টটা দেখতে পেয়েছেন লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডার।'

'আর চিন্তা নেই,' কেলারকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললো ফোয়যি। 'সাগরে পালাবে কোথায়, মাসুদ রানা?'

মারসের পাশে পৌঁছে ক্রুজারের গতি কমানোর নির্দেশ দিলো ক্যাপ্টেন আলবারগো বাসিলি। আড়াআড়িভাবে এগোবার নির্দেশ দেয়া হলো এনজিন রুমকে। ইয়টের ফ্যানটেইলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে জুন এবং সুজান, লক্ষ্য করছে ক্রুজারটিকে।

'আহোয়, মারস,' টাইবেরিয়াসের লাউডস্পিকার থেকে মোটা একটা গলা ভেসে এলো। 'এনজিন বন্ধ করুন। আমরা ইয়টে উঠবো।'

ধুপ ধাপ আওয়াজ তুলে ছুটে এলো পজিলা। 'মিস্টার এলিসন...'

'আমি শুনেছি, ক্যাপ্টেন,' শান্ত গলায় বললো সে। 'যা বলে করুন। কাট দ্য এনজিনস।'

'ইয়েস, স্যার।'

এক মিনিট পর, থেমে গেল মারসের ক্যাটারপিলার ডিজেল এনজিনের ধুকপুক আওয়াজ। গতি কমতে কমতে দাঁড়িয়ে পড়লো ইয়ট। সশস্ত্র মেরিনরা দুটো ডিঙি নামালো ক্রুজার থেকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সুজান আর এলিসন। টাইবেরিয়াসের অফিসার-ইন-চার্জসহ ডজন দুই মেরিন রওনা হয়ে গেছে ওদের উদ্দেশে। দশ মিনিটের মধ্যে ইয়টে উঠে এলো তারা।

দৃঢ় পায়ে জুন এলিসনের সামনে এসে দাঁড়ালো লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডার, আলবারগো বাসিলি। 'আপনার অসুবিধের জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত, সেনর। কিন্তু ইটালিয়ান সরকারের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে আপনার ইয়টে ইন্টারপোলের হুলিয়া আছে, এমন এক মাদক চোরাচালানীকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে। আমার ওপর আপনার ইয়ট সার্চ করার নির্দেশ আছে, সেনর।'

'শিওর, ক্যাপ্টেন।' কাঁধ ঝাঁকালো জুন এলিসন। 'দেখুন খুঁজে।'

'গ্রাৎসি।' ঘুরে সৈনিকদের নির্দেশ দিলো লোকটা মাথা দুলিয়ে।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মেরিনদের তৎপরতা দেখছে ওরা দু'জনে। ডেকময় ছড়িয়ে পড়লো সবাই, তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করলো মাসুদ রানাকে। ঝাড়া আধঘণ্টা পর একজন একজন করে ফিরে আসতে শুরু করলো তারা ডেকে। অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়ালো লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডারের মুখোমুখি।

ammsun@yahoo.com
www.murchona.com

'নেই সে, কম্যাণ্ডার,' রিপোর্ট করলো এক মেরিন।
কপাল কুঁচকে উঠলো ক্যাপ্টেনের। 'নেই?'
'না, ক্যাপ্টেন। নেই।'
লিগুরিয়ান সাগরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের মহাসাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলো টাইবেরিয়াসের অফিসার-ইন-চার্জ। একে একে সবার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এলো তার দৃষ্টি। 'তোমরা ঠিক জানো, নেই মাসুদ রানা?'
'নিশ্চয়ই, স্যার। লিস্টেড ক্রু-মেম্বার ছাড়া বাড়তি কেউ নেই ইয়টে। ক্রুদের প্রত্যেককে আইডেন্টিফাই করে নিশ্চিত হয়েছি আমরা।'
কয়েক মুহূর্ত হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো লোকটা। হতাশায় কালো হয়ে গেছে চেহারা। সুপিরিয়রদের কোথাও মারাত্মক ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই। জুনের দিকে ফিরলো সে। আমতা আমতা করে বললো, 'আমি...আমি দুঃখিত, সেনর। ক্ষমা প্রার্থী, সত্যি...বড় অন্যায় হয়ে গেল...আমি দুঃখিত, সেনর।' ঘুরে দাঁড়ালো আলবারগো বাসিলি।
পিছন থেকে ডাকলো জুন এলিসন। 'কম্যাণ্ডার...?'
'সি?'
স্বামীর হাতে মৃদু চাপ দিলো সুজান। ফিসফিসিয়ে অনুনয় করলো, 'প্লী-জ, ডার্লিং! বোলো না।'
ব্যাপারটা লক্ষ করে খানিকটা বিস্মিত হলো অফিসার-ইন-চার্জ। 'সেনর?'
হাতটা মুচড়ে ছাড়িয়ে নিলো জুন সুজানের মুঠো থেকে। 'আপনারা যাকে খুঁজছেন, একঘণ্টা আগেও সে ছিলো ইয়টে। আপনাদের ইনফরমেশনে কোনো ভুল নেই।'
হাঁ হয়ে গেল কম্যাণ্ডার। খোল মাছের বাতাস টানার মতো করে দু'বার মুখটা খুললো আর বন্ধ করলো সে। কিছু বলতে চাইছে হয়তো, কিন্তু আওয়াজ বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে।
'সবার চোখে ধুলো দিয়ে একটা মাছ ধরার মোটর বোটে উঠে পালিয়ে গেছে লোকটা,' আবার বললো জুন। 'মার্সেইয়ের দিকে গেছে। তাড়াতাড়ি করলে হয়তো ধরতে পারবেন, সময় আছে এখনও।'
দুদ্দাড় করে ক্রুজারে ফিরে গেল সবাই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাত্রা শুরু করলো টাইবেরিয়াস—সর্বোচ্চ গতিতে তেড়ে চললো মার্সেই বন্দরের দিকে।

কপালটা আজ ভালোই, পিছনে ফেলে আসা ইয়টটার দিকে তাকিয়ে ভাবলো জেলে জেনিনি। সারারাত ধরে যতো মাছ ধরেছে সে, তার অর্ধেকটাই কিনে নিয়েছে ওরা, অস্বাভাবিক চড়া দামে। আসলে পয়সাওয়ালা আমেরিকানদের কায়-কারবারই অমনি। দামটা শুধু বললেই হলো, দামাদামির কথা চিন্তাও করে না ওরা।
খুশি খুশি লাগছে জেনিনির। ঠিক করেছে, আজ রাতে আর মাছ ধরতে আসবে না সে। বিশ্রাম নেবে। হঠাৎ বোটটা একটু নড়ে উঠলো। ব্যাপার কি! শিরদাঁড়া খাড়া করে বসলো সে। এটা যে ঢেউয়ের দোলা নয়, হলপ করে বলতে পারে জেনিনি। চমকে উঠলো সে। ওপাশের গানওয়েল আঁকড়ে ধরলো একটা হাত,

পরক্ষণেই একটা মুখ দেখা দিলো সেখানে।
ভয়ে আপাদমস্তক কেঁপে উঠলো জেনিনির। 'কে?'
মিষ্টি করে হাসলো মাসুদ রানা। 'এমিকো।'

বসে আছে লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডার। উত্তেজনায় ছটফট করছে। সুপিরিয়র অফিসার তাকে জানিয়েছেন, মেজর মাসুদ রানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এবং বিপজ্জনক। পৃথিবীর অর্ধেক দেশ খুঁজছে লোকটাকে। যেভাবে হোক, ধরতেই হবে তাকে।
তখন কয়েক মিনিটের জন্যে হতাশ হয়ে পড়লেও এ মুহূর্তে খুবই আশাবাদী সে। মেজর মাসুদ রানাকে গ্রেফতার করবেই সে। এতো দেশ যখন খুঁজছে, তখন তাকে ধরতে পারলে নিশ্চয়ই পুরস্কার, প্রমোশন... ভাবনা-চিন্তার রাশ টেনে রাখার চেষ্টা করলো না ক্যাপ্টেন।
একটু পর ব্রিজ থেকে নেভিগেশন অফিসারের ডাক পড়লো। 'কম্যাণ্ডার, একটু ওপরে আসবেন, প্লীজ?'
বোটটার দেখা পাওয়া গেছে হয়তো। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো সে। পড়িমরি করে ছুটলো ব্রিজের দিকে।
ফোরডেকে দাঁড়িয়ে আছে নেভিগেশন অফিসার। দূরবীন চোখে লাগিয়ে চেয়ে আছে সামনের দিকে। কম্যাণ্ডারের পায়ের শব্দে যন্ত্রটা নামালো সে। এগিয়ে দিলো তার দিকে।
'সামনে-দেখুন, কম্যাণ্ডার।'
দেখলো লেফটেন্যান্ট কম্যাণ্ডার। এবং দেখতেই থাকলো। সামনের পুরো দিগন্ত জুড়ে পিঁপড়ের মতো পিজপিজ করছে অসংখ্য মাছ ধরার বোট। সবগুলোর একই রঙ, একই চেহারা। খুব সম্ভব মার্সেই ফিশিং ফ্লীটের প্রত্যেকটি বোট রয়েছে ওই ঝাঁকে—ফিরে যাচ্ছে বন্দরে।
ওর কোনটায় আছে মেজর মাসুদ রানা, কি করে জানবে সে? মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলো আলবারগো বাসিলি। চাউনি অভিব্যক্তিহীন। দূরবীন নামানোর কথা ভুলে গেছে। দেখছে তো দেখছেই।

নয়

মার্সেই বন্দর এলাকা থেকে গাড়ি চুরি করলো রানা সন্ধের পর। আবছা আলোকিত একটা সাইড রোডে দাঁড়িয়ে ছিলো গাড়িটা—ফিয়াট ১৮০০ স্পাইডার কনভার্টিবল, ক্যানভাসের টপ। সবগুলো জানালার কাঁচ তোলা, দরজা তালা মারা। কিন্তু তাতে টললো না মাসুদ রানা।
আরও একবার লাজারিনির রেজর ব্লেডটার শরণাপন্ন হলো ও। ক্যানভাসের ছাত ফুটো করে বাঁ হাতটা সেঁধিয়ে দিলো ভেতরে, খুলে ফেললো দরজার লক। তারপর

এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। নির্ধারিত জায়গাটা অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলো ও, চাবিটা নেই ইগনিশনে।

নো সমস্যা। ড্যাশবোর্ডের নিচের ইগনিশন সুইচের তারগুলো বাঁ হাতে মুঠো করে ধরে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে এলো মাসুদ রানা। তিনটে তার রয়েছে ওখানে। একটা বেশ মোটা, লাল রঙের। অন্য দুটো কালো। টানের চোটে তিনটেরই খানিকটা করে তামার তার বেরিয়ে পড়েছে ভেতর থেকে। এবার লাল তারটার সাথে অন্য দুটোর সংযোগ ঘটালো রানা এক এক করে। শেষ তারের সাথে ওটা স্পর্শ করানোর সাথে সাথেই জ্বলে উঠলো ড্যাশবোর্ডের নীলচে আলো।

তার দুটোর প্রান্ত এক করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জুড়ে দিলো মাসুদ রানা। এরপর বাকি তারটা ও দুটোর সাথে ছোঁয়ালো। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই কুঁই কুঁই শুরু করলো এনজিন। একটু সময় দিলো রানা, তারপর চোক ধরে টান দিলো। গর্জন করে উঠলো ফিয়াট ১৮০০। কোথাও কিছু নেই, আচমকা তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে ঘুরে গেল গাড়িটা। তুমুল গতিতে ছুটলো প্যারিসের দিকে।

সারাপথ গড়পড়তা একশো মাইল গতিতে চালালো ও গাড়ি। মাঝে দু'বার এর ব্যতিক্রম ঘটলো। মার্সেইয়ের দু'শো মাইল উত্তরের এক ছোট্ট শহরে ফিয়াটটা ত্যাগ করে একটা আলফা রোমিও চুরি করে রানা। আরও প্রায় একশো মাইল উত্তর-পশ্চিমে এসে রোমিও ছেড়ে যোগাড় করে একটা মার্সিডিজ। এতে মোটামুটি আধঘণ্টার মতো নষ্ট হয়। অবশ্য সেটা পুষিয়ে নিয়েছে ও চুরির পর কিছু সময় আরও দ্রুত চালিয়ে।

পরদিন সকাল আটটার দিকে প্যারিস পৌঁছুলো রানা ট্যাক্সি চড়ে। মার্সিডিজটা ছেড়ে এসেছে শহরের দশ মাইল আগে। রু সেন্ট অনরে ট্যাক্সি ছেড়েই একটা ফোন বুথে ঢুকলো রানা। ব্যস্ত হাতে এখানকার রানা এজেন্সির নাম্বার ঘোরাতে লাগলো। কোনও আওয়াজ নেই ওপ্রান্তে—সব লাইন কেটে দেয়া হয়েছে।

জানা কথা। তবুও নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল, হওয়া গেল। এবার ঝি লিঙের অ্যাপার্টমেন্টে টেলিফোন করলো মাসুদ রানা। কিন্তু পাওয়া গেল না তাকেও। তার বদলে উত্তর দিলো আনসারিং মেশিন। রেকর্ড করা কথাগুলো গভীর মনোযোগের সাথে শুনলো ও। ফরাসী ভাষায় বলছে মেশিন: বাও, মেস এমিস···জে রিগ্রেটি···গুড মর্নিং। আই রিগ্রেট আ'য়্যাম নট হোম। বাট দেয়ার ইজ নো ডেঞ্জার অভ মাই নট রিটার্নিং ইওর কল। বি কেয়ারফুল টু ওয়েট ফর দ্য টোন।

আছে, রানার জন্যে তিনটে সতর্কবাণী আছে মেসেজে। এগুলো ওদের দু'জনের প্রাইভেট কোড। রিগ্রেট, ডেঞ্জার এবং কেয়ারফুল। কথাগুলো রেকর্ড করে রেখে যাওয়ার অর্থ রানাকে আশা করছে ঝি লিং। এ ক্ষেত্রে তার বার্তার উত্তরটা কিভাবে দিতে হবে, তাও ঠিক করাই আছে।

বেরিয়ে এলো রানা বুথ থেকে। সাড়ে আটটা বাজে। একটা রেস্তোরাঁয় নাশতা সেরে আবার পথে নামলো। চওড়া রু সেন্ট অনরের জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এগোতে লাগলো নির্দিষ্ট একটা স্কোয়ারের দিকে। জায়গামতো পৌঁছে থামলো। সামনেই বহুল প্রচারিত ফরাসী দৈনিক 'লা মাটিন'-এর অফিস।

পাশ দিয়ে এক কিশোরকে যেতে দেখে ডাকলো রানা। 'পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক রোজগার

করার ইচ্ছে আছে?' জিজ্ঞেস করলো হাসিমুখে।

সন্দেহের চোখে আগন্তুকের দিকে তাকালো ছেলেটি। 'কি করতে হবে?'

'দাঁড়াও।' একটা কাগজে কয়েকটা শব্দ লিখে কাগজটা আর পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের একটা নোট তুলে দিলো রানা তার হাতে। ইশারায় পত্রিকার অফিসটা দেখিয়ে বললো, 'কাগজটা ওদের ওয়ান্টেড অ্যাড ডেস্কে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে তোমাকে। আর কিছু নয়।'

'বন।' ফিক করে হেসে উঠলো কিশোর। 'ডি অ্যাকরড,' বলেই একছুটে ঢুকে পড়লো গিয়ে পত্রিকা অফিসে।

ব্যাস, আজ আর কিছু করার নেই, ভাবলো মাসুদ রানা। কাল সকালের এডিশনে বের হবে বিজ্ঞাপনটা। ঝি লিঙের জন্যে সংক্ষিপ্ত একটা বার্তা ওটা: 'রয়, বাবা খুব অসুস্থ, তোমাকে প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি এসো। মা।'

পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোনও কাজ নেই আজ। কাল দুপুরে পাওয়া যাবে ঝি লিঙের উত্তর। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। সময় কাটানোর উপায় নিয়ে ভাবতে ভাবতে চট করেই মাথায় এলো আইডিয়াটা। একটা প্রাইভেট ট্যুর কোম্পানির ট্যুরিস্ট বোঝাই বাসে উঠে পড়লো রানা। পিছনদিকের একটা আসনে বসলো খবরের কাগজে মুখ ঢেকে।

সারাদিন ধরে লুক্সেমবার্গ গার্ডেন, লুভর মিউজিয়াম, লা ইনভে-লিডেস-এ নেপোলিয়নের স্মৃতিস্তম্ভসহ আরও ডজনখানেক ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করে বেড়ালো ট্যুরিস্টদের সাথে। এবং সবসময়ই, ভিড়ের মাঝখানে আড়াল করে রাখলো ও নিজেকে।

সন্ধের পর আরেক ট্যুরিস্ট গ্রুপের সাথে ভিড়ে গেল রানা। তাদের সাথে টিকেট কেটে মিডনাইট শো দেখতে বসে গেল মওলিন রুজ-এ। দু'টোয় শুরু হলো শো। শেষ হলো সাড়ে তিনটের দিকে। হল থেকে বেরিয়ে বিশাল এলাকাজোড়া মনতমারট্রি-র ছোট ছোট বারগুলোয় চক্কর দিয়ে বেড়াতে লাগলো মাসুদ রানা। পাঁচ মিনিটের বেশি বসলো না কোনটিতেই।

ভোর পাঁচটার আগে বের হয় না এদের সংবাদপত্র। তাই পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত বার পরিদর্শন চালিয়ে গেল মাসুদ রানা, তারপর এসে দাঁড়ালো এক নিউজপেপার স্ট্যান্ডে। হঠাৎ করেই সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল। ক্লান্ত, অবসন্ন, অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটি—চোখ দুটো লেগে এলেই যে দেখা দিয়েছে এতোদিন। কি যেন একটা চাইছে মেয়েটি ওর কাছে, মনে হয়েছে রানার। মনে হয়েছে, জিনিসটার অভাবে খুব কষ্টে আছে সে। গত দু'তিনদিন ধরে দেখা দিচ্ছে না মেয়েটি, মনেই ছিলো না রানার ব্যাপারটা।

একটা ট্রাকের আওয়াজে সচকিত হলো ও। সামনের পেভমেন্ট ঘেঁষে দাঁড়ালো ট্রাকটা। পিছনের ক্যারিয়ারে বসা এক কিশোর বড় এক বান্ডিল পত্রিকা ছুঁড়ে মারলো পেভমেন্টে, পরক্ষণেই ছুট লাগালো আবার ট্রাক। তাড়াতাড়ি একটা লা মাটিন বের করলো রানা ওর মধ্যে থেকে, পৃষ্ঠা উল্টে ওয়ান্ট অ্যাড খুঁজতে লাগলো। ছাব্বিশ নম্বর পাতায় পাওয়া গেল বিজ্ঞাপনটা। খানিকটা আশ্বস্ত হলো রানা, যদিও ফল

পেছে অপেক্ষা করতে হবে প্রায় দুপুর পর্যন্ত।

ঠিক বারোটায় পার দু নদ পৌঁছুলো ও। ট্যাক্সি ছেড়ে একটা সরু গলিতে ঢুকে এগোতে লাগলো দ্রুত। পঞ্চাশ গজমতো এগোতে হাতের ডানে বড় একটা পারফিউমারি কোসমেটিকস বিক্রেতার শো-রুম। ওটার দেয়ালে চার ফুট বাই চার ফুট একটা বোর্ড-ছোট ছোট অসংখ্য বিজ্ঞাপন গাঁথা আছে বোর্ডটায়। প্যারিসে প্রায় সবখানেই দেখা যাবে এ জিনিস। সামান্য কয়েক ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে যে কেউ বিজ্ঞাপন ঝোলাতে পারবে ওতে। তবে মাত্র দু'ঘণ্টার জন্যে। সময় শেষ হয়ে গেলে পুরানোগুলো সরিয়ে নতুন বিজ্ঞাপন আঁটা হয়।

খুঁজতে খুঁজতে বোর্ডের মাঝখানে পেলো রানা ঝি লিঙের জবাব: 'রয় বাবাকে দেখতে উদগ্রীব: ৫০ ৪১ ২৬ ৪৫ নম্বরে যোগাযোগ করো।' অর্থাৎ ৫৪ ১৪ ৬২ ৫০ নম্বর, ভাবলো মাসুদ রানা। শেষের জোড়া উল্টো করে প্রথমে, দ্বিতীয় জোড়া উল্টো করে দু'নম্বরে, তারপর তৃতীয় জোড়া, উল্টো করে, এবং সবশেষে প্রথম সংখ্যা দুটো।

একবার রিঙ হতেই সাড়া দিলো ঝি লিং। 'তুমি?'

'হাঁ।'

'মাই গড, ম্যান, কি ঘটছে এসব?'

'তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। আমার এজেন্সির ছেলেরা...'

'হাউস-অ্যারেস্ট। কাল বৈঠকখানায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো বড় ছেলেকে। চার ঘণ্টা ধরে তোমার কুশলাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।'

দাঁতে দাঁত চাপলো মাসুদ রানা। 'তারপর?'

'জায়গামতো পৌঁছে দেয়া হয়েছে। দোস্ত, পাগলের মতো ঘুরছে সবাই এগারো নম্বরটির খোঁজে। ওরা জেনে গেছে সে কোথায়। বুঝতে পারছো পরিস্থিতির গুরুত্ব?'

'পারছি।'

'আমিও ওদের সন্দেহের বাইরে নই। আমার অফিস আর বাসার সবগুলো টেলিফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে।'

'তোমার সাথে কথা বলা দরকার, সামনাসামনি। কিছু কিছু ব্যাপার রহস্যময় মনে হচ্ছে আমার।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলো ঝি লিং। 'অল রাইট। পুরানো সেই আমের ঠিকানায় চলে এসো। এক ঘণ্টার মধ্যে।'

'আসছি।'

রু সেন্যুহিল। প্যারিসের উত্তর প্রান্তের অভিজাত আবাসিক এলাকা। ঝি লিঙের গার্ল ফ্রেন্ডের বাসা এখানে। প্যারিসে এলে মাঝে মধ্যে এখানে তাদের আড্ডায় বসে যায় রানা ওদের সাথে। রানা যখন পৌঁছুলো, গাঢ় মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। আঁধার হয়ে গেছে চারদিক। অনেক দূরে কোথাও গম্ভীর সুরে মেঘ ডাকছে, গুম গুম আওয়াজ আসছে।

দরজা খুলে দিলো ঝি লিং। গম্ভীর। 'ঢোকো। কুইক।'

দরজা বন্ধ করে লক করে দিলো সে। তারপর হাত মেলালো ওর সাথে। চাইনীজ সিক্রেট সার্ভিসের লিউ ফু চুঙের জ্ঞাতি ভাই লিং, সেই সূত্রে পরিচয়। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা লিং। চওড়া হাড়ের গড়ন। সজারুর কাঁটার মতো খাড়া চুলের জন্যে মাথাটা কদম ফুলের মতো লাগে। বয়স বোঝার কোনও উপায় নেই চেহারা দেখে। যেন একই জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

'বোসো, রানা।'

মুখোমুখি বসলো দুই বন্ধু। রানার ক্লান্ত, চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো লিং। দাড়ি-গোঁফের বাহার দেখে হাসলো মুখ টিপে।

'চি চিন কোথায়?' লিঙের গার্ল ফ্রেন্ডের কথা জানতে চাইলো রানা, ভদ্রতার খাতিরে।

প্রায় বিড় বিড় করে বললো লিং, 'বাইরে গেছে। জরুরী কাজে।'

'এবার বলো, লিং। কী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আমাকে এনএসএ।'

'অপারেশন ডুমসডে প্রজেক্টের কথা শুনেছো কখনও?' পলকহীন দৃষ্টিতে রানাকে পর্যবেক্ষণ করছে ঝি লিং।

'না। কি সেটা? ইউএফও-র সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?'

'ইউএফও-র জন্যেই এর সৃষ্টি, রানা। তুমি জানো, এ মুহূর্তে ভিনগ্রহবাসীদের কতো বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমরা? জানো, যে কোনো মুহূর্তে মানবজাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে ওরা?'

'না তো! কেন?'

আসন ছাড়লো ঝি লিং। অস্থির। উত্তেজিত। পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো ঘরময়। 'কয়েক বছর আগে ন্যাটো বেসে নেমেছিলো ওরা সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার জন্যে।'

'কি নিয়ে...?'

'অদ্ভুত কিছু দাবি নিয়ে এসেছিলো ওরা...পেট্রোলিয়াম, গ্যাস উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। কেমিক্যালস, রাবার, প্লাস্টিক উৎপাদন বন্ধ করতে হবে...তার মানে বন্ধ করে দিতে হবে পৃথিবীর হাজার হাজার কল-কারখানা। গাড়ি তৈরি করা চলবে না, যেখানে যতো স্টিল প্লান্ট আছে, তাও বন্ধ করে দিতে হবে।'

'কেন?' বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়ছে রানার।

'কারণ আমরা নাকি বিষিয়ে ফেলেছি পৃথিবীর পরিবেশ। ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছি একে...সাগরের পানি নাকি আর পানি নেই। অস্ত্র উৎপাদন করা যাবে না, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো যাবে না। মোট কথা কিছুই করা যাবে না। ব্রাজিল তার গাছ বিক্রি করবে, তাতেও ওদের আপত্তি। দাবি না মানলে গোটা মানবজাতিকে ধ্বংস করে দেবে ওরা।'

'লিং...'

'কিন্তু এতোসব আপত্তির কাছে মাথা নত করতে রাজি নই আমরা, রানা। এজন্যে আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, সৌদি আরবসহ আরও অনেক দেশের কয়েকজন শিল্পপতি মিলে গঠন করেছে এই প্রজেক্ট, অপারেশন ডুমসডে। বিশাল ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক আছে তাদের, প্রয়োজনে কোটি কোটি ডলার খরচ

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

করতেও দ্বিধা করে না এরা। কোবরা ছদ্মনামে এক শিল্পপতি পরিচালনা করেন পুরো
প্রকল্পটি। একটাই উদ্দেশ্য তাদের, ভিনগ্রহবাসীদের হুমকি মোকাবেলা করা, ওদের
প্রতিহত করা। সেজন্যে যতোদূর যা করা দরকার, করতে প্রস্তুত অপারেশন
ডুমসডে।'

চোখ কপালে উঠেছে রানার আগেই। 'তুমি এতো খবর জানলে কী ভাবে?'
ক্রমের মাঝখানে থমকে দাঁড়ালো ঝি লিং। পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'এসডিআইকি,
জানো?'

'স্টার ওয়রস। রাশানদের আন্ত মহাদেশীয় ব্যালাস্টিক মিসাইল গুলি করে
নামানোর পশ্চিমা স্যাটেলাইট সিস্টেম।'

অধৈর্যের মতো মাথা দোলালো চীনা। 'ঠিক বলেছো, এক সেন্সে। আবার অন্য
সেন্সে ঠিক বলোনি। অবশ্য তোমার দোষ নেই, শতকরা নিরানব্বই দশমিক নয় জন
যা জানে, তুমিও তাই জানো। উত্তর হচ্ছে, প্রথমে ওটা তা-ই ছিলো। কিন্তু ইউ নো,
সময় পাল্টে গেছে। রাশানদেরকে আর আগের মতো হুমকি বলে মনে করা হচ্ছে
না। এ আজ নয়, অনেক আগে থেকেই ভেতরে ভেতরে সবাই জানতো, সোভিয়েত
ইউনিয়ন ভেঙে যাবে যে কোনোদিন। ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর মেধা
আর অর্থ খাটিয়ে এসডিআই প্রকল্প এবং তার বিজ্ঞানীদের কিনে নিয়েছেন এই
কোবরা। ওপরে ওপরে সরকারের নির্দেশমতোই চলে তারা, কারণ এখনও
প্রকল্পটিকে বাতিল ঘোষণা করা হয়নি। অথচ মজা কি জানো, কাজ করে তারা
কোবরার ইচ্ছে অনুযায়ী। এ মুহূর্তে এসডিআই ইউএফও ধ্বংস করার জন্যে প্রায়
প্রস্তুত। এ ছাড়া আসলে উপায়ও নেই, না করলে ওদের আগ্রাসন ঠেকানো যাবে
না।'

অজান্তেই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে মাসুদ রানার। নিজের কানকেও বিশ্বাস
করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। এসব কি শুনছে ও ঝি লিঙের মুখে? ওদিকে দূরাগত মেঘ
ডাকার গুম গুম আওয়াজ একটু একটু করে বেড়েই চলেছে।

'তার মানে…তার মানে, তুমি বলতে চাইছো সংশ্লিষ্ট দেশের সরকাররা
অপারেশন ডুমসডে সম্পর্কে কিছুই জানে না?'

ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত ভরে পা ফাঁক করে দাঁড়ালো ঝি লিং। 'ঠিক।
ভিনগ্রহবাসীদের হুমকি তারা গুরুত্বের সাথে নিয়েছে ঠিকই। কিন্তু এখনও কার্যকর
কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। করণীয় সম্পর্কে কেবল আলোচনাই চালিয়ে যাচ্ছে
তারা। আর এই ফাঁকে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে কোবরা আর তার দলবল।
নিজেদের স্বার্থেই আর কি! এগিয়ে গেছে অনেক দূর।'

'এসডিআই-এর হাত বদল সম্পর্কেও কিছু জানা নেই তাদের?'

'না। জানা নেই।'

'কেন?'

'কি কেন?'

'ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো এ ব্যাপারে রিপোর্ট করে না?'

'করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। জায়গামতো পৌঁছায় না সে রিপোর্ট।'

'সে কি!'

'রানা, উ সেনকে হত্যা করতে তুমি যখন প্রস্তুত, তখনই রুড র‍্যাবো টের পেয়েছিলেন ফরাসী প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কীভাবে ঢুকে আছে ইউনিয়ন কর্স। সরকারকে তারা কী ভাবে বিপথে চালিত করছে। ঠিক না? এ-ও সেরকম। জায়গা মতো যায় না তাদের রিপোর্ট, মাঝ-পথে ঠেকে যায়। যেসব দেশের শিল্পপতিরা অপারেশন ডুমসডের সাথে জড়িত, সে সব দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর অবস্থা ঠিক সেই সময়কার ফ্রান্সের প্রশাসনের মতোই। সব গুরুত্বপূর্ণ পদেই কোবরার নিজস্ব লোক জেঁকে বসে আছে। ডেপুটি চীফ থেকে শুরু করে…'

ভীষণভাবে চমকে উঠলো মাসুদ রানা। 'কি বললে? তার মানে জেনারেল হিলিংটন…'

'তাই।' একটা চোখ টিপলো ঝি লিং। 'শুধু তিনিই নন, রানা। সিআইএ-র ম্যালকম হগ, এফবিআইয়ের পিটার ডওসন,' কাঁধ ঝাঁকালো সে, 'সবাই এক পথের পথিক।'

'তাহলে…আমার টারমিনেশন অর্ডারের সাথে মার্কিন সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই? যে দশজন নিরপরাধ মানুষ ইউএফও ক্র্যাশ দেখে ফেলার 'অপরাধে' মারা গেল, তারা কোবরার নির্দেশে খুন হয়েছে?'

'কোনো ভুল নেই তোমার ধারণায়।'

গুম গুম আওয়াজ আরও বেড়ে গেছে। ঘরের দরজা-জানালা কাঁপছে থর থর করে। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে আওয়াজটা। আকাশে আরও ভারি হয়ে জমেছে মেঘ। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে হয়তো।

আবার কথা বলে উঠলো লিং। 'কোবরার কাছে এ মুহূর্তে তুমিই পৃথিবীর সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মানুষ, রানা। তোমাকে তার চাই-ই। দুটো কারণ আছে এর পিছনে। প্রথমটা, অনেক কিছু জেনে ফেলেছো তুমি ইউএফও সম্পর্কে। এবং দ্বিতীয়টা, ওএনআই ডেপুটি চীফের অবাধ্য হওয়া। আসল কারণ অবশ্য পরেরটাই।'

কিছুটা যেন কঠিন হয়ে উঠেছে লিঙের মুখের ভাব। 'সে কথা আজও ভোলেননি জিমি স্টুয়ার্ট।'

'লিং…এসব, এতো কথা তুমি কি করে জানলে?' দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে মাসুদ রানার। হাঁ করে চেয়ে আছে বন্ধুর দিকে।

বাঁকা হাসি ফুটলো ঝি লিঙের মুখে। 'ইট'স সিম্পল, রানা।' ধীরে ধীরে ডান হাতটা বের করে আনলো সে পকেট থেকে, একটা বেরেটা অটোমেটিক শোভা পাচ্ছে সে হাতে। 'আমি অপারেশন ডুমসডের চীনা সেবকদের একজন।'

ওর বুক লক্ষ্য করে বেরেটা তুললো ঝি লিং। টেনে দিলো ট্রিগার। একই সঙ্গে দুনিয়া কাঁপানো বিকট শব্দে বাজ পড়লো কাছেই কোথাও-মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল দুটো আওয়াজ। রানার বাঁ দিকে একটা বন্ধ জানালার কাঁচের গায়ে ঝলসে উঠলো বিদ্যুৎ প্রবাহ এক রূপালী সাপের মতো।

সুপ্ত ছিলো সে গত দু'দিন যাবৎ। পড়ে ছিলো পার্কের এক ঘন ঝোপের আড়ালে। কেউ দেখতে পায়নি। হাজার চেষ্টা করেও চোখ মেলে রাখতে পারছিলো না সে। নিশ্চিত ছিলো, এই তার শেষ ঘুম। এ ঘুম আর কোনদিনও ভাঙবে না।

কিন্তু অবশেষে এলো বৃষ্টি। পরম আকাঙ্ক্ষিত বিশুদ্ধ পানি ঝম্ ঝম্ করে ঝরতে শুরু করলো আচমকা। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলো না সে। দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে বহুকষ্টে মাথা তুললো, টানা টানা দুই চোখ মেলে চেয়ে থাকলো কুচকুচে কালো আকাশের দিকে। ঠাণ্ডা, ভারি ফোঁটাগুলো যেন পরম স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে তার নগ্ন মুখে, সারা দেহে।

ক্রমেই বাড়তে লাগলো বৃষ্টির বেগ। সেই সাথে তুমুল ঝোড়ো বাতাস। সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত, খাঁটি ফ্লুইড, যা তার জীবনীশক্তি পুনরুদ্ধার করার জন্যে একান্তই প্রয়োজন ছিলো। উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি, দু'হাত শূন্যে তুলে দিলো, যেন আলিঙ্গন করতে চাইছে বৃষ্টিকে। গায়ে এসে পড়া পানির ফোঁটাগুলোর একটাকেও মাটিতে ঝরে পড়তে দিলো না সে, শুষে নিলো দেহের অসংখ্য রোমকূপ দিয়ে।

এক সময় অনুভব করলো মেয়েটি, ক্লান্তি বিদেয় নিয়েছে পুরোপুরি। সম্পূর্ণ তরতাজা, সুস্থ সে এখন। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। হারানো শক্তি একটু একটু করে ফিরে এসেছে, নিজেকে তার প্রচণ্ড শক্তিধর মনে হচ্ছে।

এবার আমি প্রস্তুত, ভাবলো সে, পুরোপুরি। পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছি, বুঝতে পারছি কে আমাকে উদ্ধার করতে পারে এই বিপদ থেকে। ট্রান্সমিটারটা বের করে বসে পড়লো সে ঘাসের ওপর। বন্ধ করলো দু'চোখ। এবং প্রায় সেই মুহূর্তেই সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে সমর্থ হলো।

বুকের বাঁ দিকে ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর আঘাত করলো গুলিটা। প্রচণ্ড ঝাঁকিটা সামলে দিতে পারলো না মাসুদ রানা, পিছিয়ে গেল এক পা। কিন্তু আশ্চর্য, গুলিটা বিদ্ধ হলো না দেহে। ওই অবস্থাতেও রানা আর লিং দু'জনেই ভাবলো একই কথা, কেন? এক সেকেণ্ড পর আবার গুলি করলো বিস্মিত ঝি লিং। বাঁ বাহুতে যেন আগুন ধরে গেল রানার, আগুনে পোড়ানো ছুঁচোলো একটা রড যেন ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ ওখানটায়। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো রানা।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরে গেছে লিঙের। আবার বেরেটা তুলেছে সে। বুঝতে পারলো রানা, এই-ই তার জীবনের শেষ সুযোগ, ধাঁই করে কারাতের সাইড কিক মেরে বসলো ও লিঙের কবজিতে। উড়ে গেল বেরেটা। কিন্তু তাতে টলানো গেল না লোকটাকে। সে-ও পাল্টা কারাতে কোপ মারলো ওর গুলিবিদ্ধ জায়গাটায়। আবার চেঁচিয়ে উঠলো রানা।

পিছিয়ে যাওয়ার বদলে ঝট করে এক পা এগোলো ও লিঙের দিকে, তারপর চরকির মতো ঘুরে দাঁড়িয়েই গায়ের জোরে ডান কনুই চালালো পিছনদিকে। 'কোঁৎ' করে উঠলো লিং, যন্ত্রণায় বুজে গেছে প্রায় কুঁতকুঁতে দুই চোখ। কিছুটা কাহিল করা গেছে ভেবে এগোতে যাচ্ছিলো রানা, পরক্ষণেই ঘাড়ের ওপর তার দশাসই রদ্দা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তেও সামলে নিলো। ভাগ্যিস সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে হাত চালাবার সময় পায়নি চীনা, তাহলেই হয়েছিলো।

গোল হয়ে ঘুরতে লাগলো দু'জনে। চেয়ে আছে পরস্পরের চোখের দিকে। সুযোগ খুঁজছে। লিঙই ঝাঁপ দিলো প্রথম। নীরবে যুঝতে লাগলো ওরা, জানে, যে কোনও একজনকে মরতে হবে। খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না মাসুদ রানা।

বাঁ হাত একেবারেই অকেজো হয়ে পড়েছে, উল্টে বরং বাধাই সৃষ্টি করছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর শার্ট-কোটের হাতা। আঙুলের মাথা বেয়ে টপ্ টপ্ ঝরে পড়ছে জোরে। দুর্বল হয়ে আসছে শরীর। ইচ্ছে হচ্ছে শুয়ে পড়ে, তাতে যা হয় হোক।

তাড়াতাড়ি কর, গাধা! নিজের উদ্দেশে দাঁত খিঁচালো রানা, সময় নেই। হঠাৎ ঘাড় কুঁজো করে ষাঁড়ের মতো ছুটে এলো লিং দু'হাত বাড়িয়ে। বাধা দেয়ার সময়ই পেলো না রানা। অক্টোপাসের মতো বুক-পেট বেড় দিয়ে আঁকড়ে ধরলো সে ওকে, মাথা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে থুতনি।

ওই অবস্থায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললো সে রানাকে পিছন দিকে। এক হাতে হাজার চেষ্টা করেও ছোটাতে পারছে না ও লিঙের শক্ত বাঁধন, অসহায়ের মতো পিছিয়েই চলেছে। কয়েক পা ঠেলে নিয়ে অন্য পথ ধরলো লিং। ডান হাতে দমাদম ঘুসি মারতে শুরু করলো ওর নাকমুখ এবং আহত জায়গাটায়। মার খেয়েই চলেছে রানা, বাধা দেয়ার শক্তি নেই।

প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে ভীষণ দুর্বল বোধ করছে। ক্ষীণ হয়ে আসছে দৃষ্টি। হঠাৎ দেহের ভার ছেড়ে দিলো রানা লিঙের হাতের ওপর, যেন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে। কাজ হলো এতে। লিঙের সম্মুখগতির সাথে যোগ হলো রানার পশ্চাদগতি, পলকে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো লোকটা। পড়ে যেতে শুরু করলো দুজনে একসাথে—রানা পড়বে আগে, লিং থাকবে তার ওপরে।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে উল্টোটা ঘটলো। আচমকা নিজেকে হ্যাঁচকা টানে ঘুরিয়ে ফেললো রানা, আগেই ডান হাতে জড়িয়ে ধরেছিলো লিঙকে যাতে সরে যেতে না পারে। পলকে লিং চলে গেল নিচে। এবং দুজনে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়লো একটা গ্লাস টপ্ সেন্টার টেবিলের ওপর। পুরু কাঁচটা চুরমার করে টেবিল ভেঙে জোরে আছড়ে পড়লো।

ক্ষতস্থানে চাপ পড়তে আবার চেঁচিয়ে উঠলো রানা, কিন্তু গলা দিয়ে মৃদু গোঙানি বেরোলো কেবল। লিঙকে ছেড়ে গড়িয়ে পড়লো ও মেঝেতে। পড়েই থাকলো। নড়াচড়ার শক্তি নেই। হাঁপাচ্ছে ফোঁস ফোঁস করে। শেষ হয়ে গেল সব, চোখ বুজে পড়ে পড়ে ভাবছে মাসুদ রানা, ওদেরই জিৎ হলো শেষ পর্যন্ত।

শুয়ে আছে ও। অপেক্ষা করছে লিঙের মরণ আঘাতের। কিন্তু বেশ কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল, কিছুই ঘটলো না। এবার চোখ মেললো রানা। ধীরে ধীরে, তীব্র যন্ত্রণায় নীরবে চিৎকার করতে করতে মাথা তুললো। হাত-পা ছড়িয়ে ওর পাশেই চিৎ হয়ে পড়ে আছে ঝি লিং। দু'চোখ বিস্ফারিত, সিলিঙের দিকে চেয়ে আছে পলকহীন।

এই সময় ব্যাপারটা চোখে পড়লো ওর ভালোমতো। লিঙের বুকের ঠিক মাঝখান থেকে বেরিয়ে আছে রক্ত মাখা এক টুকরো কাঁচ, আগা-টা সূঁচালো। ধড়মড় করে উঠে বসলো মাসুদ রানা। এদিক ওদিক তাকালো বেকুবের মতো। ভাঙা টেবিল আর কাঁচের টুকরোগুলোর ওপর চোখ পড়লো। বুঝতে পারলো কি ঘটে গেছে। আছড়ে পড়ার সময় টেবিলের কাঁচ ভেঙে ঘটেছে এটা।

রক্তের প্রলেপ মাখানো স্বচ্ছ একটা ড্যাগার যেন, পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেছে লিঙের। কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসলো রানা। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে

থাকলো লিজের নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে। আর দুই সেকেণ্ড দেরি হলে হয়তো ওই
পরিণতি রানারই হতো। কোত্থেকে শক্তি এসে ভর করলো দেহে, দ্রুত উঠে
দাঁড়ালো ও। রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। বুলেটটা
বোধহয় রয়েই গেছে ভেতরে। ওটারও ব্যবস্থা করতে হবে।

কাছেই রানার একজন পরিচিত ডাক্তার আছে। তবে লোকটা ব্রিটিশ। তার
কাছে যাওয়াতে ঝুঁকি আছে। কিন্তু না গিয়ে কোনও উপায়ও নেই। অপরিচিত
কোনও ডাক্তারের কাছে যাওয়া মোটেই উচিত হবে না এ ক্ষত নিয়ে। নিশ্চয়ই
পুলিশী ঝামেলা হবে তাহলে। হঠাৎ কি খেয়াল হতে বুক পকেটে হাত ভরলো রানা।
ডিলিথিয়ামের সেই হালকা টুকরোটা ছিলো ওখানে, বের করে আনলো জিনিসটা।
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো।

কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। অথচ এই জিনিসটাই একটু আগে
নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে ওকে—ঠেকিয়ে দিয়েছে ঝি লিজের প্রথম
গুলিটা। মনে মনে ধন্যবাদ জানালো রানা ভাগ্যকে।

হাতব্যাগটা নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতে যাবে ডা. ফ্র্যাঙ্ক পাগান, এই সময় বেজে
উঠলো টেলিফোনটা। চেম্বার বন্ধ হয়ে গেছে আজকের মতো, কর্মচারীরা চলে
গেছে। অতএব থামতে হলো তাকে। পিছিয়ে এসে রিসিভার তুললো।

'ডক্টর পাগান?' কণ্ঠস্বরটা জড়ানো।

'বলছি।'

'মাসুদ রানা বলছি।'

'মাসুদ রানা?' চমকে উঠলো ফ্র্যাঙ্ক পাগান। 'কোত্থেকে?'

'নেভার মাইণ্ড। বিপদে আছি ডক, আহত...আপনার সাহায্য দরকার।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। কি বিপদ, কি হয়েছে?'

ব্যাটা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে, ভাবলো মাসুদ রানা। বললো,
'এলেই বুঝতে পারবেন। ফোনে বলা যাবে না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। কোথায় আসতে হবে?'

'রু বেল্যুভিল। ঠিকানা...'

'অল রাইট। আসছি আমি এখনই।'

ফোন রেখে দিয়েছে মাসুদ রানা। একবার দ্রুত আট সংখ্যার একটা নাম্বারে
ডায়াল করলো ফ্র্যাঙ্ক পাগান। 'দিস ইজ ডক্টর ফ্র্যাঙ্ক পাগান। মেজর মাসুদ রানা
ফোন করেছিলো আমার চেম্বারে। ও আহত। ওকে দেখতে যাচ্ছি আমি রু
বেল্যুভিল।'

'গুড, গুড। ঠিকানা?'

ঠিকানাটা বললো ডাক্তার।

'থ্যাঙ্ক ইউ, ডক। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

রিসিভার রেখে দিলো পাগান। সাথে সাথেই মৃদু 'ক্যাচ' শব্দ উঠলো দরজায়।
চোখ তুললো সে। চমকে উঠলো পরমুহূর্তে। দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
মাসুদ রানা। হাতে ওয়ালথার পি. পি. কে।

'পরে ভেবে দেখলাম,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো ও। 'যন্ত্রপাতি কোনটা কোনটা
দরকার হয় কে জানে। এখানে আসাই ভালো। তাই চলে এলাম।'

বিস্ময় লুকোবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো ডা. পাগান। 'আপনি...মাই গড! এই
মুহূর্তে কোনো হাসপাতালে ভর্তি হওয়া উচিত আপনার। এতো ব্লিডিং...'

'আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু মর্গের খুব বেশি কাছে যেতে ভালো লাগে না
আমার। যা করার এখানেই করুন। এবং তাড়াতাড়ি।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিলো পাগান। কিন্তু কি ভেবে চেপে গেল।
'বেশ।' কাছে এসে রানার ক্ষতটা দেখলো সে। 'এই মুহূর্তে অ্যানেসথেটিক দেয়া
দরকার আপনাকে। তাতে কষ্ট টের পাবেন না।'

'ও কিছু না। কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আছে আমার।' এক পা এগোলো মাসুদ
রানা। সামান্য দুলে উঠলো। মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে এখনই। 'ওই
জিনিসটার কথা এমনকি চিন্তা পর্যন্ত করবেন না, ডক্টর।'

'কিন্তু...'

ওয়ালথার দোলালো রানা। 'কোনো কিন্তু নয়। কোনো চালাকিও নয়। সে
ক্ষেত্রে আপনার লাশ বের হবে এখান থেকে স্ট্রেচারে করে। কোনো প্রশ্ন?'

ঢোক গিললো ডা. পাগান। 'না।'

'তাহলে শুরু করে দিন।'

'আসুন আমার সাথে।'

রানাকে পাশের ঘরে নিয়ে এলো সে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ঠাসা পরীক্ষাগার
এটা। খুব সাবধানে ভেজা কোটটা খুলে ফেললো রানা। তারপর বসলো একটা
চেয়ারে। পাগানের প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে, শ্যেন দৃষ্টিতে। তাকে একটা
স্ক্যালপেল তুলে নিতে দেখে পিস্তলটা সামান্য উঁচু করলো। ট্রিগারের ওপর শক্ত হয়ে
উঠলো তর্জনী।

'রিল্যাক্স' ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দুর্বল গলায় বললো পাগান। 'আপনার শার্টের
হাতা কাটতে যাচ্ছি আমি।'

কাঁধের সামান্য ওপর থেকে কেটে ফেললো সে হাতাটা, আস্তে আস্তে বের
করে আনলো। ক্ষতটার ওপর এক মুহূর্ত নজর বুলিয়েই বললো, 'ভেতরে রয়ে
গেছে গুলিটা, মিস্টার রানা। অ্যানেসথেটিক না দিলে ব্যথা সহ্য করতে পারবেন না
কিছুতেই।'

জোর করে হাসির ভঙ্গি করলো ও। 'পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

হাল ছেড়ে দিলো ডা. পাগান। 'ও. কে। হোয়াটএভার ইউ সে।'

পিছিয়ে গিয়ে স্টেরিলাইজিং ইউনিটের সামনে দাঁড়ালো পাগান। ছুরিটা রেখে
দিয়ে ফরসেপ তুলে নিলো। স্থাণুর মতো বসে আছে মাসুদ রানা, দেখছে। এক
ফোঁটা শক্তি নেই শরীরে। এখন একটা বাচ্চা ছেলেও চাইলে কাবু করে ফেলতে
পারে ওকে, ডাক্তার তো সেই তুলনায় হাতি।

মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কিছু নেই যেন ওখানে। গাঢ় কালো
একটা পর্দা থেকে থেকে ঘিরে ধরতে চাইছে ওকে, প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তি খাটিয়ে এখনও
নিজেকে খাড়া রেখেছে রানা। কিন্তু আর পারছে না। যে কোন মুহূর্তে লুটিয়ে পড়বে

annisumon@yahoo.com
www.murchona.com

জ্ঞান হারিয়ে। চোখের সামনে আজরাইলকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, বিকট চেহারা নিয়ে উদয় হয়েছে ওর জান কবচ করতে। মাথা ঝাড়া দিলো ও। দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এলো।

কোথায় আজরাইল! এ তো ডক্টর পাগান। ফরসেপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সন্দিগ্ধ চোখে দেখছে ওকে।

'মিস্টার রানা?'

'শুরু করুন।'

বাঁ হাতের দু'আঙুলে ক্ষতটা যথাসম্ভব ফাঁক করে ধরলো ডাক্তার। ভেতরটায় একবার নজর বুলিয়ে চেপে ঢুকিয়ে দিলো ফরসেপ। অকল্পনীয় তীব্র যন্ত্রণায় ঘর ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো মাসুদ রানা। চোখের সামনে হরেক রঙের উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি দেখতে পাচ্ছে। একটু পর ওখানটায় হ্যাঁচকা একটা টান অনুভব করলো রানা। আবার চেঁচিয়ে উঠলো প্রাণপণে।

'বেরিয়ে গেছে,' বললো ডা. পাগান। মুখটা সামনে নিয়ে এসে চোখ কুঁচকে দেখলো রানাকে। 'আপনি ঠিক আছেন?'

'হ্যাঁ,' বহুকষ্টে বললো ও। 'ব্যাণ্ডেজ করুন।'

ওখানটায় খানিকটা পেরোক্সাইড ঢাললো ডা. পাগান। দাঁত কামড়ে ধরে বসে থাকলো মাসুদ রানা। দীর্ঘ এক যুগ, না, দুই যুগ সময় লাগলো পাগানের ব্যাণ্ডেজটা করতে, মনে হলো ওর। শালা, ডাক্তার হয়েছো? পাস করে তো, না কি...?

'ব্যস। ফিনিশ।' রানার পুরো বাহু এবং কাঁধ পেঁচিয়ে করা ভারি ব্যাণ্ডেজটা টেনেটুনে দেখলো পাগান আরেকবার।

'আমার কোটটা...কোটটা দিন।'

অবাক হলো ডাক্তার। 'এ অবস্থায় যেতে পারবেন ভাবছেন? অসম্ভব! ঠিকমতো দাঁড়াতেই তো পারছেন না আপনি।'

'কোটটা দিন,' অধৈর্যের মতো মাথা দোলালো মাসুদ রানা। অযথা উপদেশ শুনতে ভালো লাগছে না।

কানে যায়নি বোধহয় কথাটা। আবার বলে উঠলো সে, 'প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে, মেজর রানা। কথা না শুনলে বিপদে পড়বেন।'

এখানে থাকলে আরও বেশি বিপদে পড়বো, ভাবলো রানা। পিস্তল তুললো পাগানকে লক্ষ্য করে। দুর্বল কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠলো, 'ডু হোয়াট আই সে।'

একটা চেয়ারের সাথে ঝোলানো কোটটা নিয়ে এলো ডা. ফ্র্যাঙ্ক পাগান। তার সাহায্য ছাড়াই ওটা পরে ফেললো রানা অনেক ধস্তাধস্তি করে। তারপর উঠে দাঁড়ালো। বন করে চক্কর দিয়ে উঠলো মাথার ভেতরে। পড়েই যাচ্ছিলো। চেয়ারটা ধরে সামলে নিলো সময়মতো।

'আপনি যেতে পারবেন না এ অবস্থায়, কেন বুঝছেন না?'

ডাক্তারের আবক্ষ কাস্ট স্টীল দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। জোর দিয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই পারবো।' আসলে কথাটা ও নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাইলো। রক্তাক্ত ফরসেপের পাশে পড়ে থাকা চওড়া সার্জিক্যাল টেপ স্পুলটার ওপর নজর পড়লো রানার। ওটা দিয়েই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে।

ইশারায় চেয়ারটা দেখালো রানা পাগানকে। 'এখানে বসুন।'

'কেন? আমি কি...?'

'সিট ডাউন!'

চট্ করে মুখে কুলুপ আঁটলো পাগান রানাকে আবার পিস্তল তুলতে দেখে। বসে পড়লো। এবার স্পুলটা তুলে নিলো মাসুদ রানা। এ পরিস্থিতিতে কাজটা একেবারেই অসম্ভব। তবু অনেক পরিশ্রম করে ওটার প্রান্তটা রোল থেকে আলগা করলো রানা, স্পুলটা আহত হাতের তর্জনীতে পুরে দাঁত দিয়ে টেনে টেনে খুলতে লাগলো টেপ। কিন্তু বেশি খোলা যাচ্ছে না, পেঁচিয়ে যাচ্ছে।

বাধ্য হয়ে যেটুকু খোলা গেছে, সেটুকু দিয়ে চেয়ারের হাতলের সাথে ডা. পাগানের দুই কবজি কষে বাঁধলো রানা প্রথমে। তারপর নিশ্চিন্ত মনে তার পুরো বুক-পেট প্যাঁচাতে শুরু করলো চেয়ারের ব্যাকের সাথে। নড়াচড়া করতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তীব্র ব্যথার ঢেউ খেলে যাচ্ছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। কিন্তু থামলো না রানা রোলটা শেষ না করে।

কাজ শেষ করে দু'পা পিছিয়ে গেল মাসুদ রানা। ডাক্তারের বুক পেট পুরোটাই গায়েব হয়ে গেছে। মন্দ হয়নি কাজটা। এক ঘণ্টার কমে এই বাঁধন খোলা সম্ভব হবে না কারও পক্ষে, একা একা খোলার তো প্রশ্নই আসে না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা। পরমুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

বাহ, কী মজা! মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে মাসুদ রানা পাখির মতো ডানা মেলে। একেবারে হালকা, ওজনশূন্য। তুলোর মতো পেঁজা পেঁজা মেঘ ফুঁড়ে সাঁই সাঁই উড়ে চলেছে ও।

'উঠে পড়ো!' কে যেন বললো ওকে। সেই সাথে বাঁ দিকের বুকের পাঁজরে হালকা একটা খোঁচা অনুভব করলো।

না, উঠবো না, মৃদু গুঙিয়ে উঠে পাশ ফিরলো রানা। এই স্বপ্নের রাজ্যেই চিরকাল থাকতে চাই আমি।

'ওঠো, প্লীজ!'

এবার আরও জোরে খোঁচা খেলো ও। কি ওটা? অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডান হাত তুললো মাসুদ রানা। কোটের ভেতরের পকেট থেকে বের করে আনলো পাতলা ধাতব খণ্ডটা। সাথে সাথে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

'রানা! মাসুদ রানা!' একটা নারীকণ্ঠ ওটা। রানার পরিচিত। মনে হলো আগে কোথাও শুনেছে ও এ কণ্ঠ। মৃদু, ভারি মিষ্টি।

গাঢ় সবুজ রঙের এক বাগানে এসে পড়েছে রানা। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। বাতাসে মৃদু সঙ্গীতের মূর্ছনা। মাথার ওপরে আলোয় আলোয় ভাসছে আকাশ। হঠাৎ করেই মেয়েটিকে দেখতে পেলো মাসুদ রানা। অদ্ভুত সুন্দরী একটি মেয়ে। লম্বা। স্লিম, কমনীয় রূপ। তুষার শুভ্র এক গাউন পরে আছে। এ সেই মেয়ে।

কয়েক পা এগিয়েই থেমে দাঁড়ালো মেয়েটি। মনে হলো ইচ্ছে আছে, কিন্তু কোনও অদৃশ্য বাধার জন্যে এগোতে পারছে না। এইবার লক্ষ্য করলো রানা ভালো

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com

করে। বেশ শুকনো শুকনো লাগছে যেন ওর মুখটা।

'মাসুদ রানা! তোমার অপেক্ষায় আছি আমি।'

'কে তুমি?' বিড়বিড় করে প্রশ্ন করলো রানা।

'বন্ধু। কিন্তু এ মুহূর্তে খুব বিপদে আছি আমি। তুমি সাহায্য না করলে এ বিপদ থেকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না আমাকে।'

'আমি! আমি কি সাহায্য করতে পারি তোমাকে?'

'তোমার হাতের ওই জিনিসটা, ওটা আমার, রানা। ওটার অভাবে নিজের গ্রহের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না আমি। ফিরে যেতে পারছি না সেখানে। অনেকদিন ধরে আটকা পড়ে আছি।'

অজান্তেই হাতের মুঠি শক্ত হলো মাসুদ রানার। 'তোমাদের কেন সাহায্য করবো আমি? মানবজাতির শত্রু তোমরা। আমাদেরকে তোমরা ধ্বংস করতে চাও।'

'না, রানা। ভুল। আমরা তোমাদের বন্ধু, সাহায্য করতে চাই তোমাদের। কিন্তু ওই জিনিসটা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই যে করতে পারছি না আমি। প্লীজ, রানা। আমাকে সাহায্য করো।'

'বেশ, এসো। নিয়ে যাও তোমার জিনিস।'

'আমার সে ক্ষমতা নেই। গায়ে শক্তি নেই। দুর্ঘটনাটার পর থেকে এ পর্যন্ত না খেয়ে আছি আমি। পানি ছাড়া আর কিছুই জোটেনি।'

'সে কি!' চমকে উঠলো রানা, আবার পাশ ফিরলো। 'আহা, বেচারী! কোথায় আছো তুমি এখন?'

'সেখানেই। যেখানে ক্র্যাশ করেছিলো আমাদের স্পেসশিপ।'

'ঠিক আছে, আসছি আমি। যত শীঘ্রি পারি। তবে আমাকে ওরা খুঁজছে। দেখামাত্র খুন করবে ওরা আমাকে।'

'না, রানা।' সুন্দর করে হাসলো মেয়েটি। 'কেউ আর কিছু করতে পারবে না তোমার। নিশ্চিন্তে চলে এসো।'

চট করে চোখ মেললো মাসুদ রানা। বেকুবের মতো চেয়ে থাকলো কিছুক্ষণ সিলিঙের দিকে। হাতের মধ্যে ডিলিথিয়াম খণ্ডটা নড়ে উঠতে ঝট করে উঠে বসলো ও। উত্তেজিত।

এ তাহলে সেই মেয়ে, যার কথা বলেছিলো লারস ভিলফোর্ট? এগারো নম্বর? ভিনগ্রহবাসী?

দুর্বলতা কেটে গেছে ওর অনেকটা। ব্যথাও কম মনে হচ্ছে। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো রানা ডা. ফ্রাঙ্ক পাগানের বিস্ফারিত চোখের সামনে। ছুটে গেল দরজার দিকে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে কি মনে করে ঘুরে দাঁড়ালো রানা। পাগানের চোখে চোখ রেখে হাসলো।

'ধন্যবাদ, ডক্টর। বেঁচে থাকলে আপনার এই ঋণ একদিন শোধ করবো আমি। গুড-বাই।'

দশ

ডা. পাগানের অফিস রুমে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো মাসুদ রানা। ভাবলো, এখান থেকেই করা যাক টেলিফোনটা। রিসিভার তুলে জেনারেল হিলিংটনের বিশেষ নাম্বারটায় ডায়াল করলো ও।

'হ্যালো?'

ভুরু কুঁচকে উঠলো ওর। অন্য লোকের গলা এটা, জেনারেল নয়। 'জেনারেল হিলিংটনকে চাই আমি।'

'উনি অফিসে নেই। কে বলছেন, স্যার?'

'মাসুদ রানা।'

'ওহ, জাস্ট আ মিনিট, মেজর।' কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জেনারেলের গলা শোনা গেল। 'মেজর? কি ব্যাপার...'

'কল ট্রেস করার অপচেষ্টা করবেন না দয়া করে, জেনারেল। শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে। আপনার খেলা শেষ।'

'হোয়াট? এসব কি বলছেন আপনি, মেজর?'

'মন দিয়ে শুনুন। আপনি জানেন বোধহয়, তিনজন যাত্রী ছিলো স্পেসশিপটায়। দু'জনকে পাওয়া গেছে, অন্যজন নিখোঁজ ছিলো।'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'তাকে আমি খুঁজে পেয়েছি, জেনারেল,' ধীরে ধীরে, দৃঢ় আস্থার সাথে বললো রানা কথাগুলো। 'আমি কি বলতে চাইছি, বুঝতে পারছেন তো?'

দম আটকে এলো জেনারেলের। আচমকা ঘামতে শুরু করলেন। 'হ্যাঁ, মেজর,' অনেকটা আত্মসমর্পণের সুরে বললেন তিনি। 'বুঝতে পারছি।'

'তাকে নিয়ে এখন আমি প্রেসে যাচ্ছি।'

'না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন হিলিংটন। 'মেজর, প্লীজ। ওই কাজটি করবেন না। পাবলিক ভয়ে পেয়ে...'

'বাজে কথা বলবেন না। অনেক ধোকা দিয়েছেন আপনি। আর ও চেষ্টা করবেন না। মেয়েটা আমার সাথে প্রেসে যেতে রাজি হয়েছে খুশি মনেই। পৃথিবীবাসীর জন্যে ওর বোধহয় বিশেষ কিছু বলার আছে।'

'না না, মেজর, প্লীজ।'

'ঠিক আছে, যাবো না। কিন্তু কয়েকটা শর্ত আছে আমার।'

'বলুন?'

প্রথম শর্তটা শুনে দুর্বল হৃৎপিণ্ডটা আরও দুর্বল হয়ে গেল জেনারেলের। রানা বললো, 'কাল সকালে জুরিখ পৌঁছুতে হবে আপনাকে। কোবরাকেও থাকতে হবে সঙ্গে। এবং জিমি স্টুয়ার্ট, ওকেও চাই আমি।'

'কোবরা!' যেন মহাবিস্মিত হয়েছেন জেনারেল। 'কার কথা বলছেন আপনি?

aramsumon@yahoo.com www.murchona.com

কোবরা কে?'

বাঁকা হাসি ফুটলো মাসুদ রানার ফ্যাকাসে ঠোঁটে। 'অপারেশন ডুমসডে যার গড়া। ইওস্ট্রিয়ালিস্ট। যার নির্দেশে এসডিআই স্পেসশিপ নক ডাউন করার জন্যে প্রস্তুত, সেই কোবরা। চিনতে অসুবিধে হচ্ছে?'

'না···ঁআ, মেজর···ইয়ে···'

'এবং জিমিকে আনতেও ভুল হয় না যেন। জুরিখের ডলডার গ্র্যাণ্ড হোটেলের ডেকে আপনার জন্যে আমার পরবর্তী নির্দেশ অপেক্ষা করবে।'

'বেশ।' এতো আস্তে বললেন তিনি, শুনতে পেলো না রানা পরিষ্কার।

'কি বললেন?'

'বলছি আমি আসবো।'

'আর এই মুহূর্তে আমার টার্মিনেশন অর্ডার উইথড্র করে নিন।'

'শিওর। মনে করুন তুলে নিয়েছি।'

'সুইটজারল্যাণ্ড রওনা হবো আমি। কেউ যেন বাধা না দেয়।'

'দেবে না। প্রয়োজনে আপনার জন্যে প্লেনের ব্যবস্থা করতে পারি আমি, মেজর।'

'জানি। সেই সাথে "ভিভিমের" ব্যবস্থাও করতে পারেন। কিন্তু আর সে সুযোগ আপনাকে দিতে চাই না। মন্তপারনেসে হোটেল লিট্রি-র সামনে আমার জন্যে একটা মার্সিডিজ তৈরি রাখার নির্দেশ দিন।'

'আপনি প্যারিসে?'

'রাইট। কেন, নেবেন নাকি আরেকটা চান্স? ইচ্ছে করলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'ভুল বুঝছেন আপনি।'

'তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? প্রথম থেকেই তো আপনাকে ভুল বুঝে আসছি। আমার শর্তগুলো যেন মনে থাকে। একটু এদিক ওদিক হলে সব জেনে যাবে দুনিয়ার সবাই।'

লাইন কেটে দিয়ে আরেকটা নাম্বারে ডায়াল করলো মাসুদ রানা। এটাও ওয়াশিংটনে। ঝাড়া আধঘণ্টা কথা বললো ও এবার।

হোটেল লিটরি-র সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলো মাসুদ রানা। ডান হাতটা কোটের সাইড পকেটে, ওয়ালথারের বাঁট আঁকড়ে ধরে আছে। হোটেলের সামনেই বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো মার্সিডিজ সেডান। কেউ নেই ভেতরে। ওটার বিশ গজ পিছনে আর একটা নীল-সাদা কার। ফরাসী পুলিস কার। হুইলে ইউনিফরম পরা এক পুলিস সার্জেন্ট বসে আছে। এর দিকেই চেয়ে আছে সে।

আরও দু'জনের ওপর চোখ বোলালো মাসুদ রানা। দুই সাদা পোশাকধারী। হোটেলের 'গ্র' লেখা গেটের পাশে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের ভাব নির্বিকার। পলকহীন চোখে দেখছে রানাকে। ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে রানার। দুর্বল হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে ধক ধক। ফাঁদ নয় তো? ভাবছে ও, পা দিয়ে ফেলেছে জেনারেলের নতুন ফাঁদে? সতর্ক চোখে গাড়িটার দিকে

তাকালো রানা। বোমা বসানো হয়নি তো ওটার সেলফ স্টার্টার বা আর কোনও কিছুর সাথে?

দেখা যাক। হাত ইশারায় সাদা পোশাকধারীদের কাছে ডাকলো মাসুদ রানা। প্রথমে খানিকটা বিস্মিত হলো তারা। এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। একে আবার অসহিষ্ণুর মতো হাত নাড়তে দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। পায়ে পায়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো।

'মঁশিয়ে?'

'গাড়িটা স্টার্ট দিন।' বুড়ো আঙুল বাঁকা করে সেডানটা দেখালো রানা।

'বুঝলাম না।' চোখ কুঁচকে বললো একজন।

'গাড়িটা স্টার্ট দিতে বলছি।'

'কেন···?' বলেই থেমে গেল লোকটা। 'ও, বুঝেছি। আপনি যা ভাবছেন তা ওতে নেই, মঁশিয়ে।'

'আছে কি নেই, সেটাই তো দেখতে চাইছি।'

'ওকে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো সে। সোজা গিয়ে উঠে পড়লো মার্সিডিজের ড্রাইভিং সীটে। পরমুহূর্তে মৃদু গুঞ্জন তুলে স্টার্ট নিলো ওটা। মুখ ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকালো লোকটা। হাসলো। 'ইউ সী?'

'ইয়েস, আই সী।' সন্তুষ্ট হলো রানা। 'নাউ কাম আউট, প্লীজ।'

গাড়ি ছাড়লো রানা। রিয়ার ভিউ মিররে দেখতে পেলো পুলিস কারটা পিছু লেগেছে। ওর সাথে একই গতিতে আসছে ওটা। এক সময় মনে হলো, পূর্ব নির্ধারিত কোনও স্থানে পৌঁছে হয়তো বাধা দেবে রানাকে। কিন্তু ঘটলো ঠিক উল্টোটা। প্যারিস-জুরিখ হাইওয়েতে পৌঁছে ওকে দ্রুত পাশ কাটিয়ে সামনে চলে এলো পুলিস কার। ছাতে ফিট করা লাল ফ্ল্যাশিং লাইটটা জ্বলে উঠলো, তীক্ষ্ণ সাইরেনের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠলো হাইওয়ে। রানাকে এসকর্ট করে নিয়ে চললো ওটা।

মিনিট দশেক এক নাগাড়ে চলার পর মাথার ওপর কট্ কট্ আওয়াজ শুনলো মাসুদ রানা। জানালা দিয়ে ডানে তাকালো ও। মার্সিডিজের দুইশো গজ দূরে, বেশ নিচু দিয়ে সমান তালে উড়ে চলেছে ছোট একটা হেলিকপ্টার। ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল পুলিসের ইনসিগনিয়া দেখতে পেলো রানা ওটার গায়ে। ওর সুইটজারল্যাণ্ড যাত্রা নিরাপদ করার জন্যে ভালোই ব্যবস্থা করেছেন হিলিংটন।

বিকেল চারটেয় ফ্রেঞ্চ-সুইস বর্ডারে পৌঁছুলো রানা। ও বর্ডার অতিক্রম করামাত্র সুইস পুলিসের একটা স্কোয়াড কার দায়িত্ব নিলো ওর। ফরাসী স্কোয়াড কার আর হেলিকপ্টার বিদেয় নিলো।

'জলদি, রানা।' সেই মেয়েটির গলা শুনতে পেলো ও হঠাৎ। আগের চেয়ে বেশ জোরালো মনে হলো কণ্ঠ। 'জলদি এসো। তোমার অপেক্ষায় আমি চাতক পাখি।'

'আসছি' বললো রানা। 'এই তো এলাম বলে।'

জুরিখ ডলডার গ্র্যাণ্ড হোটেলের ডেকে দাঁড়িয়ে ছোট একটা নোট লিখলো মাসুদ

amarsumon@yahoo.com
www.murchona.com

রানা। কাগজটা খামে পুরে ডেস্ক ক্লার্কের দিকে এগিয়ে দিলো। 'এটায় জেনারেল হিলিংটনের জন্যে একটা মেসেজ আছে। ওনাকে দেবেন, প্লীজ।'

'ইয়েস, স্যার।'

বেরিয়ে এলো রানা হোটেল থেকে। সোজা এসে দাঁড়ালো সুইস স্কোয়াড কারের ড্রাইভারের জানালার পাশে। একজনই আছে কারে, কনস্টেবল। 'এখান থেকে আমি আমার নিজের পথে যাবো। আপনাকে আর দরকার নেই। ধন্যবাদ,' তাকে বললো রানা।

সামান্য ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকালো কনস্টেবল। 'ভেরি ওয়েল, মেজর।'

স্কোয়াড কারটা বিদেয় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো রানা। তারপর গাড়ি ছাড়লো আনটেনডর্ফের উদ্দেশে। এক এক করে নিহত দশজনের কথা ভাবলো ও। এই তো, সেদিনও ছিলো তারা, আজ নেই। দাঁতে দাঁত চাপলো রানা।

খুন পৌঁছুলোও এক সময়। পেটের মধ্যে কেমন একটা অনুভূতি। আর একটু সামনেই সেই জায়গা, যেখানে শুরু এই দুঃস্বপ্নের। মুহূর্তের মধ্যে হাজারটা স্মৃতি ভেসে উঠলো মনের পর্দায়। এখান থেকে শুরু করে জুরিখ হয়ে বার্ন, লণ্ডন, মিউনিখ, রোম থেকে অরভিয়েটো, ওয়াকো থেকে ফোর্ট স্মিথ, কিয়েভ, ওয়াশিংটন এবং বুদাপেস্ট গিয়ে শেষ হয়েছে ওর অনুসন্ধান। আজ আবার এখানেই ঘটতে চলেছে সে করুণ অধ্যায়ের পরিণতি।

গাড়ি দাঁড় করালো মাসুদ রানা। স্টার্ট বন্ধ করে নেমে এলো। রাস্তা পার হয়ে এসে দাঁড়ালো সেই মাঠে। ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে মেয়েটি। স্বপ্নে যেমন দেখা গেছে, অবিকল সেই চেহারা। ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো সে হাসিমুখে। ঠিক হেঁটে নয়, রানার মনে হলো যেন বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে আসছে।

'তুমি এসেছো বলে ধন্যবাদ, রানা।'

ও কি সত্যিই কথা বলছে, নাকি রানা ওর চিন্তা শুনতে পাচ্ছে? ভাবলো ও, ওদের ভাষা তো মানুষের বোঝার কথা নয়। এখানে, আনটেনডর্ফের এই মাঠে এক ভিনগ্রহবাসিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, বিশ্বাসই হতে চাইছে না। রানা ভেবেই পাচ্ছে না এ কি করে সম্ভব। পকেট থেকে ধাতব খণ্ডটা বের করে মেয়েটিকে দিলো রানা।

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার খুশিতে। 'ধন্যবাদ, রানা।'

'তোমাদেরকেও ধন্যবাদ। ওই জিনিসটা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে আমাকে। তবে তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আমার পরিচিত কিছু লোক আসছে এখানে। এখনই এসে পড়বে। তারা তোমার ক্ষতি করতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় ওরা আসার আগেই যদি তুমি চলে যাও।'

হাসলো মেয়েটি। 'এখন আর কেউ-ই কিছু করতে পারবে না আমার, রানা। তাছাড়া তোমাদের সাথে জরুরী কিছু আলাপ আছে আমার।'

'যেমন?'

'বলবো। সবাই আসুক আগে। ততক্ষণে আমার বন্ধুরাও এসে পড়বেন।' ডিভাইসটা ট্রান্সমিটারে ফিট করে পর পর কয়েকটা বোতামে চাপ দিলো সে ওটার।

ঘড়ি দেখলো মাসুদ রানা। জেনারেল হিলিংটনের আসার সময় হয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতেই হেলিকপ্টারের আওয়াজটা কানে এলো। মুখ তুললো রানা। গাছের ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেখতে পেলো প্রকাণ্ড গঙ্গা ফড়িংটাকে। নেমে আসছে।

'তোমার বন্ধুরা পৌঁছে গেছে, রানা।'

'বন্ধু?' অনেক দুঃখে হাসি ফুটলো ওর মুখে।

'হ্যাঁ। ওদের মধ্যে অন্তত দুজন তোমার বন্ধু।' মেয়েটি নির্বিকার। যেন রানার বাঁকা হাসিটা চোখে পড়েনি।

খানিকটা অবাক হলো রানা মেয়েটির মন্তব্যে। কিন্তু সেদিকে নজর দেয়ার সময় নেই। নেমে পড়েছে হেলিকপ্টার। স্লাইডিং দরজা খুলে গেল একপাশের। কোবরা আছে ওতে, ভাবতেই মাথায় খুন চেপে গেল রানার। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে শয়তানটার টুটি টেনে ছিঁড়ে নিয়ে আসে। কিন্তু প্রথমে যে নামলো ওটা থেকে, তাকে রানা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

এক দৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে মেয়েটি। সুজান।

প্রথমে বিস্ময়, এবং পরে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল মাদারশিপের ভেতর। প্যানেলের সবগুলো আলো জ্বলে উঠেছে একসাথে। সবুজ আলো।

'ওহ! পেয়েছি ওকে!'

'জলদি চলো!'

'সবাইকে খবরটা জানাও আগে।'

গোত্তা খেলো প্রকাণ্ড মাদারশিপ, তারপর নক্ষত্রের গতিতে ছুটতে লাগলো অনেক অ-নে-ক দূরের পৃথিবীর দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর আরও অসংখ্য স্পেসশিপ পিছু নিলো তার—ছোট, বড়, মাঝারি।

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো সময়, পরক্ষণেই হাজারটা খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। থেমে দাঁড়িয়েই আবার পা বাড়াতে যাচ্ছিলো সুজান, কিন্তু পিছন থেকে টেনে ধরলো ওকে জুন এলিসন।

'রানা! পালাও!' আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো সুজান। 'ওরা তোমাকে খুন করবে! পালাও! পালাও!'

'না।' গম গম করে উঠলো ভিন গ্রহবাসিনীর কণ্ঠ, চমকে উঠলো রানা। 'কোনো চিন্তা নেই, রানা। কেউ কিছু করতে পারবে না তোমার।'

'কে ও?' জেনারেল হিলিংটন বেরিয়ে এলেন কপ্টার থেকে। তার পিছনেই কর্নেল হ্যারিসন কেলার। 'সেই মেয়েটি। তাই না, মেজর? আপনার সেই তুরুপের তাস? নিখোঁজ এলিয়েন। ভালোই হলো ওকে পেয়ে, ভবিষ্যতে কাজে দেবে।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তারপর, মেজর?'

'কোবরা কোথায়?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো ও।

'আছেন। আপনি তাঁকে দেখতে চাইবেন জেনে জোর করেই আমাদের সঙ্গে নিলেন।'

'জিমি স্টুয়ার্ট?'

alhasumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

'সে-ও আছে।'

ঠোঁট বেঁকে গেল মাসুদ রানার। 'শ্বশুর-জামাইয়ের জালে নিজেকে বেশ ভালোই জড়িয়েছেন, জেনারেল?'

'হোয়াট!' হাঁ হয়ে গেলেন হিলিংটন। 'আ-আপনি জানলেন কি করে?'

'এ জানতে বিশেষ ডিগ্রীর দরকার হয় না, জেনারেল। প্যারিসে ঝি লিঙের মুখে যখন শুনি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার দ্বিতীয় কারণটি কি, তখনই বুঝে গেছি কোবরাকে। জিমি স্টুয়ার্টের অবাধ্য হওয়ার জন্যে কোবরা কেন মৃত্যুদণ্ড দিতে যাবে? কি এমন বাপ-মা মরা দায় ঠেকেছে তার? তবে···জুন এলিসনের ব্যাপারটা মাথায় খেলছে না আমার। ও আপনাদের সাথে কেন?'

'আমিও অপারেশন ডুমসডের একজন কর্ণধার, মিস্টার রানা।' দাঁত বের করে হাসলো জুন। 'আমার সামান্য ভুলে সেদিন পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন আপনি ইয়ট থেকে। অবশ্য আমার প্রাণপ্রিয় স্বীটি যে···সে যাক। আবার আপনার দেখা পেয়ে খুব খুশি হয়েছি আমি, বিলিভ মি।'

এবার হেলেদুলে কপ্টার থেকে নেমে এলেন বিশালদেহী ডোনাল্ড স্নীক, ওরফে কোবরা। সঙ্গে ওএনআই ডেপুটি, চর্বির ডিপো, জিমি স্টুয়ার্ট। 'হ্যালো, মিস্টার রানা?' ভুরু নাচালো সে। মুখে এক টুকরো অমায়িক হাসি ফুটলো। 'আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না আমাদের হুমকি দেয়ার এতোবড় আস্পর্ধা আপনার হলো কি করে।'

'একেই বোধহয় বলে অতি চালাকের গলায় দড়ি,' হাসতে হাসতে বললো জুন। 'আমিও খুব চমকে গিয়েছি, বুঝলেন? আপনার সাহসের···'

'এ আর কি! আরও অনেক চমক অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্যে। ধৈর্য ধরুন।'

'কিসের চমক, মেজর?' মিটিমিটি হাসছেন জেনারেল, যেন পাগলের প্রলাপ শুনে মজা পাচ্ছেন খুব।

অনেক দূর থেকে আরেকটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ কানে এলো রানার, খুবই অস্পষ্ট। বুকটা আনন্দে নেচে উঠলো। পাল্টা দাঁত দেখালো ও। 'কাল রাতে আপনাদের প্রেসিডেন্টের সাথে খুব জরুরী এবং গোপন মীটিং করেছেন আমার বস, রাহাত খান। তাঁর···'

'অসম্ভব! রাহাতের এমন কোনো প্রভাব নেই যার জন্যে আমাদের প্রেসিডেন্ট ওর সাথে গোপন বৈঠকে বসবেন। খেপেছেন নাকি?'

জেনারেল থামতেই আবার বলে উঠলো রানা, 'তাঁর সাথে আপনার চীফ, ডেভিড সরেনসেনও ছিলেন।'

'কি?' হাসি উবে গেল জেনারেলের।

'ব্যস্ত হবেন না, আরও আছে। সিআইএ চীফ, এফবিআই চীফ, ওএনআই চীফ এবং অ্যাডমিরাল জন হ্যামিলটন, এরাও প্রত্যেকেই ছিলেন। আলোচনার বিষয়বস্তু কি ছিলো বুঝতে পারছেন তো? প্রেসিডেন্ট অবশ্য কিছু কিছু আগে থেকেই আভাস পেয়েছিলেন আপনাদের অপারেশন ডুমসডে সম্পর্কে। কাল বাকি সব জেনেছেন। আপনাদের কুকর্ম সম্পর্কে আর কিছুই জানতে তাঁর বাকি নেই। আমার

ধারণা যদি মিথ্যে না হয়, এ দেশ থেকে হাতকড়া পরা অবস্থায় আমেরিকায় ফিরতে হবে আপনাদের। আপনারা যে অপরাধ করেছেন, তা রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে, জেনারেল। আমেরিকায় এর শাস্তি কি জানেন তো?'

একে একে সবার মুখের দিকে তাকালো মাসুদ রানা। একমাত্র কোবরা বাদে আর সবার মুখ শুকিয়ে গেছে। জেনারেলের পর্যন্ত। তারপরও তিনিই সবার আগে সামলে নিলেন। 'বুঝতে পারছি, উল্টোপাল্টা বকে আয়ু খানিকটা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন আপনি,' বললেন তিনি। যদিও সবাক ফিরে পেলো, আগের জোর নেই গলায়। 'তেমন কিছু যদি ঘটেই, কেউ কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না আমাদের বিরুদ্ধে। একটা আঙুলও কেউ তুলতে পারবে না।'

'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, জেনারেল। একটু আগেই বলেছি, আপনাদের প্রজেক্টের খবর কিছু কিছু জানতেন প্রেসিডেন্ট। কি করে?'

'কি করে?' প্রশ্নটা প্রতিধ্বনি তুললো তাঁর মুখে। কপ্টারের আওয়াজ বেশ জোরালো হয়েছে আগের চেয়ে।

'অনেক আগেই ইনফিলট্রেশন ঘটেছিলো আপনাদের ভেতরে।'

কোবরার দিকে ফিরলেন জেনারেল। 'লোকটা বাজে কথা বলে ধৈর্য নষ্ট করে দিয়েছে আমার। বলুন তো···'

'অফ কোর্স।' মাথা দুলিয়ে সায় দিলো কোবরা।

এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনছিলো হ্যারিসন কেলার। তার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন হিলিংটন। 'কিল দ্য বাস্টার্ড! শুট হিম!'

'না!' গলার সব শক্তি এক করে চেঁচিয়ে উঠলো সুজান। এক ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করে নিলো সে জুনের হাত থেকে। প্রায় উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো রানার বুকে। 'না, প্লীজ,' অনুনয় করলো সে।

'শুট হিম!' হুঙ্কার ছাড়লেন হিলিংটন। 'নাউ!'

'ভাবনার কোনো কারণ নেই, রানা,' নিচু গলায় কথা বলে উঠলো ভিনগ্রহবাসিনী। 'আমি যতোক্ষণ আছি কেউ তোমাকে আঘাত করতে পারবে না।'

সুজানের কানেও গেছে কথাগুলো। কান্না থামিয়ে অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালো সে। আগেই দেখেছে মেয়েটিকে, কিন্তু এতোক্ষণ খেয়াল দিতে পারেনি।

ওদিকে, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে কর্নেল কেলার। ওটা তুললো সে। সরাসরি ডোনাল্ড স্নীক, ওরফে কোবরার বুক সই করে।

কপ্টারটাও ততোক্ষণে অনেক কাছে এসে পড়েছে। ওটার রোটর ঝড় তুলেছে দূরের গাছগুলোর মাথায়।

arinsuman@yahoo.com
www.murchona.com

এগারো

'মাথা খারাপ হলো নাকি তোমার?' খেঁকিয়ে উঠলেন জেনারেল কেলারকে লক্ষ্য করে। 'নাকি চোখে কম দেখছো?'

'না, জেনারেল,' গম্ভীর গলায় বললো মাসুদ রানা। 'ও দুটোই ঠিক আছে হ্যারিসন কেলারের।'

'কি!' অবিশ্বাস মাখা দৃষ্টিতে রানা আর কেলারকে দেখছেন ডোনাল্ড রীক। 'আপনি---আপনারা---।' কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি।

'ঠিক।' টিটকিরির ভঙ্গিতে বেঁকে গেল রানার ঠোঁট। 'পরস্পরকে চিনি আমরা। অনেক আগে থেকেই। একে অন্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমরা।'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালেন জেনারেল কেলারের দিকে, মনে হলো লেজে আগুন ধরে গেছে তাঁর। 'এ-এসব কি শুনছি, কর্নেল?' মুখ হাঁ হয়ে গেছে বিস্ময়ে।

'ঠিকই শুনছেন।' কেলারও গম্ভীর।

'তার মানে---আপনি---'

'জি।' রানার দিকে ফিরলো সে। 'দুঃখিত, দোস্ত। তোমার বিপদ টের পেয়েই ছুটে গিয়েছিলাম ইটালি, সাহায্য করবো বলে। কিন্তু ওদের মতো আমাকেও বেশ ঘোল খাইয়েছো তুমি। ওফ, ছুটতে ছুটতে একেবারে জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা। জীবনেও এমন বেকুব হইনি আমি।' হাসলো হ্যারিসন কেলার। 'আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো, রানা।'

'ধন্যবাদ।'

এবার এক এক করে জেনারেল হিলিংটন, ডোনাল্ড রীক, জুল এলিসন এবং জিমি স্টুয়ার্টের দিকে তাকালো কেলার। দেখার মতো চেহারা হয়েছে একেকজনের, ভাবলো সে, ছবি তুলে বাঁধিয়ে রাখার মতো। 'আপনাদের নিশ্চয়ই কলজে ফেটে মরার মতো অবস্থা হয়েছে, সব শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন ভেতরে ভেতরে, তাই না?'

উত্তর দিলো না কেউ। ঘটনার আকস্মিকতায় বোধশক্তি পুরোপুরি লোপ পেয়েছে প্রত্যেকের।

'এখনই সে কেচ্ছা বয়ান করবো আমি। কিন্তু তার আগে আপনারা এক সারিতে দাঁড়ান সবাই, পাশাপাশি, প্লীজ। তাতে নজর রাখতে সুবিধে হবে।' অস্ত্রটা নাচালো কেলার।

সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে ওএনআই ডেপুটি। মস্ত একটা ঢোক গিললো সশব্দে। অসহায় ছাগ শিশুর মতো প্রবল ক্ষমতাধর শ্বশুরের দিকে একবার তাকালো, তারপর দু'পা সরে এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালো সুবোধ বালকের মতো। কিন্তু জেনারেল আর এলিসন নড়লো না একচুলও। গাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জায়গায়।

'বিশ্বাস করুন,' বাঁকা হাসি ফুটলো জেনারেলের মুখে। 'গুলি চালাতে এক

মুহূর্তও দ্বিধা করবো না আমি। আমার ভোগিয়ে পড়েছেন আপনারা। জানেন নিশ্চই, কোন কাজটা করতে সবচেয়ে আনন্দ পাই আমি?'

এবার কাজ হলো। পায়ে পায়ে শ্বশুর-জামাইয়ের দু'পাশে এসে দাঁড়ালো দু'জনে। চেহারা ছাইয়ের মতো হয়ে গেছে জেনারেলের। 'কিন্তু কেন?' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'আমাদেরই একজন হয়ে---'

বাধা দিলো তাঁকে মাসুদ রানা। 'ভুল, জেনারেল। কেলার কখনোই আপনাদের একজন ছিলো না। ও ছিলো অপারেশন ডুমসডের গোদে বিষফোঁড়া।' ঘুরে জুল এলিসনের দিকে তাকালো ও। 'অতি চালাকের গলায় দড়ি, ঠিকই বলেছিলেন তখন আপনি। এতোদিন ধরে যে অন্যায়-অপরাধ---'

থামিয়ে দিলেন ওকে ডোনাল্ড রীক। 'বাজে কথা! আমরা কোনো অন্যায় করিনি। দোষের কিছুই করিনি।'

'আচ্ছা!'

'আমরা যা করেছি,' টিটকিরিটা গায়ে মাখলেন না রীক। বলে চললেন, 'তা দেশবাসীর স্বার্থে, পৃথিবীর স্বার্থেই করেছি। রাজনীতিকদের অন্যায় চাপে সরকারকে যে-সব কাজ থেকে বাধ্য হয়ে সরে দাঁড়াতে হয়েছে, অথচ কাজগুলো অত্যন্ত জরুরী, সে-সব কাজ আমরা করে এসেছি। সবার স্বার্থে।'

'তা বটে।' মাথা দোলালো হ্যারিসন কেলার সমঝদারের মতো। 'আপনারা পৃথিবীর মা-বাপ, এর ভালো মন্দ আপনারা দেখবেন না তো কে দেখবে? কিন্তু এই দশজন নিরপরাধ নারী-পুরুষ পৃথিবীর কোন বৃহৎ স্বার্থে খুন হলো, বলবেন কি, মিস্টার রীক?'

'ওরা---ওরা বেঁচে থাকলে আতঙ্ক ছড়াতো। চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দিতো। প্রশাসন বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই থাকতো না। এর ফলে অর্থনীতির কাঠামো ধসে পড়তো।'

'যুক্তিটা মন্দ নয় আপনার,' বললো মাসুদ রানা। 'তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি বোধহয় আপনার আর এলিসনেরই হতো। আপনাদের অন্য সব ব্যবসার মধ্যে রেইন ফরেস্টের গাছ বেচে যে পাহাড় সমান সম্পদ জমা হতো ব্যাংকে, সেটাও বানচাল হয়ে যেতো। ঠিক বলিনি, মিস্টার রীক?'

'তার মানে?' বোকার মতো রানার দিকে তাকালো হ্যারিসন কেলার। 'তুমি এসব জানলে কি করে?'

'ব্রাজিলের সাথে এরা যখন প্রথমবার রেইন ফরেস্ট কেনার আলোচনা শুরু করে তিন বছর আগে, তখনই ব্যাপারটা টের পেয়ে ব্রাসেলস-এর ন্যাটো বেসে এসে নামে কয়েকটি স্পেসশিপ। ওর 'ঝারো'হীরা বেসের তখনকার কমান্ডান্ট, জেনারেল কলিন হার্ডেকে এই বলে সতর্ক করে দেয় যে এই চুক্তি কার্যকর হলে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে সেখানকার পরিবেশে। তারা দাবি করে, তিনি যেন এই সর্বনাশা বেচা-কেনা বন্ধ করার ব্যাপারে মার্কিন এবং ব্রাজিল সরকারকে অনুরোধ করেন তাদের হয়ে। কিন্তু সে সুযোগ দেয়া হয়নি জেনারেল হার্ডেকে। ওই দিনই এক রহস্যজনক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তাঁর। তবে, মৃত্যুর সামান্য আগেই টেলিফোনে জেনারেলের সাথে কথা বলেছিলেন তখনকার ওএনআই ডেপুটি ডিরেক্টর, কমোডর

হেনরি লুইস। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দু'জনে। ঘটনাটা জানিয়েছিলেন তাঁকে জেনারেল। কেবল এই জানার অপরাধে বেচারা হেনরি লুইসও চাকরি হারান। কেজিবি-র চর অপবাদ দিয়ে পদচ্যুত করা হয়েছিলো কমোডরকে। তাঁর জায়গায় বসানো হয় একে।' জিমি স্টুয়ার্টকে দেখালো রানা।

ধক ধক করে জ্বলছে ডোনাল্ড রীকের দু'চোখ। শীতল গলায় বললেন, 'অনেক খবরই রাখেন দেখছি।'

'রাখতে হয়।' ক্লান্ত শোনালো রানার গলা। 'ওটাই যে আমার পেশা।'

'কিন্তু, রানা,' বিস্ময়ে কপালে উঠেছে কেলারের চোখ। 'এতো সব খবর তুমি কি করে জানো?'

'নমা'র অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের বন্ধু ছিলেন কমোডর হেনরি লুইস। তাঁকে সব জানিয়েছিলেন তিনি। আমি জেনেছি অ্যাডমিরালের কাছ থেকে। ওর পর থেকেই টাকার এই কুমীরটির ওপর নজর রাখতে থাকি আমি। অবশ্য, এই লোকই যে কোবরা, জানতাম না।'

হেলিকপ্টারের আওয়াজ অনেক কাছে এসে পড়েছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ওটাকে এক ঝলক দেখতে পেলো সবাই। পেটের কাছে সুইস পুলিসের ছাপ রয়েছে ওটার। হঠাৎ হেসে উঠলেন ডোনাল্ড রীক। 'ওটায় আমাদের কমাণ্ডো ফোর্স রয়েছে, মেজর মাসুদ রানা। সেটআপটা এমনভাবে করা হয়েছিলো যেন আমাদের পনেরো মিনিট পর এখানে পৌঁছায় ওরা। যাতে এখানে কোনোরকম ঝামেলা দেখা দিলে সময়মতো সামাল দেয়া যায়। এবার? নিজেদের কি ভাবে বাঁচাবেন, মেজর?' ভুরু নাচালেন তিনি।

লক্ষ্য করেছে রানা, কপ্টারের আওয়াজ কানে যাওয়ামাত্র স্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে তাদের সবার চেহারায়।

'অনেক বেশি জেনে ফেলেছেন আপনি,' আবার বলে উঠলেন রীক। 'এবার তার মাশুল গুনতে হবে।'

'বেশি আশাবাদী হবেন না, মিস্টার কোবরা। আপনি যা ভাবছেন, ওরা তা নয়। এসপিওনাজ অ্যাবটেইলাঙের ডেপুটি চীফসহ আপনার কমাণ্ডো ফোর্স এখন অ্যারেস্টেড।' কাঁধ ঝাঁকালো রানা।

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন ডোনাল্ড রীক। 'আমার অর্গানাইজেশন---'

'ভুলে যান। হাওয়ায় উড়ে গেছে আপনার অর্গানাইজেশন। আপনাদের নামের তালিকা অনেক আগেই তৈরি করে রেখেছিলো কেলার। শুধু মোক্ষম একটা প্রমাণের অপেক্ষায় ছিলো মার্কিন সরকার। কাল বিকেলে টেলিফোনে আমার বস এবং অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সাথে আলাপ হয় আমার দীর্ঘক্ষণ। ওর পর পরই শুরু হয়ে যায় অফিশিয়াল অ্যাকশন। শুধু আপনারা ক'জন বাদে, আপনাদের বাকি সব সঙ্গী সাথীদের ওপর কড়া নজর রাখা শুরু হয়।' চট করে হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলালো রানা। 'বাজি রেখে বলতে পারি, এতোক্ষণে ইউরোপ-আমেরিকাজুড়ে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেছে।'

'মাই গড!' হতাশ মনে হলো হ্যারিসন কেলারকে। 'কিছুই দেখি জানতে বাকি নেই তোমার।'

'না,' হেসে ফেললো মাসুদ রানা। 'তখন বললে ইটালি ছিলে তুমি। এখানে কি করে এলে, এটুকু জানি না এখনও।'

'যখন নিশ্চিত হলাম, মার্সেই পালিয়ে গেছো তুমি, তখনই বুঝলাম কোথায় পাওয়া যাবে তোমাকে।' কথায় ব্যস্ত থাকলেও সতর্ক নজর রেখেছে কেলার ওদের চারজনের ওপর। 'সোজা প্যারিস চলে যাই আমি। কাল ডক্টর পাগান টেলিফোনে তোমার সাহায্য চাওয়ার কথা জানায় এফএসএস-এর ডেপুটি চীফ, ফ্রান্সিস গেরিনকে, তুমি তাকে ফোন করার সাথে সাথেই। আমি তখন ওখানেই বসা। খবর পেয়ে গেরির সাথে ছুটে গেলাম রু বেন্যুভিলের সেই ঠিকানায়।

'গিয়ে দেখি তুমি নেই, পড়ে আছে মি লিভের লাশটা। তখনই সন্দেহ হয় আমার, হয় তুমি ডাক্তারের ওখানেই আছো, নয়তো তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছো অন্য কোথাও। তুমি ফিরে আসতে পারো, ফ্রান্সিসকে এই লোভ দেখিয়ে ওখানে বসিয়ে রেখে চলে আসি আমি কোবরার সাথে যোগাযোগ করতে হবে বলে। গিয়ে দেখি কাজ সেরে আগেই সটকে পড়েছো তুমি যথারীতি। বহু কষ্টে ডাক্তারকে উদ্ধার করলাম। তারপর তার মুখে শুনলাম, ওখান থেকেই ওয়াশিংটনে টেলিফোন করেছো তুমি। কি কি আলাপ হয়েছে তোমাদের, তা-ও বললো লোকটা। এরপর আমিও ফোন করলাম ওয়াশিংটনে, কথা বললাম কোবরার সাথে।' মুচকে হাসলো কেলার ডোনাল্ড রীকের দিকে তাকিয়ে। 'তারপর---রাতের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম জুরিখ। তোমার আগেই!'

মাথার ওপর এসে পড়েছে হেলিকপ্টার। একটা না, দুটো-বিশাল আকৃতির। দুটোতেই সুইস পুলিসের ছাপ মারা। নিজেকে সামলে নিয়েছে ততক্ষণে ক্রুগার। পানি শুকিয়ে গেছে চোখের। রানার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। খড় তুলে মাঠটির পাশে অবতরণ করলো পুলিসের কপ্টার দুটো।'

একটা থেকে নামলেন মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, এসপিওনাজ অ্যাবটেইলাঙ চীফ লিয়ন পাওয়ার এবং জুরিখ পুলিস চীফ। অন্যটা থেকে ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়লো দেড় ডজন সশস্ত্র পুলিস, চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো ওদের চারজনকে। কোনওদিকে না তাকিয়ে সরাসরি রানার সামনে এসে দাঁড়ালেন রাহাত খান আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। অ্যাডমিরালের মুখে মৃদু জয়ের হাসি। রাহাত খান ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছেন রানার ফ্যাকাশে মুখের দিকে।

'আঘাতটা কেমন, রানা?' প্রশ্ন করলেন তিনি, 'খুব সিরিয়াস?'

'না, স্যার। সকালে আরেকবার ড্রেসিং করিয়ে নিয়েছি। ব্যথা কমে গেছে, তবে খুব দুর্বল লাগছে।'

'আমি---আমি দুঃখিত,' আমতা আমতা করতে লাগলেন বৃদ্ধ। নিজেকে উভয় অপরাধী মনে হচ্ছে তার। 'আমি খুব দুঃখিত, রানা। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনে করি---' ঘুরে জেনারেল হিলটনের দিকে তাকালেন তিনি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন এনএসএ ডেপুটি। বৃদ্ধের দৃষ্টিতে রাগ বা ঘৃণা, কিছুই নেই, আনমনে চেয়ে আছেন কেবল বন্ধুর দিকে।

'রানা, সেই মেয়েটি কই?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

ঘাড় ঘোরাতে গিয়েও থমকে গেল মাসুদ রানা। আচমকা মাথার ওপর তীব্র হিস্ হিস্ আওয়াজ উঠতে একযোগে মাথা তুললো সবাই। দৈত্যাকার এক স্পেসশিপ-মাদারশিপ, ঝুলে আছে মাথার ওপর। কোত্থেকে কখন এসে হাজির হলো অতোবড় যানটা, টেরই পায়নি কেউ। ওটা লক্ষ্য করে অস্ত্র তুলতে যাচ্ছিলো কয়েকজন পুলিস, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সতর্ক করলো রানা তাদের।

একচুল নড়ছে না মাদারশিপ, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে শূন্যে। ওটার চারদিকে জানালার মতো অসংখ্য ফোকর, রঙিন কাঁচ জাতীয় স্বচ্ছ কিছু দিয়ে ঢাকা। শিপটার ভেতরে ঘন ঘন ঝিলিক মারছে অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল সবুজ আলো, দিনের আলো পর্যন্ত ম্লান হয়ে গেছে ওই আলোর পাশে। ওটার হিস্ হিস্ আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে এখন।

সবার বিস্ফারিত চোখের সামনে আচমকা ঝপ করে মাটিতে নেমে পড়লো শিপটা। প্রায় একই সাথে আরও দুটো ইউএফও এসে হাজির হলো ওখানে। অনেক ছোট এ দুটো। নামলো না, রয়ে গেল শূন্যেই। এর পরপরই আরও দুটো---আরও দুটো--আরও দুটো। জোড়ায় জোড়ায় আসছে তো আসছেই। এর যেন কোনও শেষ নেই।

এক সময় মনে হলো পুরো আনটেনভর্কের আকাশ ছেয়ে ফেলেছে ওরা। শিপগুলোর সম্মিলিত হিস্ হিস্ আতঙ্ক জাগানো ছন্দোবদ্ধ এক সুর তুলেছে বাতাসে। চারদিকের পাহাড়গুলো পর্যন্ত কাঁপছে যেন সে আওয়াজে। মাদারশিপের একদিকের দেয়াল নেমে এলো মাটিতে, ওটার ভেতরদিকটা সিঁড়ির মতো। সিঁড়ির গোড়ায় দেখা দিলো চার খুদে ভিনগ্রহবাসী। ছোট ছোট পা ফেলে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো তারা।

তাদের সিলভার মেটালিক ঠোঁট সামান্য প্রসারিত হলো নিজেদের গোত্রেরটিকে চিনতে পেরে। ওদিকে ভয় পেয়ে গেছে সুজান, রক্ত সরে মরার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। অন্য সবাই জমে গেছে যে যার জায়গায়। দম নিতেও ভুলে গেছে যেন। চোখের সামনে এমন অভাবনীয় দৃশ্য, দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না।

এগিয়ে গেল মেয়েটি আপনজনদের দিকে। একজনের সাথে কথা বলতে শুরু করলো দ্রুত। ভাষাটা অদ্ভুত, এখন আর বোঝা যাচ্ছে না ওদের কথা, গলার স্বর কাঁপা কাঁপা। কয়েক মুহূর্ত পরই ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটি আলাপ শেষ করে। 'রানা, তোমাদের কিছু বলবো বলেছিলাম।'

'হ্যাঁ, বলো।' মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাথা দোলালো রানা।

'তার আগে, ওপরে তাকাও সবাই। দেখো।'

চারদিকের আকাশ ঢেকে ফেলেছে অসংখ্য স্পেসশিপ। ওরই মাঝে গোলাকার একটা ফাঁকা। সম্ভবত মাদারশিপের ওটার জন্যে রাখা হয়েছে ফাঁকটা। হঠাৎ করে সাদা মেঘে ভরে গেল জায়গাটা। সবাই চেয়ে আছে সেদিকে—চোখের সামনে বিশাল এক সোনার আইস ক্যাপের রূপ নিলো মেঘ, এবং সাথে সাথে তা গলতে শুরু করলো।

পৃথিবীর সব সাগর, নদী ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো সেই পানিতে। শুরু

হয়ে গেল বন্যা। দেখতে দেখতে লণ্ডন, লস এঞ্জেলেস, নিউ ইয়র্ক এবং টোকিওসহ পৃথিবীর নদী ও সাগর তীরের সব শহর ডেসে গেল কোমর পানিতে।

মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল দৃশ্যপট। দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ–মাথার ওপর নির্দয় সূর্যের প্রচণ্ড তাপে হঠাৎ করে আগুন লেগে গেল মাঠে, শুরু হয়ে গেল দাবানল। এরপরই দেখা গেল খরা। বৃক্ষহীন ধু-ধু প্রান্তরে মরে পড়ে আছে হাজার হাজার পশু। মাটি ফেটে চৌচির।

সবার বিস্মিত চোখের সামনে ছবিটা পাল্টে গেল আবার। একদিকে প্রচণ্ড দাঙ্গা চলছে লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, বেইজিঙে, অন্যদিকে দক্ষিণ-পূব এশিয়ায় মহা দুর্ভিক্ষ–মানুষের মৃতদেহ স্তূপ হয়ে পড়ে আছে সর্বত্র। সবশেষে দেখা গেল পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে গেছে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে। মাটির সাথে মিশে গেছে শহর জনপদ লোকালয়। অজব সব রোগে আক্রান্ত হয়েছে মানুষ। এবং গুহায় বাস করছে তারা। সভ্যতা বিদেয় নিয়েছে পৃথিবী থেকে।

ধীরে ধীরে দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল, সেই সাথে মেঘটাও।

'তোমরা যে পথে চলেছো, এ হচ্ছে তার চরম পরিণতি, রানা,' কথা বলে উঠলো মেয়েটি। চমক ভাঙলো সবার। 'আমরাও এই মহাজগতের বাসিন্দা। তোমরা পৃথিবীর, আমরা প্ল্যাডিক্স-এর সপ্তম সূর্যের। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ, তারপরই তোমাদের স্থান। তোমাদের প্রতিটি অগ্রগতি গভীর আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করি আমরা। আজ নয়, বহুদিন আগে থেকেই লক্ষ্য রেখে আসছি পৃথিবীর ওপর। তোমাদের প্রযুক্তিগত উন্নতি দেখলে খুশি লাগে। ভাবি, একটু একটু করে এগোচ্ছো তোমরা। আবার দুঃখও লাগে তোমাদের নির্বুদ্ধিতা দেখে, নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারছো দেখে। লোভীর মতো সব প্রাকৃতিক সম্পদ শেষ করে ফেলছো তোমরা পৃথিবীর। ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছো সুন্দর এই গ্রহটিকে।

'সেই সাথে আমাদের চলাচলের প্যাসেজও বিষিয়ে তুলেছো তোমরা কার্বন ডাই অক্সাইডে। গাছ কেটে উজাড় করে ফেলেছো। এই অমূল্য সম্পদ শেষ হয়ে গেলে কি হবে তোমাদের অবস্থা? পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মানুষ ঠিকমতো খেতে পায় না। অথচ পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র তৈরির পিছনে, পরীক্ষার পিছনে ধনী দেশগুলো প্রতি বছর যে অর্থ খরচ করে, তাতে ওই সব ক্ষুধার্ত মানুষগুলো কম করেও দশ বছর খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে।

'তোমাদের ভবিষ্যৎ, তোমাদের পরিণতি কি, আমরা জানি। এই জন্যেই মানবজাতিকে সতর্ক করার উদ্দেশে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলাম আমরা কয়েক বছর আগে। সদুপদেশ দিতে গিয়েছিলাম বন্ধু হিসেবে। কিন্তু তোমরা আমাদের বন্ধু হিসেবে নাওনি। বরং আমাদের স্পেসশিপ ধ্বংস করার জন্যে তৈরি হয়েছো ভেতরে ভেতরে। সব জেনেও চুপ করে ছিলাম আমরা। কিন্তু আর তা সম্ভব নয়। আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ আছে, সেগুলো তোমাদের মানতে হবে।' শেষ দিকে কঠোর শোনালো তার কণ্ঠ।

কি করবে, ভেবে পেলো না মাসুদ রানা। অসহায়ের মতো একবার রাহাত খান, আরেকবার অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের দিকে তাকাতে লাগলো।

'এখানে তোমাদের গ্রহের সবচেয়ে ধনী এবং ক্ষমতাধর দেশগুলির একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রয়েছেন, তাঁকে আমরা আমাদের দাবি নিজ সরকারকে অবহিত করার অনুরোধ করবো,' বললো মেয়েটি।

নিজের চারদিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। ভাবছেন, কাকে বলছে ও কথাগুলো? কি যেন---সবচেয়ে ধনী এবং---। ঝাঁকি খেয়ে সিধে হলেন তিনি। 'আমার কথা বলছেন, মিস?'

'হ্যাঁ,' হাসলো সুন্দরী মিষ্টি করে। 'আপনারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছেন পৃথিবীর।'

'বলুন, বলুন,' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ।

'আমাদের প্রথম দাবি, গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে আপনাদের। এখনই। বন্য পশু-পাখি নিধন বন্ধ করতে হবে। পেট্রোলিয়াম, কেমিকেলস, গ্যাস উৎপাদন কমিয়ে আনতে হবে এখনকার তুলনায় চার ভাগের এক ভাগে। এবং এগুলোর বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। প্লাস্টিক উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। পারমাণবিক, রাসায়নিক বোমা তৈরি এবং পরীক্ষা বন্ধ করতে হবে। গাড়ি উৎপাদনও কমিয়ে আনতে হবে দশভাগের এক ভাগে। এখন থেকে আপনাদের ওপর কড়া নজর থাকবে আমাদের। নির্দেশ মানার ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক ইচ্ছার অভাব আছে বোঝা গেলেই আবার আসবো আমরা। আপনাদের জন্যে পৃথিবীর, সেই সাথে আমাদেরও প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। আর তা বরদাশত করা হবে না। আমাদের যদি আবার আসতে বাধ্য করা হয়, সেবার আমাদের অন্য চেহারা দেখবেন।'

'চেষ্টা করবো। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।' মাথা দোলালেন অ্যাডমিরাল।

'হবে। চেষ্টা আন্তরিক হলেই কাজ হবে। শুধু সরকারী পর্যায়ে আলোচনা করলে হবে না, জনগণকেও সচেতন করতে হবে আপনাদের। তাদেরকেও বোঝাতে হবে।'

'বেশ।' মাথা দোলালেন অ্যাডমিরাল।

'গুড।' একটু থামলো মেয়েটি। এক এক করে ডোনাল্ড রীক, হিলিংটন, ডুন এডিসন আর জিমি কুঁয়ার্টের দিকে তাকালো। 'এদের চারজনকে নিয়ে যেতে চাই আমরা,' বললো সে।

'না, প্লীজ,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমরাই এদের বিচার করবো, আমাদের প্রচলিত আইনে।'

ঘুরে স্বগোত্রীয়দের দিকে তাকালো মেয়েটি। চোখে জিজ্ঞাসু চাউনি। একযোগে সম্মতিসূচক মাথা দোলালো তারা। 'ঠিক আছে।' কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'তাই হোক।'

হঠাৎ করেই একযোগে ঘুরে দাঁড়ালো তারা। পা বাড়ালো মাদারশিপের দিকে। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে থেমে দাঁড়ালো মেয়েটি, ফিরলো রানার দিকে।

'আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোমাকে আবার ধন্যবাদ, মাসুদ রানা। ব্যাপারটা মনে থাকবে আমার। তবে আমাদের দাবিগুলোর কথা মনে রেখো। মহাজগতের সবার স্বার্থেই সতর্ক হতে হবে তোমাদের, বিশেষ করে তোমাদের।

রানাও কিছু বলতে চাইলো, কিন্তু উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেলো না। অন্যদের সাথে

সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়লো মেয়েটি, বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সবুজ আলোর ঝলকানি বেরুতে শুরু করলো ওটার ভেতর থেকে, ক্রমেই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগলো সে আলো। তারপর কোনওরকম আভাস না দিয়েই, আচমকা সাঁ করে শূন্যে উঠে গেল মাদারশিপ। উঠতেই থাকলো, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। ছোটগুলো তাকে অনুসরণ করছে।

বিন্দুতে পরিণত হয়ে থেমে দাঁড়ালো শিপগুলো একসাথে। স্থির হয়ে থাকলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর বিদ্যুৎবেগে ছুটতে শুরু করলো দক্ষিণে। অদৃশ্য হয়ে গেল পলকে।

কথা নেই কারও মুখে, বোবা হয়ে গেছে সবাই। মৃত্যুপুরীর নীরবতা বিরাজ করছে। এ কি স্বপ্ন, না সত্যি, বুঝে উঠতে পারছে না কেউ। সবার আগে সচকিত হলেন পুলিস চীফ। লিয়ন পাওয়ারের সাথে নিচু গলায় কিছু একটা আলোচনা সেরে নিয়ে একের পর এক নির্দেশ দিতে শুরু করলেন তিনি। দু'মিনিটের মধ্যে অপারেশন ডুমসেডের চার মহারথীকে ভাগ ভাগ করে তোলা হলো দুই কপ্টারে। চলে গেল ও দুটো।

'রানা,' কপ্টারের আওয়াজ দূরে সরে যেতে গম্ভীর গলায় বললেন রাহাত খান। 'ঢাকায় ফিরে যাচ্ছি আমি। তুমি কি করবে, যাবে আমার সাথে?'

আড়চোখে সুজানের দিকে তাকালো মাসুদ রানা। অনুনয়ের দৃষ্টিতে ওর দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলো মেয়েটি। ব্যাপারটা চোখে পড়েছে অ্যাডমিরাল আর কেলারের।

'ক'দিনের ছুটি চাই, স্যার,' একটু ইতস্তত করে বললো রানা।

দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠলো বৃদ্ধের। কটমট করে সুজানের দিকে তাকালেন তিনি। 'ক'দিনের?'

'তিরিশ দিনের, স্যার।'

'সম্ভব নয়, অনেক কাজ জমে আছে। পনের দিনের ছুটি গ্রান্ট করা হলো। ছুটির দরখাস্ত ঢাকায় পাঠিয়ে দিও। অ্যাসাইনমেন্টের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টটাও।' কপ্টারের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলেন, 'চলো, আমাদের সাথে জুরিখ পর্যন্ত চলো।'

'আমার সাথে গাড়ি আছে, স্যার।'

'এই অবস্থায় গাড়ি চালাতে---' থেমে গেলেন রাহাত খান পিঠে বন্ধু হ্যামিলটনের তর্জনীর খোঁচা খেয়ে।

'বুড়ো বলে আক্কেল-জ্ঞান কিছুই থাকতে নেই নাকি?' নিচু গলায় ধমকে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'গাড়ির সাথে ছুঁড়িও আছে, দেখছো না? রানার অসুবিধে হলে ও চালাবে। চলো,' হাত ধরে টান দিলেন তিনি রাহাত খানকে, 'কেটে পড়ি মানে মানে।'

'না, স্যার। অসুবিধে হবে না।'

'বেশ। আমরা চললাম তাহলে। আর---উহু, কংগ্র্যাচুলেশনস, রানা।'

'আমার তরফ থেকেও, রানা,' হাসলেন অ্যাডমিরাল।

'ধন্যবাদ, স্যার।'

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

এগিয়ে এলো কর্নেল হ্যারিসন কেলার। আস্তে করে আলিঙ্গন করলো রানাকে। 'চলি। দেখা হবে আবার।'

তার পিঠ চাপড়ে দিলো রানা। 'নিশ্চই। থ্যাঙ্কস ফর এভরিথিং।'

পাঁচ মিনিট পর দুই বুড়ো, এসআইএ চীফ এবং কেলারকে নিয়ে উড়াল দিলো শেষ কপ্টারটি।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও রানার মধ্যে নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ না দেখে মৃদু কণ্ঠে বললো সুজান, 'চলো, রানা।'

'হ্যাঁ।' শেষবারের মতো মাঠটার ওপর নজর বুলিয়ে নিলো মাসুদ রানা। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললো, 'চলো।'

***

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

Sumon

A lonely man in the crowded planet